



লোকায়ত দর্শন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লোকায়ত দর্শন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রিট

কলিকাতা-১

মূল্য: পনরো টাকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
স্মরণে

From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in the human mind: religion. In the face of all these creations, which appeared in the first place to be products of the mind, and which seemed to dominate human society, the more modest productions of the working hand retreated into the background, the more so since the mind that plans the labour process already at a very early stage of the development of society was able to have the labour that had been planned carried out by other hands than its own. All merit for the swift advance of civilisation was ascribed to the mind, to the development and activity of the brain..... and so arose in the course of time that idealistic outlook on the world which, especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds. F. ENGELS.

Division of labour only becomes truly such from the moment when a division of mental and material labour appears. From this moment onwards consciousness can really flatter itself that it is something other than consciousness of existing practice, that it is really conceiving something without conceiving something real; from now on consciousness is in a position to emancipate itself from the world and to proceed to the formation of "pure" theory, theology, philosophy, ethics etc. K. MARX & F. ENGELS.

The truth of the matter is, not that these ancient Greeks anticipated the results of modern science, but that modern scientists have succeeded in reaffirming certain fundamental but forgotten truths and establishing them securely on the basis of experimental proof. The early Greek philosophers stood near the beginning of class society; the modern bourgeois scientists stand near its end.... The primitive dialectics of these early Greek materialists stands to the dialectical materialism of the present day in the same relation as primitive communism stands to modern communism. G. THOMSON.

Owing to a certain judicial blindness even the best intelligences absolutely fail to see the things which lie in front of their noses. Later, when the moment has arrived, we are surprised to find traces everywhere of what we failed to see....., look beyond the middle ages into the primitive age of each nation, and that corresponds to the socialist tendency although these learned men have no idea that the two have any connection. They are therefore surprised to find what is newest in what is oldest.....K. MARX.

প্রস্তাব

সমাজ-বিকাশের পটভূমিতে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দিক এই গ্রন্থে বিচার করবার চেষ্টা করেছি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ইতিহাস—বিশেষত মাতৃপ্রাধান্য—সংক্রান্ত গবেষণা আজো অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে এবং বিশেষত ব্যক্তিগত যোগ্যতার অনুপাতে বর্তমান প্রচেষ্টা অবশ্যই দুঃসাহসের মতো। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অসামান্য; তাই বর্তমান গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি যদি সমালোচনা-প্রসঙ্গে ও বিষয়টির প্রতি দক্ষতার বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাহলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে।

মুদ্রণ কাজ স্বভাবতই সময় সাপেক্ষ হয়েছে; তাই শেষাংশে পৌছে প্রথমমাংশকে নানাভাবে সংশোধন করবার আগ্রহ জাগলেও তার সম্ভাবনা ছিলো না। বৌদ্ধ আজীবিক ও ঔলুক্য দর্শনের উৎস সন্ধান প্রাসঙ্গিক হলেও তার জন্য স্থান সঙ্কুলান হয়নি। অধ্যাপক জর্জ টমসনের First Philosophers আরো আগে হাতে পেলে তার গবেষণা থেকে আরো বেশি লাভবান হবার সুযোগ পেতাম। কিন্তু এ-সব বিষয়ে আক্ষেপও অনেকাংশে অর্থহীন। কেননা সংশোধনাদির সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে এবং নূতন যুক্তি ও নূতন তথ্য সংযোজনার প্রয়োজন কখনোই শেষ হয় না।

ঋণ-স্বীকারের জন্য খুব বেশি নাম উল্লেখ করবার সুযোগ পাচ্ছি না বলেও দুঃখ করে লাভ নেই। কেননা সংখ্যায় স্বল্প হলেও যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাদের আন্তরিকতা গভীরতায় প্রায় অপরিসীম। শ্রীযুক্ত প্রশান্ত সন্ন্যালের কাছ থেকে ব্যক্তিগত উৎসাহ না পেলে গ্রন্থটির কাজ হয়তো শুরুই হতো না। এবং শ্রীযুক্ত হরি সিংহরায় ও শ্রীযুক্ত মৈত্রের নানামুখী সাহায্য না পেলে এর কাজ শেষ করা নিশ্চয়ই অসম্ভব হতো। শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত

উপকৃত হয়েছি-- ব্রাত্য, যজমান ও শ্বশ্নিন শব্দের আদি তাৎপর্যের প্রতি শ্রীযুক্ত মণি চক্রবর্তীই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সিংহরায় যে-ধৈর্য্য দেখিয়েছেন এবং আমাকে যতোপানি স্বাধীনতা দিয়েছেন তার জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। শ্রদ্ধেয় অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় অকৃপন ভাবে গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। অন্যান্য স্বীকৃতি গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছি।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সিটি কলেজ
কলকাতা-৯
২০শে আগস্ট, ১৯৫৬

ভূমিকা

লোকায়ত, মাধবাচার্য ও আধুনিক গবেষণা

গোড়ায় ভেবেছিলাম, লোকায়ত-অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বা materialism-এর-একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করবো। কিন্তু এ-দায়িত্ব যে কতো কঠিন সে-বিষয়ে তখন সত্যিই ধারণা ছিলো না।

অবশ্যই জানা ছিলো, লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত বিরল এবং এগুলি একান্তই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অনিশ্চয়তার মহাসমুদ্রে একমাত্র যে-কথা জোর করে বলা যায় তা হলো, লোকায়তিকদের নিজস্ব কোনো রচনাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কালে এ-জাতীয় কোনো রচনা একান্তই ছিলো কিনা-সে-বিষয়েও বিদ্বানেরা একমত নন। রিস-ডেভিডস এ-সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেন, যদিও গার্বের, তুচি এবং দাসগুপ্ত তার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। সে-সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদিই বা স্বীকার করতে হয় যে, এককালে এ-জাতীয় গ্রন্থ সত্যিই ছিলো। তবুও কিন্তু মানতেই হবে যে তা বিলুপ্ত হয়েছে।-- হয়তো বিপক্ষেরা সেগুলি স্বেচ্ছায় ধ্বংস করেছিলো। এ-অবস্থায় রিস ডেভিডস যখন দাবি করেন লোকায়তিকদের নিজস্ব কোন রচনা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে বড়ো জোর একটা অস্থায়ী প্রকল্পের উপর নির্ভর করা সম্ভব,- তখন তার উক্তি না-মেনে উপায় নেই।

রিস-ডেভিডস এ-কথা লিখেছিলেন ১৮৯৯ সালে। তারপর আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, ও-জাতীয় কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হবার আর কোনো সম্ভাবনাও নেই। অবশ্যই ১৯২১ সালে এফ, ডাবলিউ, টমাস বৃহস্পতি-সূত্র বলে একটি গ্রন্থ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তর্জমা করে প্রকাশ করেন। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই লোকায়ত-মতের প্রবর্তক; তাই এ গ্রন্থ বিদ্বান মহলে লোকায়ত-

সংক্রান্ত পুরোনো কৌতুহলকে নতুন করে নাড়া দিয়েছিলো। কিন্তু গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, এর চরিত্র মোটেই অকৃত্রিম লোকায়তিক নয়। বরং লোকায়ত-বিরোধিতাইও এর প্রধান প্রতিপাদ্য। অধ্যাপক তুচির ভাষায়, গ্রন্থটি স্পষ্টই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব প্রণোদিত -- it bears a clear Brahmanical character। কিন্তু সঙ্গেই তিনি দাবি করলেন, তবুও এই গ্রন্থে লোকায়ত-প্রসঙ্গে এমন কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবত কোনো প্রাচীন কিন্তু বিলুপ্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিলো এবং সেই বিলুপ্ত গ্রন্থটির চরিত্র ছিলো স্পষ্টই লোকায়তিক-- a peculiar lohayata character.

কিন্তু আসল সমস্যা তো এই নিয়েই; লোকায়তিক চরিত্র বলতে আমরা ঠিক কী বুঝবো এবং কোথা থেকেই বা তার নির্দেশ পাবো?

এ-বিষয়ে আমাদের একমাত্র সম্বল বলতে বিরোধী সম্প্রদায়গুলির লোকায়ত-খণ্ডন। অর্থাৎ, বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা লোকায়তের খণ্ডন-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার থেকেই লোকায়ত মতকে পুনর্গঠন করবার চেষ্টা ছাড়া আমাদের আর গতান্তর নেই। অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, এ-সম্প্রদায়ের এমনই দুর্ভাগ্য যে একমাত্র বিপক্ষের রচনা থেকেই আমাদের পক্ষে একে বোঝবার চেষ্টা করা সম্ভব।

স্বভাবতই, বিপক্ষের প্রধান উৎসাহ লোকায়ত-খণ্ডন; লোকায়ত-বর্ণন নয়। ফলে এই সূত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা যে অবিবৃক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকের বিভিন্ন সমস্যা-প্রসঙ্গে . লোকায়ত-খণ্ডনের আয়োজন করেছেন; ফলে তাদের রচনায় লোকায়ত-সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়। তাও নেহাতই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত-লোকায়তার কোনো সামগ্রিক বা ধারাবাহিক পরিচয় নয়। একমাত্র মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ, শঙ্করাচার্য রচিত বলে খ্যাত সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ এবং হরিভদ্রসুরীর ষড়দর্শনসমুচ্চয়-প্রধানতই প্রথম গ্রন্থটি-এই উক্তির আপাত

ব্যতিক্রম। কিন্তু মাধবাচার্যের লোকায়ত বর্ণনা কতোখানি নির্ভরযোগ্য সে-
আলোচনা আমরা একটু পরেই তুলবো।

বলাই বাহুল্য, লোকায়ত-সংক্রান্ত এ-জাতীয় কথা ভারতীয় দর্শনের
ছাত্রমাত্রের কাছে সুবিদিত। অতএব, যখন কাজ শুরু করেছিলাম। তখন মনে
হয়েছিলো সমস্যাটা প্রধানতই হবে তথ্যের অপ্রাচুর্য নিয়ে। অর্থাৎ, বিপক্ষের
রচনায় পাওয়া ওই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকেই লোকায়তের সামগ্রিক রূপটি
পুনর্গঠন করবার প্রয়াস করতে হবে। সে-কাজও নিশ্চয়ই যথেষ্ট দুর্লভ। কিন্তু
কিছুটা অগ্রসর হয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হলো, আসল সমস্যাট আরো অনেক কঠিন।
কেননা ওই তথ্যগুলি শুধু খণ্ড ও বিক্ষিপ্তই নয়; তাছাড়াও অত্যন্ত জটিল ও
দুর্বোধ্য; এমনকি অন্তত আপাত দৃষ্টিতে অনেকাংশেই অসংলগ্ন ও পরস্পর-
বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত যে হয়েছেন, তার একটি প্রধান কারণ আলোচ্য তথ্যের
এই আপাত-অসংলগ্নতাই। অর্থাৎ, গবেষক-বিশেষ যে-নির্বাচিত তথ্যের উপর
ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার সঙ্গে অপর গবেষক নির্বাচিত তথ্যসত্তরের
অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে সঙ্গতি নেই; ফলে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যেও যেন আকাশ-
পাতাল তফাত।

তফাত যে বাস্তবিকই কতোখানি তার কিছু নমুনা দেখা যেতে পারে।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ এবং মুয়ার উভয়েই লোকায়তকে প্রাচীন ভারতের
চিন্তা রাজ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান; কিন্তু এই সংযোগটির
কথা দু'জনে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেই কল্পনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে
মহাকাব্যের যুগে, অর্থাৎ, ৬০৭-২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে--ভারত শ্রুতি-শাসনের কঠোরতা
ভেঙে চিন্তার মুক্তি ঘোষিত হয়েছিলো এবং তারই পরিণাম হলো ওই চূড়ান্ত
নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়টি। অপরপক্ষে, মুয়ার মনে করেন অতি সুপ্রাচীন কাল
থেকেই ভারতের ধ্যানরাজ্যে চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিলো; উত্তরকালে
লোকায়তিক ও বৌদ্ধদের নাস্তিক্য-বাহুল্যের ফলেই আস্তিকেরা শঙ্কিত বোধ

করেন এবং কঠোর শ্রুতি-শাসন প্রবর্তন করেন। অতএব, রাধাকৃষ্ণণের মতে যে-লোকায়ত শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম, মূয়ার-এর মতে সেই লোকায়তই হলো শ্রুতি-শাসন প্রবর্তিত হবার কারণ।

কিন্তু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়তের মূলে ছিলো একরকম সৎকার-পদ্ধতিগত বিশ্বাস--চিন্তাজগতের মুক্তি বা স্বাধীনতা-সংক্রান্ত কোনো ব্যপারাই নয়। এবং এই সৎকার-পদ্ধতিটি আদিত্তে ভারতীয়ও ছিলো না-তার বদলে প্রাচীন সুমেরীয়ায় তা প্রচলিত ছিলো। কালক্রমে ওই সৎকার-পদ্ধতি-গত বিশ্বাসটি ভারতে এসে পড়ে এবং ভারতের জমিত্তে তার কিছু পরিবর্তনও ঘটে।

অধ্যাপক তুচির সিদ্ধান্তের সঙ্গ্লে ভারতীয় ইতিহাসের চিন্তা-স্বাধীনতা কিংবা সুমেরীয় ইতিহাসের সৎকার-পদ্ধতি-কোনো কিছুই সম্পর্ক নেই। তিনি অনুমান করছেন, লোকায়ত বলতে প্রাচীন ভারতের রাজোপদেশক পুরোহিতদের প্রজ্ঞা বোঝাতো। তখনো ধর্ম এবং অর্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু কালক্রমে সে-বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে; তখন অর্থ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারই পরিমাণ হিসাবে দেখা দেয় নিরীশ্বর ও ভোগসর্বস্ব লোকায়ত দর্শন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করছেন, লোকায়তের সঙ্গ্লে কামসাধনার -অতএব বামাচারী কাপালিকাদি সম্প্রদায়ের-একটা গভীর সম্পর্ক বা এমনকি ঐক্যও স্বীকারযোগ্য। অতএব তার সিদ্ধান্ত অনুসারে লোকায়ত আজো ভারতভূমি থেকে বিলুপ্ত হয়নি-দেহবাদী ও কামসাধক সম্প্রদায় সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতি নামান্তরের আড়ালে আজো তা আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে।

অবশ্যই রিস্ ডেভিডস্ অনেকদিন আগেই যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা স্বীকার করতে পারলে আজকের দিনে আমাদের পক্ষে লোকায়ত নিয়ে এতো রকম মতবাদের আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত বোধ করবার সম্ভাবনা থাকতো না। কেননা

তাঁর মতে লোকায়ত বলে ভারতবর্ষে কোনো কালেই কোনো রকম দার্শনিক মতবাদ ছিলো না। স্বভাবতই, আমরা যদি রিস ডেভিডসকে অনুসরণ করে লোকায়তের সমস্যাটিকেই অস্বীকার করতে পারতাম তাহলে তার সমাধান নিয়েও কোনো হাঙ্গামা থাকতো না।

বলাই বাহুল্য, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম, ভারত-তত্ত্ববিদ হিসেবে তারা সকলেই এতোখানি শ্রদ্ধেয় যে, কারুর কথাই আমরা অসংকোচে অগ্রাহ করতে পারি না। অপরপক্ষে, সকলের সিদ্ধান্তই সমানে স্বীকার করবার সুযোগ আমাদের নেই; কেননা এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়াও সাধ্যাতীত। অতএব এক্ষেত্রে সুযোগ্য বিদ্বানদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহান হবার অপ্রিয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, ভারততত্ত্ববিদ-হিসেবে ধারা অমন শ্রদ্ধেয় তারা কেউই বিনা-তথ্যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেননি এবং আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো। এই সিদ্ধান্তগুলি যতো পরস্পর বিরোধীই হোক না কেন, কোনোটিকেই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল, বিভিন্ন বিদ্বান যে-সব বিভিন্ন তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেগুলির মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে সঙ্গতি নেই। ফলে সঙ্গতি নেই তাদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেও।

প্রাচীন লোকায়ত প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিষয়টি হলো, পরস্পরের সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ যতোই থাকুক না কেন, আধুনিক বিদ্বানের মোটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ, একই পদ্ধতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন তথ্যের উপর বিভিন্নভাবে গুরুত্ব আরোপ করবার ফলেই তাদের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই মনে হয়েছিলো এমন হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে যে, আমরা যদি কোনো নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারতাম তাহলে হয়তো আলোচ্য তথ্যের আপাত-

অসংলগ্নতাও আমাদের সামনে থেকে দূর হতো। কেননা, বিশিষ্ট বিদ্বানেরা এই যে-সব বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলিকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই; অতএব সেগুলির মধ্যে বাস্তব অসংলগ্নতা থাকাও স্বাভাবিক নয়। আমাদের মনে হয়েছিলো, অধ্যাপক জর্জ টমসনের সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীতে এই জাতীয় নূতন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়-দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তারিতভাবে এই পদ্ধতিটির আলোচনা করেছি। কিন্তু তার উল্লেখ করবার আগে লোকায়তর পুনর্গঠনে সাবেক পদ্ধতিটি কেন গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, যে-কথা ব্যাখ্যা করা দরকার।

আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত ওই পদ্ধতিটি ঠিক কী?

মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক বা লোকায়ত নাম দিয়ে একটি দার্শনিক মতের বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক বিদ্বানেরা তারই উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্বে যেমন বলছেন, এ-বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রধানতম উৎস হলো সর্বদর্শন-সংগ্রহের প্রথম পরিচ্ছেদ। এইভাবে মাধবের রচনা থেকে লোকায়তর মূল ধারণাটি সংগ্রহ করে আধুনিক বিদ্বানেরা তারই আলোয় অন্যান্য-সূত্রেপাওয়া অন্যান্য তথ্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। লোকায়তর পুনর্গঠন-প্রসঙ্গে তাদের পদ্ধতি বলতে এইটিই। অবশ্যই রিস-ডেভিডস ও সচেতনভাবে এ-পদ্ধতি বর্জন করতে চেয়েছেন। কেননা তার ধারণায়, সর্বদর্শন-সংগ্রহের লোকায়ত-বর্ণন স্পষ্টই মাধবের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু শুনতে যতোই আপাত-বিরোধী মনে হোক না কেন, আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো যে, মাধবের বিরুদ্ধে রিস-ডেভিডস-এর এই আপত্তির অন্তরালে মাধবের উপরই ঐকান্তিক নির্ভরতার পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে।

মাধবের বর্ণনা থেকে শুরু করবার অবশ্যই দুটি সুবিধা আছে।

প্রথমত, মাধব যে-ভাবে লোকায়তর বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তা নেই। তার বর্ণনাটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ: লোকায়তিকের

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনো উৎস স্বীকার করে না, ফলে তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড়াভাগ্যটি ছাড়া আর কিছুই সত্তাও মানে না, অতএব তাদের কাছে ইন্দ্রিয়াভোগ্য সুখ ছাড়া আর কোনো রকম পুরুষার্থের অর্থও থাকতে পারে না। অতএব, মাধবের লোকায়ত বর্ণন তাঁর মনগড়া হোক আর নাই হোক--এর মধ্যে একটা সামগ্রিক সঙ্গতি আছে। সেখান থেকে শুরু করতে পারলে অনেকাংশেই সুনিশ্চিত বোধ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিদ্বানদের কাছে বস্তুবাদের এই বর্ণনা একটা সুপরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেননা সাধারণভাবে আধুনিক বিদ্বানদের মনে বস্তুবাদ সংক্রান্ত যে-ধারণা-এবং বিশেষত বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষ--মাধবের বর্ণনাটি তার সঙ্গে সহজেই খাপ খায়। মাধবের বর্ণনা অনুসারে লোকায়তিকের অত্যন্ত স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কোনো উচ্চতর আদর্শ স্বীকার করে না এবং আধুনিক বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন।

এই বিদ্বেষের দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো।

লোকায়তের ব্যাখ্যায় জনৈক আধুনিক বিদ্বান বলছেন, --A man who wanted to convert-let us say 'pervert'-a woman to his materialistic ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ লেখকদের কাছে বস্তুবাদ একটা বিকার-মাত্র perversion। এবং এ-মন্তব্য যেন এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে, নেহাত আনুষঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করাই যথেষ্ট-কথাটা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে কোনো রকম যুক্তিতর্কের প্রশ্ন ওঠে না।

বস্তুবাদের প্রতি মোটের উপর একই মনোভাব পোষণ করেন বলেই অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ লোকায়তের পুনর্গঠনে শুধু যে প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে রূপক নাটকটির উপর অত্যন্ত মৌলিকভাবে নির্ভর করেছেন তাই নয়, তাছাড়াও সহজ-স্বাভাবিকভাবেই বলছেন যে, উক্ত নাটকেরই একটি চরিত্রের উক্তি থেকে লোকায়ত-মতের সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করা যায়। লেখক নিশ্চয়ই জানেন, এ-

প্রস্তাব অনেকাংশেই এ্যারিস্টোফেনিসের নাটক থেকে সক্রোটসের মত ও চরিত্রের কথা উদ্ধার করবার মতো। কেননা, এ্যারিস্টোফেনিস যেমন সক্রোটসকে নিয়ে শুধুই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে চেয়েছেন অনেকটা সেইভাবেই কৃষ্ণমিশ্র ও তাঁর ওই নাটকটিতে বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত, কাপালিক প্রভৃতি বেদান্তবিরোধী মতগুলি নিয়ে শুধুমাত্র ব্যঙ্গবিদ্রূপই করবার চেষ্টা করেছেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় থেকে বৌদ্ধ বা জৈন মতের সারমর্ম উদ্ধার করবার প্রস্তাব কোনো আধুনিক বিদ্বান নিশ্চয়ই করবেন না; আধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তো ননই। কিন্তু লোকায়তার বেলায় অন্য রকম। এই মতের সারমর্ম এবং এই মত নিয়ে প্রহসন-দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, লেখকের রুচি ও বিচার অনুসারে মতটাই প্রহসনের মতো। এবং আধুনিক বিদ্বানদের প্রায় সকলেরই এই মনোভাব। কারণেই মাধবের লোকায়ত-বর্ণন। তাদের কাছে একটা পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এই দুটি আপাত-সুবিধা সত্ত্বেও আমরা মাধবের বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধা বোধ করেছি। তার কারণ শুধু এই নয় যে, আধুনিক বিদ্বানদের পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশেই এ-আস্থার পরিণাম। তাছাড়াও তাঁর রচনার আভ্যন্তরীণ সাম্ভ্য এবং তাঁর রচনা-বহির্ভূত অন্যান্য তথ্যও সুস্পষ্টভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে যায়। সেগুলির আলোচনা তোলবার আগে দেখা যাক, আধুনিক বিদ্বানদের সিদ্ধান্তগুলির পরস্পরবিরোধিতার জন্য মাধবের উপর নির্ভরতা কীভাবে বা কতোখানি দায়ী।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বলছেন, মহাকাব্যের যুগে-অর্থাৎ তার হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০-র মধ্যে--ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় নানা রকম তোলপাড় শুরু হয়েছিলো এবং তারই পরিমাণ হিসেবে চিন্তাক্ষেত্রে লোকায়ত-মতের আবির্ভাব হয়। এই যুগটিতে অনেক শতাব্দীর পুরোনো বিশ্বাস ভেঙে পড়ছিলো, টলে উঠছিলো শ্রুতির শাসন। ফলে রকমারি দার্শনিক মত ও নিষ্ফল

কল্পনার আবির্ভাব হয়। একদিকে দেখা যায় লোকায়তিকেরা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরই আশ্রয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে। অপরদিকে বৌদ্ধর উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্বমূলক ও নীতিশাস্ত্রগত শিক্ষা প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিটিকে মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, লোকায়তিকদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো পুরোনো কালের আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং জাদুবিশ্বাসের প্রভাব বর্জন করে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ঘোষণা করবার ভূমিকা। অতীতের যে-বোঝা তখনো মানুষকে নিষ্পেষিত করে রেখেছিলো তা থেকে মুক্তি পাবার আশায় চার্বাক-দর্শন যেন একরকম উন্মত্ত ব্যবহার; তবু কূপমণ্ডুকতা দূর করে এ-দর্শন মানবাত্মার মহান সৃজনী সম্ভাবনাকে মুক্তি দিয়েছিলো। অর্থাৎ অন্ধ উন্মত্ত বিক্ষোভের মতো হলেও উত্তরকালের মহান দার্মনিক প্রচেষ্টার জন্যই লোকায়ত মতের একটা প্রয়োজন ছিলো, যদিও সে প্রয়োজন নেহাতই নেতিবাচক।

এই সিদ্ধান্তটির প্রধান গুণ অবশ্যই সারল্য এবং সে-সারল্যের প্রধান কারণ হলো মাধবের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা--লেখককে যেন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে লোকায়ত- সংক্রান্ত যে-সব তথ্য মাধবের বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলিকে অবজ্ঞা করতেই হবে। অতএব লোকায়ত-প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাখাকৃষ্ণ সর্বদর্শনসংগ্রহ ছাড়া কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় এবং শঙ্করাচার্য-বিরচিত বলে খ্যাত (যদিও এগলিং-এর মতে এ খ্যাতি ভিত্তিহীন) সর্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ বলে গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন; সর্বদর্শনসংগ্রহের মতোই এ-দুটিও অর্বাচীন রচনা, এ-দুটিও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যেই রচিত এবং এ-দুটিও লোকায়তকে নেহাতই নেতিমূলকভাবে বর্ণনা করেছে-লোকায়ত অনুমান মানে না, ঈশ্বর আত্মা পরকাল পরলোক মানে না, ধর্ম ও মোক্ষ বলে পুরুষার্থ মানে না। লোকায়তার শুধু এই নিছক নেতিমূলক বর্ণনাকে গ্রাহ্যের মধ্যে এনেছেন বলেই, এবং বৌদ্ধ জৈন ও এমনকি রামায়ণ মহাভারত উপনিষদাদি গ্রন্থের সাক্ষ্যকেও প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন বলেই লোকায়তার ব্যাখ্যায় অধ্যাপক

রাধাকৃষ্ণণের কাছে একমাত্র প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দাঁড়ালো: প্রাচীন ভারতে এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব কী করে সম্ভব হয়েছিলো এবং ঐতিহাসিকভাবে তার সার্থকতাই বা কতোটুকু? সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে পুরোনো কালের বিশ্বাস ভেঙে পড়ছিলো—এমন কোনো যুগের প্রকল্প তার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর যোগাতে পেরেছে। এবং এরই উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, লোকায়ত-মত যতোই নেতিবাচক হোক না কেন প্রাচীনকালে তা আমাদের দেশের ধ্যানরাজ্যে মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো।

শ্রীযুক্ত জে. মূয়ার প্রধানতই মাধবের নেতিমূলক বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন বলেই তাঁর কাছেও লোকায়ত প্রাচীন ভারতের ধ্যানরাজ্যে মুক্তি ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর মতে এ-মুক্তি শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম নয়, বরং শ্রুতি-শাসন কঠোর ও সংহত হবার কারণ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে তার সিদ্ধান্তের এই প্রভেদটির কারণ কী? আসলে, মাধবের বর্ণনা ছাড়াও তিনি লোকায়ত-সংক্রান্ত আরো কিছু প্রাচীনতর তথ্যকে স্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এই বাড়তি তথ্যের সঙ্গে মাধবের বর্ণনার অন্তত আপাত-দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রকট বৈষম্য চোখে পড়ে। অথচ শ্রীযুক্ত মূয়ারের মনে মাধবের প্রতি নির্ণাই সবচেয়ে মৌলিক। ফলে তিনি এমন একটি প্রকল্পে উপনীত হবার চেষ্টা করছেন যার যাহায্যে ওই আপাত বৈষম্যটুকুর ব্যাখ্যা করা যায়। বাড়তি তথ্য হিসেবে তিনি দেখছেন, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ-দেশে নাস্তিক -- অতএব লোকায়তিক--চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি রামায়ণেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ জাবালি রামচন্দ্রকে যে-উপদেশ দিচ্ছেন তা নাস্তিকতায় ভয়ঙ্কর। অমন ভয়ানক নাস্তিক্যমূলক বলেই এ-উপদেশকে শ্রীযুক্ত মূয়ার লোকায়তিক বলে সনাক্ত করছেন-অবশ্য এই সনাক্তিকরণের পিছনে তাঁর মনে শুধুই যে মাধবের প্রভাব আছে তাই নয়,বিষ্ণুপুরাণ-বর্ণিত মায়ামোহপ্রচারিত লোকায়ত-

মতের সঙ্গে জাবালির উপদেশটির নিকট সাদৃশ্যও তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মাধবের বর্ণনার সঙ্গে রামায়ণের এই তথ্যটি অসঙ্গতি কোথায়? রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে চাবালি ছিলেন ব্রাহ্মণ। অতএব শ্রীযুক্ত মূয়ার মনে করছেন, রামায়ণের এই অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় (এবং তাঁর মনে অংশটি সত্যই প্রক্ষিপ্ত নয়) তাহলে মানতে হবে যে, রামায়ণ রচিত হবার যুগেও একজনের পক্ষে ব্রাহ্মণ হয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকায়াত-মত পোষণ করায় বাধা ছিলো না। কিন্তু তা কী করে সম্ভব হতে পারে? মূয়ার মনে করছেন, একমাত্র এই সতর্ক ঘটনাটি সম্ভব হতে পারে যে, তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে শুধু কয়েকটি আনুষ্ঠানিক দিক বজায় রাখাই যথেষ্ট, কিন্তু তার সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ মানা-না-মানার বাধ্যবাধকতা ছিলো না--অর্থাৎ তখনো চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্তমান ছিলো। অতএব, অতি সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষে চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়ে আসছে, রামায়ণ রচনার যুগেও চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ করা হতো না। চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক পরে। আসলে, বৌদ্ধ লোকায়তিক প্রভৃতি নাস্তিকদের আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠার পর থেকেই আস্তিক্য বা বেদপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত কঠোর শ্রুতি-শাসন প্রবর্তন করতে চাইলেন। অতএব মাধবের লোকায়ত বর্ণনের সঙ্গে লোকায়ত সংক্রান্ত কিছু বাড়তি তথ্যের সঙ্গতি খুঁজতে গিয়ে শ্রীযুক্ত মূয়ার অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন; লোকায়ত-মত চিন্তা রাজ্যে শ্রুতি-শাসন প্রবর্তনের কারণ, শ্রুতি-শাসন ভেঙে পড়বার পরিণাম নয়।

এবং একই কারণে-অর্থাৎ, মাধবের বর্ণনার সঙ্গে কিছু বাড়তি তথ্যের সঙ্গতিরক্ষার চেষ্টায়-অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও লোকায়ত-সংক্রান্ত তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যদিও বাড়তি তথ্য হিসেবে তিনি বিশেষ করে যেটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা অনেকাংশে অভিনব বলেই অধ্যাপক দাসগুপ্তের সিদ্ধান্তটিও অভিনব হয়ে দাঁড়ালো। তিনি কোন তথ্যের উপর গুরুত্ব

আরোপ করছেন? ছন্দোগ্য-উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ; অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন মনে করেছিলেন দেহই আত্মা, এই কারণেই অসুরের মৃতব্যক্তির দেহ সুশোভিত করে এবং খাদ্যাদির সম্ভার সহকারে তার কবর দেয়। অধ্যাপক দাসগুপ্তের ধারণায় অম্বর বলতে প্রাচীন সুমেরীয়দের বুঝতে হবে এবং উক্ত সংকার-পদ্ধতি তাদেরই বৈশিষ্ট্য। এই সংকার-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত দেহাত্মবাদই কালক্রমে আমাদের দেশে এসে লোকায়ত-মতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত-সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে অধ্যাপক দাসগুপ্তের কাছেও মাধবের বর্ণনাই প্রধানতম অবলম্বন বলেই তিনি এখানে একটিমাত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন; ছন্দোগ্য বর্ণিত ওই অসুরমত কীভাবে কালক্রমে মাধব-বর্ণিত লোকায়ত-মতে পরিণত হলো? ঐতিহাসিক বিবর্তন মূলক একটি প্রকল্পের সাহায্যে তিনি এ সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। আমরা গ্রন্থমধ্যে অধ্যাপক দাসগুপ্তের এই সিদ্ধান্তটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং লোকায়তের সঙ্গে অসুরমতের সাদৃশ্যমূলক ইংগিতটির তাৎপর্য কী হতে পারে তারও আলোচনা তুলেছি।

অধ্যাপক তুচি সিদ্ধান্ত করছেন, শুরুতে লোকায়ত ছিলো রাজোপদেশক পুরোহিত শ্রেণীরই প্রজ্ঞা-তখনো পুরুষার্থ হিসেবে ধর্ম ও অর্থের মধ্যে বিরোধ ফুটে উঠেনি। অর্থ বলতে তিনি এখানে রাজার দণ্ডনীতি ইত্যাদি বুঝতে চেয়েছেন এবং তাঁর ধারণায় এ-জাতীয় রাজনৈতিক কুটবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক খুব বেশিদিন টিকতে পারে না। রাজনীতিকদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রমশই ধর্ম-শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে লাগলেন এবং দাবি করলেন পার্থিব ব্যাপারে ঈশ্বর ও পুরোহিতদের হস্তক্ষেপ স্বীকার করা হবে না। এ-অবস্থায় সাধারণত যা ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। শুধুই যে ধর্মের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো তাই নয়, অর্থ যেন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এবং এই ভাবেই

কালক্রমে লোকায়তায় আদিরূপটি পরিবর্তিত হয়ে মাধব-বর্ণিত ওই সুখবাদী নিরীশ্বর ও জড়বাদী দর্শনে পরিণত হলো।

অবশ্যই অধ্যাপক তুচি ধর্ম ও অর্থের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের এই কাহিনীটির পক্ষে বিশেষ কোনো তথ্য, যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থিত করেননি; উপস্থিত করা একান্তই সম্ভব কিনা তাও হয়তো সন্দেহের কথা। অতএব প্রশ্ন ওঠে, তিনি কেন এ-জাতীয় একটি কাহিনী রচনা করতে বাধ্য হলেন? তার রচনা বিশ্লেষণ করলে এর কারণ দেখতে পাওয়া যায়। মাধবের চেয়েও অনেক পুরনো সূত্রে তিনি লোকায়ত-সংক্রান্ত এমন কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যার সঙ্গে মাধবের এই বর্ণনাটি খাপ খায়না-পাদটীকায় এ-জাতীয় তথ্যের নমুনা দেওয়া গেলো। এই গরমিল থেকে অধ্যাপক তুচি অবশ্যই মাধবের বর্ণনাটিকে সন্দেহ করতে পারতেন; কিন্তু অন্যান্য আধুনিক বিদ্বানদের মতোই তাঁর কাছেও এ-বর্ণনাই চূড়ান্ত মূল্যবান। ফলে তার পক্ষেও এমন কোনো প্রকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হলো যার সাহায্যে প্রাচীনতর সূত্রে পাওয়া লোকায়তর আদিরূপটিই কীভাবে কালক্রমে মাধব-বর্ণিত লোকায়তে পরিণত হয়েছিলো সে-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মাধবের বর্ণনাটি থেকেই শুরু করেছেন। ‘লোকায়ত’ নামে তার ক্ষুদ্র কিন্তু অমূল্য পুস্তিকার প্রারম্ভেই তিনি বলছেন, সর্বদর্শন সংগ্রহ বলে গ্রন্থটি অনেকদিন আগেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং আমি অচিরেই চার্বাক-দর্শন সংক্রান্ত পন্থাংশটুকু মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। স্বভাবতই, মহামহোপাধ্যায় তাঁর পুস্তিকাটির প্রথমাংশে সর্বদর্শন-সংগ্রহের ভিত্তিতেই লোকায়তর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর পুস্তিকাটির প্রথমাংশে সর্বদর্শন-সংগ্রহের ভিত্তিতেই লোকায়তর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো বিদ্বানের পক্ষে লোকায়তর পুনর্গঠন প্রসঙ্গে স্বা থাকা সম্ভব হয়নি। তাই অনুষ্ঠান্য সূত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত আর কী তথ্য পাওয়া যায় তিনি সে প্রশ্ন

তুলেছেন। এবং এ জাতীয় তথ্যের অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়কর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন, বৃহস্পতি সূত্রে হয়েছে অর্থ-সাধন ব্যাপারে লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে-মহামহোপাধ্যায়ের বর্ণনায়, প্রায় একনিঃশ্বাসে-বলা হয়েছে যে, কামসাধন ব্যাপারে কাপালিকই একমাত্র শাস্ত্র। স্বভাবতই মহামহোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, এইভাবে একনিঃশ্বাসে লোকায়ত ও কাপালিক-অর্থসাধন ও কামসাধন-দ্বয়ের উল্লেখ করবার পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংগিত থাকাই সম্ভবপর। এবং সে-ইংগিতটিরর তাৎপর্য আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জৈন লেখক গুণরত্নের রচনায়। গুণরায় বলছেন, লোকায়তিকের মদ্যপান করে, মাংস ভক্ষণ করে তারা মৈথুনাসক্ত। শুধু তাই নয়, তারা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা যোগী। এবং প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে অবাধ মৈথুনে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে তারা একত্রে মিলিত হয়। এ-বর্ণনা স্বভাবতই মহামহোপাধ্যায়কে বামাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলির কথা মনে করিয়েছে এবং তিনি জানেন যে, এ-জাতীয় তান্ত্রিক সম্প্রদায় আমাদের দেশ থেকে আজো বিলুপ্ত হয়নি। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করছেন সহজিয়া বৈষ্ণব ইত্যাদি নামান্তরের আড়ালে লোকায়ত সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে টিকে রয়েছে। সেই সঙ্গেই কিন্তু তিনি বলেছেন, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি অধঃপতিত মহাধান-বৌদ্ধধর্মেরই স্মারকমাত্র। এবং বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের কারণটাও হলো প্রাকৃতজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত-লোকেষু আয়ত--হয়ে পড়া। এইভাবে স্থূল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শগুলি নষ্ট হলো এবং ক্রমশই তা বীভৎস কামবিকারে পরিণত হয়ে পড়লো। সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি সংক্রান্ত মহামহোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করেছি।

যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে, মাধব বর্ণিত লোকায়তের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কী, সাদৃশ্য কোথায়? এবং যদি কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া না

যায় তাহলে তাঁর উক্ত সিদ্ধান্তের দিক থেকে মাধবের লোকায়ত বর্ণনাকে সন্দেহ করবার প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মাধবের প্রতি তার নিষ্ঠা কতোখানি গভীর। অতএব, মাধবের বর্ণনা সন্দেহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তিনি এ-প্রশ্নটিই তুললেন না। তার দরুন কিন্তু তার পুস্তিকার প্রথমাংশের সঙ্গে শেষাংশের কোনো সঙ্গতি রইলো না: তিনি যেন তথ্যের খাতিরে সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিকেই স্বীকার করে নিলেন।

প্রধানত তাঁর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির উপর নির্ভর করেই ডাক্তার দিক্কাণারঞ্জন শাস্ত্রী ভারতীয় বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন এবং মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিকেও সাধ্যমতো সঙ্গত করে নেবার চেষ্টা করেছেন। কীভাবে তা করা যায়? কী করে মাধবের বর্ণনার সঙ্গে কামাচারী তাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলির কথা খাপ খাওয়ানো সম্ভব হতে পারে? ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর যুক্তিটি মোটের উপর এই; মাধব বলেছেন লোকায়তিকেরা ইন্দ্রিয়ভোগ ছাড়া আর কোন আদর্শ মানতো না, অতএব এই ভোগবাদের প্রভাবেই দেশে নীতিগহিত অবাধ মৈথুনের উৎসাহ দেখা দিলো। কিন্তু সমস্যা হলো, এ-জাতীয় বামাচারী ধ্যানধারণার প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতো ব্যাপক ও গভীর তার একটি প্রমাণ উড়িষ্যা প্রভৃতির মন্দির ভাঙ্কার্য। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে যদি শুধুমাত্র মৈথুনাসক্তিরই পরিচায়ক মনে করতে হয় এবং এই মৈথুনাসক্তিকে যদি ভোগসর্বস্ব লোকায়ত-মতের প্রভাব-পরিণাম বলেই গ্রহণ করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার প্রয়োজন পড়ে যে, পুরো দেশটাই যেন লোকায়ত-মতের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলো। ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এই রকমই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, লোকায়ত ছিল সুখবাদ, আনন্দ-উচ্ছল; তারই প্রভাবে ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগে মন্দির আর রাজদরবার, শিল্প আর সাহিত্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উৎসাহে ভরপুর হয়েছিলো, সারা দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিলো কামসর্বস্বতার প্লাবন-ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত,

রাজা থেকে ভিথিরি পর্যন্ত সকলেই মদনোৎসবে মেতে উঠতো, সে উৎসবের মূল কথা হলো মদন বা কামের উপাসনা। আমরা গ্রন্থমধ্যে ডক্টর শাস্ত্রীর এই সিদ্ধান্তটি বিচার করবার চেষ্টা করেছি।

যদিও ঠিক কবে, কোন যুগে, সমগ্র ভারত এ-ভাবে লোকায়ত-মতের প্রভাবে প্লাবিত হয়েছিলো লেখক সে-কথা আমাদের বলেননি, তবুও নিশ্চয়ই রাজা থেকে ভিথিরি পর্যন্ত সকলের পক্ষে একটি মতবাদ নিয়ে এমনভাবে মেতে ওঠবার কাহিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর মনে হতে বাধ্য। তাই এর পর লোকায়ত সংক্রান্ত রিস ডেভিডস এর সিদ্ধান্তটি শুনতে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই মনে হবে। কেননা তিনি বলছেন, কোনোকালেই এ-দেশে লোকায়ত-দর্শন বলে কোনো কিছুই ছিলো না। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়ত-সংক্রান্ত মতো তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করেছেন।

Throughout the whole story we have no evidence of any one who called himself a Lokayatika....And of the real existence of a school of thought, or of a system of philosophy that called itself by that name, there is no trace.

অবশ্যই, নিজেকে লোকায়তিক বলছেন এমন কারুর কথা কোথাও পাওয়া যাক আর নাই যাক অপরকে লোকায়তিক বলে সনাক্ত করবার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই বিরল নয়। এসব ক্ষেত্রে লোকায়ত বলতে কী বোঝা দরকার? রিস ডেভিডস বলছেন, folk-lore বা nature-lore

After the early use of the word in some such sense as Nature-lore or folk-lore, there is a tone of unreality over all the statements we have...In the middle period, the riddles and

quibbles of the nature-lorists were despised. In the last period the name Lokayata, Lokayatika became hobby horses, pegs on which certain writers can hang the views that they impute to their adversaries, and give them, in doing so, an odious name.

প্রশ্ন হলো, রিস-ডেভিডস কেন এ-জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? অন্যান্য বিদ্বানদের মতো তার বেলাতেও কি এ-কথা খাটে যে, মাধবের উপর নির্ভরতাই এর প্রধান কারণ? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, তা হতে পারে না। কেননা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মাধবের এ-বর্ণনাকে সরাসরি কাল্পনিক বলতে চেয়েছেন:

His very able description has all the appearance of being drawn from his own imagination.

তবুও, শুনতে যতোই আপাত-অসম্ভব মনে হোক না কেন, মাধব সম্বন্ধে এই তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও মাধবের উপর প্রচ্ছন্ন নির্ভরতার দারুণই তিনি শেষ পর্যন্ত লোকায়তকে এভাবে অলীক মনে করেছেন। যেন মাধবের যাথার্থ্যের উপরই লোকায়ত সত্তা নির্ভর করছে-- তাঁর বর্ণনা যদি কাল্পনিক হয় তাহলে লোকায়তই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, মাধবের এই বর্ণনাটিই লোকায়ত প্রসঙ্গে আমাদের একমাত্র সম্বল এবং এ-সম্বলটি কাল্পনিক বলেই সামগ্রিকভাবে লোকায়তকে কাল্পনিক মনে করা প্রয়োজন।

রিস-ডেভিডস-এর যুক্তিটি ভালো করে বিশ্লেষণ করলে এ-কথা বুঝতে পারা যাবে। তিনি লক্ষ্য করছেন, বৌদ্ধ-গ্রন্থাবলী অনুসারে যে-ক'টি বিষয়ে

পারদর্শিতা বিদ্বান ব্রাহ্মণের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত, তার মধ্যে একটি হলো ওই লোকায়ত।

...the description of the good Brahmana, as put in the Buddhist Suttas, into the mouth of the Brahmanas themselves, mentions lokayata as one branch of his learning. The whole paragraph is complementary. And though the exact connotation of one or two of the other terms is doubtful, they are all descriptive of just those things which a Brahmana would have been rightly proud to be a master of.

বলাই বাহুল্য, উত্তরকালে ব্রাহ্মণ-শ্রেণী বলতে আমাদের যে সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে এ জাতীয় তথ্য খাপ খায় না। তাই এ জাতীয় তথ্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হলে বৌদ্ধশাস্ত্র-বর্ণিত ব্রাহ্মণ বলতে আমাদের চলতি ধারণাটির সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তাছাড়া আরো একটি সম্ভাবনাও রয়েছে। আমাদের মনে সাধারণত লোকায়ত বলতে যে-ধারণা আছে হয়তো সেটিও সংশোধন-সাপেক্ষ—এবং এই ধারণাটি মূলতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া।

প্রসঙ্গান্তরে ব্যক্ত ওখ রিস-ডেভিডস-এর মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ব্রাহ্মণ সংক্রান্ত চলতি ধারণাটিকে সংশোধন করতে তিনি হয়তো আমাদের উৎসাহিতই করবেন। বৌদ্ধ-ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থার পরিস্থিতি এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ সংক্রান্ত তাঁর সিদ্ধান্তগুলি মনে রাখলে বৌদ্ধভারতে ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদবিরোধী অর্থে নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব খাপছাড়া মনে না হতেও পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, প্রধানতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের চলতি ধারণাটি সংশোধন করবার কথা।

রিস্ ডেবিডস এর যুক্তিটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি এই বর্ণনাটিকে কাল্পনিক মনে করলে সামগ্রিকভাবে লোকায়তকেও অলীক মনে করা প্রয়োজন-
- যেন লোকায়তের পুনর্গঠনে মাধব ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, মাধবকে মানতে পারা-না-পারার উপরই লোকায়তকেও মানতে পারা-না-পারা নির্ভর করেছে। কিন্তু এইভাবে লোকায়তকে অলীক মনে করলেও প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত লোকায়ত শব্দটির একটা ব্যাখ্যা চাই। লেখক বলছেন, লোকায়ত বলতে প্রথমে বোঝাতো nature-lore বা folk-lore, কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা দার্শনিক মত নয়। ক্রমশ ফোকলোর নির্দিষ্ট হয় এবং শেষপর্যন্ত লোকায়ত শব্দটিই শুধু একটা গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। ফোকলোর মানে কী, তার মধ্যে কোনো আদিম পর্যায়ের বিশ্বাস ও তত্ত্বের পরিচয় আছে কিনা এবং কী ভাবে ও কেন আমাদের দেশের বর্তমানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুসারেই রিস্ ডেবিডস-এর এই মন্তব্য গ্রহণ করায় বাধা আছে। প্রথমত, আমরা আগেই দেখেছি যে, লোকায়তিকদের নিজস্ব রচনা বিলুপ্ত হলেও আমরা এ-কথা মানতে বাধ্য যে, কোনো এককালে এ জাতীয় রচনা যে সত্যিই ছির সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, সে-রচনা বিলুপ্ত হলেও লোকায়ত-খণ্ডের নিদর্শন দুর্লভ নয় এবং এগুলি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের--প্রধানতই দেহাত্মবাদের--খণ্ডন। শঙ্করাচার্যের রচনাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, শঙ্করাচার্য যে-মতটি খণ্ডন করছেন তার আসল নাম লোকায়ত নয় এবং তার আসল নামটি উহ্য রেখে কেবল একটা সুবিধাজনক গালাগালি হিসেবেই তিনি একে লোকায়ত বলেছেন।

বাধবের রচনাভঙ্গি। অধ্যাপক ই.বি. কাওয়েল লিখছেন, বিপক্ষের মতবাদ আলোচনা করবার সময় মাধব এক অদ্ভুত পরিহাস-রসের পরিচয় দেন-তিনি যেন বিপক্ষের স্থান নিজেই গ্রহণ করেন এবং এমন একটা ভঙ্গিতে তর্ক করেন

যে, আসলে যে-মতবাদের সঙ্গে তার সত্যিই কোনো সম্পর্ক নেই সাময়িকভাবে তিনি যেন সেই মতবাদটিই গ্রহণ করেছেন!

অধ্যাপক কাওয়েল এর এ মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে বোঝা যায়, সৃজনী চিন্তার প্রতিভায় মাধব অসামান্য ছিলেন; কিন্তু এর থেকেই অনুমান করা প্রয়োজন যে, মাধবের বর্ণনা থেকে তাঁর বিপক্ষ-মতকে বোঝাবার চেষ্টা বিপজ্জনক। যেমন, প্লেটোর তুলনায় জেনোফেন অনেক কম প্রতিভাশালী ছিলেন বলেই সত্রেটিসের মত নৈর্ব্যক্তিকভাবে বোঝাবার জন্য জেনোফেনের বর্ণনার উপর নির্ভর করা তুলনামূলক নিরাপদ-- অনেকটা সেই রকম। যদিও অন্যান্য দিক থেকে দুটি পরিস্থিতিতে বহু প্রভেদ আছে।

মাধবের ওই প্রতিভাই তার রচনার নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরায়। লোকায়তিকেরা ঠিক কী ভাবে তর্ক করেন, ঠিক কী তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে চান- শুধুমাত্র তারই একটা সহজ পরিচয় দিয়ে সম্ভ্রষ্ট থাকা মাধবের মতো প্রতিভাশালীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার বদলে তিনি যেন এ-কথা বলতেই অনেক বেশি ব্যস্ত যে, তিনি নিজে যদি লোকায়তিক হতেন তাহলে ঠিক কী ভাবে তর্ক করতেন, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করতেন। এককথায়, নিজস্ব সৃজনী চিন্তার বন্যায় তিনি যেন ভেস যান; ফলে রোকায়তর বাস্তব বর্ণনাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

এর ফলে নানা রকম অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মাধব নিজে ছিলেন বৈদান্তিক; এবং লোকায়তিকের তর্কপদ্ধতি আর যাই হোক বৈদান্তিকের মতো হতে পারে না। কেননা, বেদান্ত মতে শুধিই চূড়ান্ত প্রমাণ, অতএব শুতনুগ্হীত তর্কের মূল্য থাকতে পারে কিন্তু শুধু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। এই কারণে বৈদান্তিকেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা রকম যুক্তিতর্ক দিলেও শেষ পর্যন্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেই নিজেদের বক্তব্যকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। বলাই বাহুল্য, এ-পদ্ধতি লোকায়ত-স্বীকৃত হতে পারে না; কেননা

মাধবের রচনা ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে অন্তত এটুকু বােঝা যায় যে, লোকায়তকের শ্রুতি-বিরোধী ছিলেন। অতএব, লোকায়তকের যে আত্মপক্ষ সমর্থনে শ্রুতি উদ্ধৃত করবেন এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই প্রবাদ-বচনের ‘ভূতের মুখে রাম নামের’ চেয়েও সুদূরপর্যায়ত। অথচ নিজের তর্কপদ্ধতি নিয়ে মাধব এমনই বিভোর যে, লোকায়তকদের মুখে শ্রুতিবাক্য বসিয়ে দিতেও তার দ্বিধা হয়নি: “তত্র পৃথিব্যাदीनि भूतानि चत्वारि तद्भानि। तेभ्य एव देहाकार परिणतेभ्यः विधादिभ्यो मदशक्तिवच्छेतन्यमुपजायते। तेषु विनष्टेषु संयुस्यं विनश्यति। तदाहः- ‘विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुखाय तान्येवासु विनश्यति न प्रेत्य संज्जाति’। बृहदारण्यक उपनिषद, २, ४, १२ ॥ बलाइ बाह्य, बृहदारण्यकेरु एइ उद्धृतिटिर तात्पर्य याइ होक ना केन, लोकायतिकेरा ये तारइ साहाये निजेदेर मत प्रतिष्ठा करवार चेस्टा करबेन--एकथा कल्लनातीत। अथच, माधव अति अनायासेइ ता लोकायतिकदेर उपरेओ आरोप करेहेन! एवं माधवेर रचनाभङ्गि यदि एकइ रकम हय तहले ताँर वर्नार उपर निर्भर करे लोकायतर अकुट्रिम परिचय पावार सम्भावना सतिइ कतोटुकु?

माधवेर राचनार आर एकटि आभ्यन्तरीण साम्ब्य विचार करा याक। आमरा साधारणत धरे निइ ये, लोकायतिकेर अनुमानके असिद्ध मने करेन एवं अतएव प्रमाण हिसेवे अनुमान-निर्भर श्रुति प्रभृतिरओ मूल्य अस्वीकार करे तारा शुधु इन्द्रिय-प्रत्यक्षकेइ प्रमाण हिसेवे स्वीकार करेन। आमादेर एइ चलति धारणाटि प्रधानतइ माधवेर काछ थेके पाओया एवं लोकायतिकेरा ये कीभावे अनुमानके अप्रतिष्ठ बले प्रतिपन्न करते चान ए-विषये माधव एकटि सुचिन्तित युक्ति प्रदर्शन करेहेन। बलाइ बाह्य, ए-रकम चुडास्त अर्थे अनुमानेर मूल्य अस्वीकार करले तर्कपद्धतिरइ कोनो रकम निर्भरयोग्यता थाके ना। फले, लोकायतिकदेर जबाब देओयाओ अनेक सहज हय; तोमराइ बलो अनुमानेर कोनो मूल्य नेइ अथच तोमराइ आवार तर्क करे से-कथा प्रमाण करते चाओ।

কিংবা, নৈয়ায়িক উদয়ন যেমন বলছেন, লোকায়তিকদের এ-দাবি মানলে এমনকি ব্যবহারিক জীবনও অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেননা ঠিক বর্তমান মুহুর্তে ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে যেটুকু জানা যাচ্ছে তা ছাড়া আর কিছুই সত্তাই মানা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লোকায়তিকদের নিয়ে এ-ভাবে যুক্তিতর্কের মূল্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করানোর ব্যাপারে মাধব সত্যিই কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ? অর্থাৎ সত্যিই কি লোকায়তিকেরা এমন চূড়ান্ত অর্থে অনুমানের মূল্য অস্বীকার করেছেন যে, তাঁদের দাবি অনুসারে যুক্তি মাত্রই নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়? না, এখানেও মাধব তাঁর নিজস্ব ধারণাই লোকায়তিকদের উপর আরোপ করবার আয়োজন করছেন?

পঞ্চদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ টীকাকার রোকায়তকে 'বিতণ্ডা-বাদ-সথ্থ' বলে বর্ণনা করেছেন। সথ্থ মানে শাস্ত্র। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন, একই সঙ্গে লোকায়ত কীভাবে বিতণ্ডা এবং বাদ উভয় শাস্ত্র হতে পারে? কেননা, নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যা অনুসারে 'বিতণ্ডা' হলো কোনো নির্দিষ্ট মত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা না করে শুধুই নেতিমূলক কুটতর্ক; এবং 'বাগ' চুলো একটি নির্দিষ্ট মত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সুস্থ তর্ক। উত্তরে অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলছেন, বৌদ্ধর "বিতণ্ডা" এবং 'বাদ' দুয়ের মধ্যে এ-জাতীয় প্রভেদ করতেন না। তাই যদিও নৈয়ায়িক অর্থে লোকায়ত শুধু বিতণ্ডাই ছিলো তবুও বৌদ্ধরা তাকে 'বাদ' বলতেও দ্বিধা করেননি। অবশ্যই এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বৌদ্ধর লোকায়তকে এই রকমই বৃথা-তর্কে ব্যাপ্ত বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে-বর্ণনা যে অনেকাংশেই কাল্পনিক এ-কথা সন্দেহ করবারও কারণ আছে। কেননা বৌদ্ধর লোকায়তিকদের উপর এমন কিছুকিছু তর্ক আরোপ করেছেন যা স্পষ্টতই আজগুবি এবং অসম্ভব। যেমন: কাক সাদা, কেননা তার হাড় সাদা; বক লাল কেননা তার রক্ত লাল। বলাই বাহুল্য, লোকায়তিকেরা যদি এ-জাতীয় আজগুবি তর্কে ব্যাপ্ত থাকতেন তাহলে তাঁদের কথা খণ্ডন করবার জন্য বিপক্ষের এমন মাথা ব্যাথা থাকতো না। তাছাড়া অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথাও অনুমান

করবার সুযোগ আছে যে, লোকায়তিকের শুধুমাত্র নিষ্ফল কুটতর্ক করতেন না। শুক্রনীতিসার অনুসারে নাস্তিক-শাস্ত্র তর্কবিদ্যায় পারদর্শী। মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি চার্বাকদের তর্কবিদ্যার উল্লেখ করেছেন এবং স্বয়ং মনু হেতুশাস্ত্র এবং হৈতুকাঃ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলছেন যে, এখানে লোকায়তিকদেরই উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, কেননা নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদেরও যদিও হৈতুকাঃ বা তর্কী বলে উল্লেখ করবার দৃষ্টান্ত আছে। তবুও এগুলি আস্তিক সম্প্রদায়; অপরপক্ষে মনু-উল্লিখিত হৈতুকরা নাস্তিক ছিলেন। ভাগবতপুরাণেও নাস্তিক এবং পাষণ্ডীদের সঙ্গেই হৈতুকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্যই মনু এই হৈতুকদের বিরুদ্ধে কঠিন বিধান দিয়েছেন। কিন্তু তার থেকে শুধু এটুকুই প্রমাণ হয় যে, লোকায়তিকরা বেদ বিরোধী তর্ক করতেন; অর্থাৎ এ কথা প্রমাণ হয় না যে, তারা নিষ্ফল বিতণ্ডায় ব্যাপ্ত থাকতেন। অপরপক্ষে কৌটিল্য সাংখ্য ও যোগের সঙ্গেই আত্মক্ষিকী হিসেবেই লোকায়তার উল্লেখ করেছেন এবং লোকায়ত সেখানে নিন্দিত নয়। তাছাড়া, দীঘনিকায় (৩, ১, ৩) এবং অঙ্গুর (১, ১৬৩) বলে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে লোকায়তর উল্লেখ পাওয়া যায়, হয়তো এখানেও লোকায়ত-শাস্ত্র বলতে তর্কশাস্ত্রই বোঝানো হয়েছে।

এ-জাতীয় তথ্য থেকে অন্তত এটুকু কথা অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে,তর্কের--তথা অনুমানের--প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গিটা মূলতই নেতিবাচক ছিলো না। অথচ, মাধবের লোকায়ত-বর্ণনের তাৎপর্য তাই-ই। ফলে এদিক থেকেও মাধবের বর্ণনাটিকে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে। শুধু তাই নয়; লোকায়তিকের ঠিক কী বলেন এবং কী ভাবে তা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন তার নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা দেবার চেয়েও মাধবের বড়ো উৎসাহ হলো, তিনি নিজে লোকায়তিক হলে কী বলতেন এবং কী ভাবে সে-কথা প্রতিপন্ন করবার

চেষ্টা করতেন। সেইহেতু অনুমানের-তথা তর্কের-প্রামাণ্য-প্রসঙ্গে লোকায়তিকদের উপর তিনি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছেন যা সত্যি বলতে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁর নিজেরই--অর্থাৎ বৈদান্তিকেরই--দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করেছেন যা সত্যি বলতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁর নিজের বৈদান্তিকেরই--দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে একমাত্র বেদান্ত-সম্প্রদায়ই তর্কের প্রমাণ্যের প্রতি এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। বেদান্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা উত্তরকালে অনুমান-প্রসঙ্গে যে-মন্তব্যই করুন না কেন, আমাদের পক্ষে বাদরায়ণের রচনার উপর নির্ভর করেই বোস্তের মূল কথা বোঝা দরকার এবং বাদরায়ণ বলছেন তর্ক অপ্ৰতিষ্ঠ। কেননা প্রমাণ হিসেবে একমাত্র শ্রুতিরই মূল্য আছে। যদি সামগ্রিকভাবে তর্কই অপ্ৰতিষ্ঠ হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান-পদ্ধতির কোনো প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা যায় না। অতএব, অনুমানও অপ্ৰতিষ্ঠ। এবং এটি মাধবের মত, যদিও তিনি তা লোকায়তিকদের উপরই আরোপ করেছেন। অপরপক্ষে, কৌটিল্য প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তর্কের প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই এমন নেতিবাচক ছিলো না; বরং তাঁরাই হয়তো ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তর্ক-বিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন। কেননা এর চেয়ে কোনো পুরোনো সূত্রে আত্মীক্ষিকী হিসেবে আর কোনো দার্শনিকদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তর্কের প্রমাণ্যের প্রতি এ-রকম মূলতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও লোকায়তিকেরা হয়তো শুধুমাত্র নেতিবাচক উদ্দেশ্যই-ন্যায়াশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুসারে শুধুমাত্র বিতণ্ডা হিসেবেই তর্কের ব্যবহার করতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী--যেমন বলেছেন, they have a few doctrines to defend but a lot to assail, ইত্যাদি। এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমরা প্রধানত এই রকমই একটা ধারণা পেয়েছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, লোকায়ত সংক্রান্ত তথ্যের উৎস

বলতে বিপক্ষের রচনাই এবং বিপক্ষেরা স্বভাবতই লোকায়তিকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই লোকায়তিকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন; অর্থাৎ, লোকায়তিকের তাদের দাবিগুলি যে-ভাবে খণ্ডন করতে চান তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের তথ্যটুকুই প্রধানত নেতিবাচক-লোকায়তিকের কী কী মানেন না তারই পরিচয়। অতএব, আমাদের মনেও এমন একটা ধারণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয় যে, লোকায়তিকের বিশেষ কিছুই মানেন না, তার বদলে সব কিছুই যেন শুধু অস্বীকার করতে চান। কিন্তু লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের ধারণার এই অসম্পূর্ণতাকে লোকায়তের বৈশিষ্ট্য মনে করা ঠিক হবে না।

সুখের বিষয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তর্ক ও অনুমানের প্রতি লোকায়তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন: তথ্যটির বিশেষ গুরুত্ব এই যে, এখানে তর্ক ও অনুমানের প্রতি লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গিটি জনৈক লোকায়তিকের নামের সঙ্গেই সংযুক্ত। তার নাম পুরন্দর এবং অধ্যাপক তুচি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, পুরন্দর স্বয়ং লোকায়তিক ছিলেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলেছেন, পুরন্দর

Admits the usefulness of inference in determining the nature of all worldly things where perceptual experience is available; but inference cannot be employed for establishing any dogma regarding the transcendental world, or life after death or the laws of Karma, which cannot be available to ordinary perceptual experience. The main reason for upholding such a distinction between the validity of experience in our practical life of ordinary experience, and in ascertaining

transcending truths beyond experience lies in this, that an inductive generalization is made by observing a large number of cases of agreement in presence, together with agreement in absence, and no case of agreement in presence can be observed in the transcendent sphere; for even if such spheres existed they could not be perceived by the senses. Thus, since in the supposed supra-sensuous transcendent world no case of a hetu agreeing with the presence of its sadhya can be observed, no inductive generalization or law of concomitance can be made, relating to this sphere.

ঠিক কী কী তথ্যের নির্ভরে অধ্যাপক দাসগুপ্ত এই মতকেই পুরন্দরের মত বলে ব্যাখ্যা করছেন তা অবশ্যই চিত্তাকর্ষক: এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাসগুপ্তের ব্যাখ্যা পাদটীকাও দ্রষ্টব্য। আপাতত আমাদের মন্তব্য হলো, এই যদি পুরন্দরের মত হয় এবং পুরন্দর যদি স্বয়ং লোকায়তিক হন, তাহলে মানতে হবে অনুমান-প্রসঙ্গে মাধব লোকায়তিকদের উপর যে-মত আরোপ করছেন তা বহুলাংশেই মাধবের কল্পনা প্রসূত।

পুরন্দর-প্রসঙ্গ মাধবের রচনা-বহির্ভূত সাক্ষ্যের আলোচনায় আমাদের উপনীত করলো। এবার সেদিক থেকে দেখা যাক মাধবের লোকায়ত-বর্ণনাকে কতোখানি বস্তুনিষ্ঠ মনে করবার সুযোগ আছে।

অধ্যাপক রিচার্ড পার্বে বলছেন, এ কথা মনে করাই স্বাভাবিক যে, বিপক্ষের রচনা থেকে লোকায়ত সংক্রান্ত যেটুকু তথ্য আমরা পাচ্ছি লোকায়ত আদিতে তার চেয়ে অনেক গভীর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং লোকায়তের দার্শনিক পরিণতিও অনেক বেশি। গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলো।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে-কথা মনে করাই স্বাভাবিক কেন? অধ্যাপক বেলভেলকায় ও রানাডের রচনা থেকে প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। লোকায়াত-প্রসঙ্গে তারা বলছেন,

Its great seductive charm and extensive vogue cannot be readily explained on the usual assumptions regarding the purely negative and destructive character of its tenets.

প্রধানত মাধবের প্রভাবেই যে আমরা লোকায়তকে এ-রকম চূড়ান্ত নেতিমূলক বলে মনে করে থাকি সে কথা অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই বোধ হয় লেখকদ্বয় আর তার ব্যাখ্যা করেননি। আমাদের যুক্তি হবে, লেখকদ্বয় যাকে লোকায়তের seductive charm and extensive vogue বলে বর্ণনা করছেন। তাই মাধবের লোকায়াত-বর্ণনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে লোকায়তের প্রভাব যে বিশাল ও গভীর ছিলো--সে বিষয়ে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রথমত, লোকায়ত নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ: সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, এই অর্থেই নাম লোকায়ত। মনে মাখা প্রয়োজন যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক কাওয়েল এই অর্থেই লোকায়ত নামটিকে প্রগণ করেছেন। মাধব নিজেও জানতেন যে, লোকেষু আয়ত অর্থেই এর নাম লোকায়ত। কিন্তু নামটির এ-তাৎপর্যকে তিনি হেয়ত্ব সূচক অর্থেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন; সাধারণ লোক অর্থ ও কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই পরলোক অস্বীকার করে চার্বাক মতের অনুগমন করে-এই কারণেই চার্বাক-মতের নাম লোকায়ত। গুণরত্ন এবং শঙ্করাচার্যের রচনাতেও জনসাধারণের মধ্যে লোকায়ত-মতের ব্যাপক ও বিশাল প্রভাবকে এই রকমেরই

অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা দেখা যায়। গুণরত্ন বলছেন, সাধারণ লোক নির্বিচার বলেই এ-মত গ্রহণ করে থাকে। শঙ্করাচার্য বলছেন, এ-মত প্রাকৃত-জনের পক্ষেই স্বাভাবিক।

কিন্তু এ-ধরনের অবজ্ঞাসূচক অর্থ যে নেহাতই অলীক সে-বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়।

মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী বলছেন: “পূর্বে পিতা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার খবনে বাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোনো কার্যোদেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই সকল নীতি করিতেন”।

বলাই বাহুল্য, ভারতীয় ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে অস্বীকার না করলে, মানতে হবে বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি এবং লোকায়ত-মত স্বতন্ত্র নয়। তাছাড়া, রিস্ ডেভিডস যেমন দেখাচ্ছেন, মহাভারতে (১.২৮৮৯ = হরিবংশ, ১৪০৬৮) দেখা যায় at the end of a list of the accomplishments of learned Brahmanas, they are said to be masters of the Lokayata। অতএব, লোকায়ত বলতে যাই বোঝাক না কেন, তাকে প্রাকৃত-জনের নির্বিচার ভোগপ্রিয়তার পরিণাম মনে করবার কারণ নেই।

দ্রৌপদী ছিলেন পাঞ্চগলী-পঞ্চগল-কন্যা। বৌদ্ধ-ভারতের মানচিত্রে আমরা কুরু ও পঞ্চগলদের পরিচয় পাই। অধ্যাপক গার্বে ৭২ প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানেরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, ভারতের এই উত্তরপূর্ব এলাকাটিতে--অর্থাৎ সে-যুগে এবং ভারতের ওই বৌদ্ধ ভারত বলে উল্লেখ করি, সেখানে-বৈদিক প্রভাব অনেক পরে প্রবেশলাভ করেছে ও সংহত হয়েছে। ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে--অর্থাৎ, যে যুগে এবং ভারতের ওই অঞ্চলে--ব্রাহ্মণ বলতে যাই বোঝাক

না কেন, তার সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্র-বর্ণিত ব্রাহ্মণের হুবহু সাদৃশ্য আশা করা সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক রিচার্ড ফিক ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি দেখাচ্ছেন, মনুর মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকাজ গর্হিত; অথচ জাতকের গল্পে ব্রাহ্মণ প্রধানতই কৃষিকর্মে ব্যাপ্ত।

অবশ্যই বৌদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণ শব্দের তাৎপর্য ঠিক কী ছিল, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু মাধবাচার্যের লোকায়ত-বর্ণনের বিরুদ্ধে যুক্তি শুধু এই নয় যে, বৌদ্ধ ভারতে যাদের ব্রাহ্মণ বলা হতো তাঁরা লোকায়তের চর্চা করতেন; আরো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে এই ব্রাহ্মণেরা-যারা লোকায়তের চর্চা করতেন—তারা বিদ্বান বলেও পরিগণিত ছিলেন। অর্থাৎ, লোকায়তের জ্ঞান বিদ্বান ব্রাহ্মণদের পক্ষে অপরিহার্য বলে পরিগণিত হতো। এ-বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই রিস-ডেভিডস-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। পাঞ্চগলী দ্রৌপদীও বলছেন, লোকায়ত-বিদ্যা শেখাবার জন্য তাঁর পিতা জনৈক বিদ্বান আচার্যকে নিয়োগ করেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে লোকায়তকে প্রাকৃত জনের স্বভাব স্থূল অর্থ কামপ্রবণতার পরিচায়ক মনে করা যায় না।

শুধু ব্রাহ্মণই বা কেন। রিস-ডেভিডস বলছেন, মিলিন্দির এক জায়গায় উপাখ্যানের নায়কের উপর লোকায়ত জ্ঞান আরোপ করা হয়েছে। তাছড়া হর্ষচরিত্র-এর এক জায়গায় জ্ঞানী ও তপস্বীদের একটি দীর্ঘ তালিকার মধ্যে বৌদ্ধ, শ্বেতাশ্বর জৈন, কপিলশিষ্য, কণাদ-শিন্য প্রমুখের সঙ্গেই লোকায়তিকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং এ-জাতীয় উল্লেখের উপর নির্ভর করেও আমরা অনুমান করতে পারি, লোকায়ত-মতের বিশাল ও t গভীর প্রভাবের-- seductive charm and extensive vogue-এর--প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, শঙ্কর ও মাধবের মতো বৈদান্তিক-প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি স্বীকারযোগ্য না-হওয়াই সম্ভব।

বিশেষত বৈদিক প্রভাব বহির্ভূত অঞ্চলে লোকায়তের এই seductive charm and extensive vogue-এর সঙ্গে বেদপন্থীদের পক্ষ থেকে

লোকায়তর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের তুলনা করলে হয়তো এমন কথা সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে যে, ওই ব্রাহ্মণ্যআদর্শের সঙ্গে লোকায়তর সংঘাত যেন অনেকাংশেই দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাতের ইংগিত দেয়।

মহাভারতের শান্তি পর্বের একটি উপাখ্যান থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশকালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাজী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল।-ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে ধর্মরাজকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুরূপ ধারণপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিষ্ঠীকচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, “মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ জ্ঞাতিসংহার ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কী লাভ হইল? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়।”... তখন তদ্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ত্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদাবস্থা দেখিয়া-কহিলেন,-আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্মরাজ! আমরা আপনাকে ধিক্কার প্রদান করি নাই, আপনার মঙ্গল হউক। তপোনিষ্ঠানসম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জানচক্ষুদ্বারা চার্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি

আপনার প্রতি কুটুক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুৰ্যোধনের পরম বন্ধু চার্বাক নামে
রাক্ষস...

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনা করত
হঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন চার্বাক সেই মহাত্মাদিগের
ক্রোধান্বিতে দক্ষপ্রায় হইয়া আপনি দক্ষ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপাতিত
হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সন্মান করিতে
লাগিলেন।

চার্বাক বর্ধের এই উপাখ্যান একাধিক দিক থেকে চিত্তকর্ষক

এখানে চার্বাক বা লোকায়তর যে নীতিকথার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার
সঙ্গে অবশ্যই মাধব-বর্ণিত ঋগং-কৃষ্ণ--ঘৃতং-পিবৎ জাতীয় স্কুল ভোগলিঙ্গার
লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। তার বদলে এখানে শুধু জ্ঞাতিহত্যার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ও
নির্ভীক একটা প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে লোকায়িক নীতিবোধের সঙ্গে
প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মূলমন্ত্রের সাদৃশ্য দেখা যায়। সে-সমাজে
জাতিহত্যাই চূড়ান্ত মহাপাতক। অবশ্যই, বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ ওই জাতিভিত্তিক
সমাজের মূল-নীতি অবদলিত করে, সে নীতি সমর্থককে দক্ষ করে মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের মহিমা কীর্তন করেছেন। হয়তো কুরুক্ষেত্রের কাহিনীর অন্তরালে ওই
জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর রাজশক্তির আবির্ভাব-কাহিনীর আভাস
আছে এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এই সবপরিস্থিতির নতুন
নীতিবোধাদির মহিমা কীর্তিত হতে শোনা যায়। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন,
হতো বা প্রাক্ষ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম। উত্তরকালে যারা বৈদিক
ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন সেই বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণের
মূলমন্ত্র যদি এই হয় এবং এই মূলমন্ত্রের উপর নির্ভর করে তারা যদি
জ্ঞাতিহত্যারও একটা নৈতিক সমর্থন উদ্ভাবন করতে পেরে থাকেন, তাহলে

মাধবাচার্য লোকায়তিকদের উপর যে-স্বূল ভোগবাদ আরোপ করছেন তা আসলে চার্বাক-বধকারী ওই ব্রাহ্মণদের উপরই কতোখানি প্রযোজ্য সে-কথা ভেবে দেখবার অবকাশ থাকে নাকি? কিন্তু আপাতত জাতিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে লোকায়ত-মতের সম্পর্কের ইংগিতটির দিকেই আমরা দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে চাই। কেননা, আমরা গ্রন্থমধ্যে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) দেখবার চেষ্টা করেছি, মানবোন্নতির এই জাতিভিত্তিক যা প্রাক-ভিত্তিক পর্যায়ে মানবচেতনাও সাধারণভাবে প্রাক-অধ্যাত্মবাদী--যদিও এই প্রাক-অধ্যাত্মবাদী চেতনার বিকাশ বিচিত্র হতে পারে এবং জাদুবিশ্বাসের জটিলতায় তা আমাদের কাছে অনেকাংশেই দুর্বোধ্য ও অর্থহীন মনে হতে পারে। আমরা আরো দেখবার চেষ্টা করেছি, দেশের রাষ্ট্রীকামে সাম্রাজ্যের উত্থান পতন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে ওই প্রাক-বিভক্ত সমাজের স্মারক অসম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়েছে। অতএব ওই প্রাক-অধ্যাত্মবাদী পর্যায়ের চেতনাই সাধারণ মানুষের মধ্যে seductive charm and extensive vogue প্রসারিত করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন দুটি স্পষ্ট ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে অধ্যাত্মবাদের মহিমা-মুখর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শাসক-শ্রেণীর সংস্কৃতি। অপরদিকে প্রাক-অধ্যাত্মবাদের-এবং, অতএব প্রাক-বিভক্ত পর্যায়ের-স্মারক-বহুল গণ-সংস্কৃতি। দ্বিতীয়টিই লোকেষু আয়ত এবং সেই অর্থে লোকায়ত।

এদিক থেকে লোকায়ত-প্রসাদে রিস-ডেভিডস্-এর সিদ্ধান্তটিকে নতুনভাবে বোঝবার অবকাশ থাকতে পারে। কেননা, লোকায়তকে সংকীর্ণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিকমত হিসেবে সনাক্ত করা সত্যিই সম্ভব কিনা তা সন্দেহের কথা। রিস ডেভিডস বলছেন লোকায়ত বলতে folk-lore বোঝাতে-কালক্রমে এই ফোক-লোর নিন্দিত হয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত লোকায়ত নামটিই গালিগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু ফোক-লোর কেন নিন্দিত হলো সে-প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। অপরপক্ষে, গণ-সংস্কৃতির নামান্তর হিসেবে

বোঝবার চেষ্টা করলে এ-প্রশ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, কেননা, ওই তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যনীতির প্রচারকদের পক্ষ থেকে লোকায়তকে অবদমন করবার জন্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিচিত্র আয়োজন হয়েছিলো; আইনকারেরা লোকায়তের বিরুদ্ধে কঠিন বিধান দিয়েছিলেন, পুরাণকারেরা লোকায়তের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অতিকথা রচনা করেছিলেন, নাট্যকারের রচনা করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রুপ। সংকীর্ণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট মতবাদের খণ্ডন হিসেবে বিশেষত দেশের আইনকার ও পুরাণকারীদের এতো রকম প্রচেষ্টা অসামঞ্জস্যমূলকই মনে হয় না কি?

কিছুকিছু নমুনা দেখা যায়। লোকায়তের বিরুদ্ধে মনুর বিধান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জে. মুয়ার বলছেন,

Such heretics appear to have been numerous when the Institutes were compiled, as the faithful are warned (IV: 61) against living in a village 'overrun with heretics'; 'a kingdom in which sudras predominate, overrun with nihilists and destitute of Brahmins' is said (VIII: 22) to be doomed to destruction; a king who is a nihilist is threatened with perdition (VIII. 309) and it is enjoined (IX: 225) that heretics shall be banished. Allusion is said to be made in V, 89, 90 and VIII, 363 to female anchorites of a heretical religion.

একই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত” বলছেন,

Manu says that the Brahmin who, through a greater

Confidence in the science of logic (hetu-sastra) disregards the authority of the Vedas and the smriti, are but nastikas who

Should be driven out by good men...Again in Manu IV. 30, it is said that one should not even speak with the heretics (pasandino) transgressors of caste disciplines (vikramasthan), hypocrites (vaidal-vratika), double-dealers and sophists (haituka).

শ্রীযুক্ত মূয়ার এবং অধ্যাপক দাসগুপ্ত উভয়ের মতেই, মনুর এই বিধানগুলি লোকায়তিকদের প্রতিই প্রযুক্ত। অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে: প্রাচীনকালের আইনকর্তারা যদি সত্যিই এতোভাবে লোকায়তিকদের দমন করবার আয়োজন করে থাকেন, তাহলে কি এগুলিকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট মতবাদের খণ্ডন-প্রচেষ্টা বলে গ্রহণ না করে, তথাকথিত শ্রীমণ্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষে লোকসংস্কৃতিকে অবদলিত করবার এবং তার উপর ওই ব্যাঙ্গণ্য-সংস্কৃতির মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা বলেই সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে না?

লোকায়তর বিরুদ্ধে পুরাণকারদের প্রচার প্রচেষ্টাও এই সন্দেহকেই দৃঢ়তর করতে চায়।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, অসুরদের মোহগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যেই মায়ামোহ তাদের মধ্যে এই মারাত্মক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। এরই মোহে পড়ে অসুরের বৈদিক জ্ঞানকে উপহাস করতে শিখলেন; অতএব তাদের দারুণ অধঃপতন ঘটলো। সেই অবকাশে দেবতাদের শক্তি সঞ্চয় করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন এবং সহজেই অসুরদের পরাজিত করলেন।

মৈত্রী উপনিষদেও মোটের উপর একই পৌরাণিক উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিষদের এই উপাখ্যানটি অনুসারে দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরগুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইন্দের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই অসুরদের মধ্যে এই মারাত্মক ও অবিদ্যা-মূলক মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন-সেই অবিদ্যার প্রভাবেই অসুরের অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করতে শুরু করেন।

পৌরাণিক কাহিনী অবশ্যই ইতিহাস নয়। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে ঐতিহাসিক তথ্যের ইংগিত পাওয়াও অসম্ভব নয়। লোকায়ত-প্রসঙ্গে আমরা যে-পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাই সেগুলির মূল ইংগিত হলো, লোকায়ত-মত সআসলে অসুরদেরই মত- অসুর মত।

এই দিক থেকে লোকায়ত প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সিদ্ধান্তটিকে নতুনভাবে বোঝবার অবকাশ থাকতে পারে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি—এবং গ্রন্থমধ্যে এ-বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবারও চেষ্টা করেছি --যে প্রধানতই ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদের উপর নির্ভর করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও লোকায়ত-মতকে অসুরমত বলেই সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক দাসগুপ্ত মনে করেন, অসুর বলতে এখানে প্রাচীন সুমেরীয়দেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এ-বিষয়ে অবশ্যই অন্যান্য ভারততত্ত্ববিদেরা তার সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু অসুর বলতে যাদেরই বোঝাক না কেন, তাদের সংস্কৃতি যে-বেদবিরোধী ছিলো এবং অতএব বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকের অন্তত পরবর্তীকালে যে তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন--এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান বলছেন,

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবে বিস্তরাশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু। ১৬.৬।।

प्रवृत्तिषु निवृत्तिषु जना न विन्दुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते । १६,१ ।

এর সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ, মৈত্রী উপনিষদ প্রভৃতিতে ব্যক্ত অসুর মতের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের তুলনা করা যায় ।

সুখের বিষয় উপনিষদ এবং গীতায় এই ঘৃণা-বিদ্বেষের পরিচয় ছাড়াও অসুরমত সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট তথ্যেরও আভাস পাওয়া সম্ভব; লোকায়তের পুনর্গঠন-প্রচেষ্টায় সেগুলি আমাদের সহায়ক হতে পারে ।

আমরা এ-জাতীয় দুটি তত্ত্বের উল্লেখ করবো । এক: আত্মতত্ত্ব । দুই: সৃষ্টিতত্ত্ব । এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, উভয় তত্ত্বের দিক থেকেই এই অসুরামতের-তথা লোকায়ত মতের-সঙ্গে তন্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় । অতএব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তের সঙ্গে তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায়গুলির যে-অভিন্নতা প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছেন তার তাৎপর্য লঘুমূল্য নয় ।

প্রথমত আত্মতত্ত্বের কথাটা ধরা যাক ।

মৈত্রী উপনিষদের (৭, ১০) উপাখ্যান অনুসারে দেব ও অসুর উভয়েই আত্মকাম হয়ে (আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে) ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন । ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তাঁরা বললেন, ভগবন, আমরা আত্মকাম হয়েছি, আমাদের (আত্মতত্ত্ব) বলুন । ব্রহ্মা অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলেন, এই অসুরেরা ভ্রান্ত আত্মতত্ত্বেরই যোগ্য । তাই তিনি তাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত উপদেশ দিলেন । অতএব এই অসুরেরা মিথ্যাকেই সত্য বলে জেনে জীবনযাপন করে-ইন্দ্রজালের প্রভাবে যে-রকম অন্ততই সত্য বলে প্রতীয়মান হয় সেই রকম ।

অসুরদের আত্ম-তত্ত্ব ব্রহ্মার কাছ থেকেই শেখা । কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও মৈত্রী উপনিষদের উপাখ্যান থেকে একটি কথা

নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়: এখানে উপনিষদের ঋষি অসুরমতের মধ্যে বিশেষ করে আত্মতত্ত্বটিকেই ভ্রান্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই অসুরদের আত্মতত্ত্ব বলতে ঠিক কী বোঝাতে সে-কথা মৈত্রী উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি-কেননা, ব্রহ্মা অসুরদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রচার করেছিলেন সে-প্রশ্নের উত্তর মৈত্রী উপনিষদে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আমরা গ্রন্থমধ্যে ছান্দোগ্যর ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদটি উদ্ধৃত করেছি। এখানে শুধুমাত্র এটুকু উল্লেখ করলেই হবে যে, ছান্দোগ্যর উপাখ্যান অনুসারে অসুরদের এই আত্মতত্ত্ব বলতে দেহাত্মবাদ বা দেহতত্ত্বই বোঝাতো-বস্তুত এইদিক থেকেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লোকায়তর সঙ্গে অসুরমতের অভিন্নতা অনুমান করেছেন।

মাধবাচার্যের বর্ণনা অনুসারেও এই দেহতত্ত্বই লোকায়তিকদের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু নানা কারণে আমরা মাধবের এই বর্ণনাটির উপর আস্থা স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেছি। তবু এই দেহাত্মবাদই যে লোকায়তিকদের প্রধানতম প্রতিপাদ্য ছিলো সে-বিষয়ে মাধবাচার্যের রচনার চেয়েও অনেক পুরোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। আমরা দুটি প্রমাণের উল্লেখ করবো। এক, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দুই, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য তিনবার লোকায়তিকদের সনাক্ত করতে চেয়েছেন। তিনবারই তিনি লোকায়ত-মত হিসেবে দেহাত্মবাদকেই সনাক্ত করতে চেয়েছেন। যথা: “দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টামন্নেতি প্রাক্কতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ (১, ১, ২)”; “লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহোংচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্তকো দৃষ্ট... (২, ২, ২)”; “অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোংভাবং মন্যমানাঃ সমন্তব্যন্তেষু বাহেষু পৃথিব্যাদিষদৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তন্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টং কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহঃ (৩, ৩, ৫৩)।” অতএব,

শঙ্করাচার্যের এই উক্তিগুলি থেকে অনুমিত হয় যে, তার সময় পর্যন্ত এই দেহাত্মবাদই লোকায়তমতের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছিলো।

লোকায়ত-মতের এই ব্যাখ্যার উল্লেখ করেই রিস-ডেভিডস মন্তব্য করছেন,

A very similar, if not indeed the very same view is also controverted in the Brahmajala Sutta and is constantly referred to throughout the Pitakas under the stock phrase tam jivam tam sariram (for instance in Mahali and eJaliya Suttas.)

রিস ডেভিডস-এর তর্জমা অনুসারে ব্রহ্মজাল সূত্র প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত এই দেহাত্মবাদের বর্ণনা হলো,

In the first place, brethren, some recluse or Brahman puts forth the following opinion, the following view: "Since, Sir, this soul has form, is built up of the four elements, and is the offspring of father and mother, it is cut off, destroyed, on the dissolution of the body; and does not continue after death; and then, Sir, the soul is completely annihilated."...

যদি প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বারবার এই দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে অন্তত এটুকু অনুমিত হতে বাধ্য যে, বৌদ্ধ-ভারতে এ-জাতীয় একটি মতবাদ নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিলো। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই--এবং স্বয়ং রিস ডেভিডস্-ই সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-যে ওই প্রাচীন বৌদ্ধ

শাস্ত্রেই 'লোকায়ত' এবং 'লোকায়তিক' শব্দের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রিস-ডেভিডস বলছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও উপরোক্ত দেহাত্মবাদই যে লোকায়তিকদের মতবাদ এ-কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। অর্থাৎ, দেহাত্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এবং লোকায়ত নামেরও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে-কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। আর তা যাচ্ছে না বলেই রিস-ডেভিডস দাবি করছেন, দু'য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক অনুমিত হতে পারে না। ফলে, রিস-ডেভিডস-এর যুক্তি অনুসারে, শঙ্করাচার্য যখন লোকায়ত-মত হিসেবে এই দেহাত্মবাদেরই উল্লেখ করতে চান তখন তার উক্তি ভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক;

Samkara, in setting forth his theory of the soul, controverts a curious opinion which he ascribes to Lokayatikas, possibly wrongly, as the very same opinion was controverted ages before in the Pitakas, and not there called Lokayata, though the word was used in Pitaka times.

কিন্তু আমরা রিস্ ডেভিডস্-এর এ যুক্তি স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেছি। পিটকে এই দেহাত্মবাদের খণ্ডনই আছে, পিটকে ওই লোকায়ত নামও আছে; কিন্তু লোকায়ত বলতে যে দেহাত্মবাদই বোঝাতো তা স্পষ্টভাবে বলা নেই। এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার যোগ্য; কিন্তু এর থেকেই রিস ডেভিডস এর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। যদি পিটক-সাহিত্যে ওই দেহাত্মবাদেরই নামান্তর পাওয়া যেতো, কিংবা, লোকায়ত নামের সঙ্গে তত্ত্বান্তরের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতো --তাহলে তার সিদ্ধান্তটি সমর্থনযোগ্য হতে পারতো। সে-জাতীয় কোনো ইংগিত বৌদ্ধ শাস্ত্রে নেই। এক্ষেত্রে রিস-ডেভিডস-এর সিদ্ধান্তটি মানতে হলে কল্পনা করা

প্রয়োজন যে, বৌদ্ধ ভারতে এই দেহাত্মবাদের প্রভাব প্রভূত হলেও তার কোনো স্বতন্ত্র নাম ছিলো না, কিংবা অন্তত বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণেতারা সে-নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। আরো কল্পনা করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধভারতে লোকায়ত বলতে অন্য কোনো তত্ত্ব বোঝাতে; কিন্তু বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রণেতারা শুধুমাত্র লোকায়ত নামটি ব্যবহার করেই সম্ভ্রষ্ট হতেন-লোকায়ত বলতে যে-তত্ত্ব বোঝাতো তার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেননি। কিন্তু উভয় সম্ভাবনাই কষ্টকল্পিত হতে বাধ্য।

অপরপক্ষে, এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের সাক্ষ্যকেও এতোখানি লঘু মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। কেননা, রিস-ডেভিডস-এর মন্তব্য মানতে হলে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, শঙ্করাচার্য যে-মতটির নাম দিচ্ছেন লোকায়ত সেটির নাম আসলে লোকায়তই নয়, অন্য কিছু; কিংবা হয়তো তার নিজস্ব কোনো নামই ছিল না। যদি তাই হয় তাহলে তা সত্ত্বেও শঙ্করাচার্য কেন এতে লোকায়ত আখ্যা দিলেন, সে প্রশ্নের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ব্যাখ্যা হিসেবে রিস-ডেভিডস হয়তো বলবেন, ইতিমধ্যে লোকায়ত শব্দটিই গালিগালাজের সামিল হয়ে দাড়িয়েছিলো। কিন্তু সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া, গালিগালাজ হিসেবে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে অন্যান্য শব্দের প্রচলন বিরল নয়।

বরং রিস-ডেভিডস নিজেই এই যে-সব তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার থেকেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে, লোকায়ত বলতে প্রধানতই এই দেহাত্মবাদ বোঝাতে: বৌদ্ধশাস্ত্রে এ-দেহাত্মবাদের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়, লোকায়ত নামের উল্লেখও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিরল নয়; এবং দুয়ের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্কের যে-উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে না, তা শঙ্করাচার্যের রচনায় পাওয়া যায় বলেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, এ-বিষয়ে শঙ্করাচার্যের উক্তিগুলি বৌদ্ধ তথ্যের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

অতএব, এইভাবে লোকায়তার পুনর্গঠনে আমরা একটি সুনিশ্চিত মন্তব্যে উপনীত হতে পারি; লোকায়তিকদের একটি প্রধানতম তত্ত্ব বলতে দেহাত্মবাদই বুঝতে হবে। বিষ্ণুপুরাণ, মৈত্রী উপনিষদ প্রভৃতির সাম্ভ্য অনুসারে অনুমান হয় যে, প্রাচীনেরা এই লোকায়তকেই অসুরমত বলে বর্ণনা বা নিন্দা করেছিলেন। এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যেমন দেখাচ্ছেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যান অনুসারেও অসুরমত বলতে এই দেহাত্মবাদই।

কিন্তু, আমরা একটু আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি, লোকায়তর সঙ্গে তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংঘর্ষ অনেকাংশেই দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের আভাস দেয়। এবং লোকায়ত নামের বুৎপত্তিগত অর্থও হলো, সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অধ্যাপক বেলবেলকার এবং রানাডে লোকায়তর extensive vogue and seductive charm -এর উল্লেখ করছেন। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ এমন কোনো সাংস্কৃতিক ধারার পরিচয় কি আমরা পাই যা শুধু সুপ্রাচীনই নয়, তা একাধারে দেহাত্মবাদী এবং লোকেষু আয়ত, দুই-ই।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়- বৈদিক ও তান্ত্রিক। দ্বিতীয়টি প্রসঙ্গে আধুনিক বিদ্বান বলছেন,

In the popular knowledge and belief they have practically superseded the Vedas over a large part of India...

এইদিক থেকে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণাকেই লোকেষু আয়ত আখ্যা দেওয়া যায়। কিনা তা ভেবে দেখবার অবকাশ থাকতে পারে। বিশেষত, বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-রকমই একটা সন্দেহ দৃঢ় হতে চায়; “সে-সব খাঁটি বাংলার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম

এবং বাংলার তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর এবং, “ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাঙলায় অনেক জাল জুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছিলেন, স্মার্ত নাট্যের ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল ও গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আরো দেখাচ্ছেন, যদিও উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারকেরা তন্ত্রের সঙ্গে নানান আপোষ করেছিলেন এবং যদিও কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু মনীষা তন্ত্রের উপর “একটা নূতন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন,” তবুও তন্ত্র অতি প্রাচীন-বৌদ্ধ ধর্মের চেয়েও প্রাচীন এবং আদিতে তা ব্রাহ্মণ্য বিরোধী তথাকথিত ইতর জাতিদের মধ্যেই প্রচলিত ছিলো।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তন্ত্রকেই কেন বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধী লোকায়তিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক মনে করা অসঙ্গত নয়, এ-বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। অতএব এখানে প্রশ্ন হলো, লোকায়তিক সংস্কৃতি বলতে যদি এই তন্ত্রকেই বুঝিয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে আলোচ্য দেহাত্মবাদের সম্পর্ক কী? শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকেই আমরা এ-প্রশ্নের উত্তর উদ্ধৃত করতে পারি; “যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে-“ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সস্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে’। ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।...তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একইভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে।--“এ দেশের সিদ্ধগণ বলেন যে, মনুষ্যদেহের মতন পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই; এমন যন্ত্র আর কেহ গড়িতে পারে না, এমন যন্ত্র নির্মাণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুণ্ড এবং সুগুণ্ড শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে, অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ

হইতে পারে।” তাই তন্ত্রসাধনার নাম কায়সাধনা, তন্ত্রতত্ত্বের নাম দেহতত্ত্ব। এবং এই দেহতত্ত্বের কথাই যদি in the popular knowledge and belief...have practically superseded the Vedas over a large part of India, তাহলে বিপক্ষ দার্শনিকদের পক্ষে এই মতটিকেই রোকায়াত আখ্যা দেওয়া স্বভাবিক হয় না কি?

কিন্তু মহাভারতের চার্বাক-বধ বৃত্তান্তটি অবলম্বন করে আমরা দেখেছি এই লোকায়ত-মতের সঙ্গে প্রাকবিভক্ত জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের ধ্যানধারণার একটা সম্পর্কও অনুমান করা অসম্ভব নয়। এবং গ্রন্থমধ্যে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধান অগ্রসর হয়ে আমরা ওই প্রাক-বিভক্ত সমাজের আলোচনাতেই গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অসুর মত সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়; লোকায়তের পুনর্গঠনে সেটিও আমাদের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এই তত্ত্ব হলো অসুরদের সৃষ্টি-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান অসুর মত হিসেবে যে মতটির উল্লেখ করেছেন শ্রীধরস্বামী বলছেন সেটি আর কিছুই নয় লোকায়ত-মত মাত্র। অন্যান্য সূত্রেও অসুর-মতের সঙ্গে লোকায়তের সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়; তাই শ্রীধর স্বামীর এই মন্তব্যকে অবজ্ঞা করবার কোনো কারণ নেই।

এই অসুর মত--তথা লোকায়ত মতের --ব্যাখ্যায় শ্রীভগবান বলছেন

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরানীশ্বরম।

অপরস্পরসম্বৃতং কিমান্যং কামহেতুকম। ১৬,৮।।

প্রথম পঙক্তিটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে; সম্ভবত এর তাৎপর্য হলো ঈশ্বর-সৃষ্ট বা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত অর্থে জগৎ সত্য নয়, কেনানা ঈশ্বর নেই।

কিন্তু দ্বিতীয় পঙক্তিটির অর্থ অস্পষ্ট নয় এবং আমাদের বর্তমান আলোচনায় এই দ্বিতীয় পঙক্তিটিই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এর অর্থ হলো, জগৎ স্ত্রী-পুরুষের মিলনাজাত এবং কামোদ্ভূত। অসুরদের-তথা লোকায়তিকদের-সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে যদি এই বোঝায় তাহলে লোকায়াতমতকে সনাক্ত করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হবার কথা নয়। কেননা, তন্ত্রসাহিত্যে আমরা ঠিক এই সৃষ্টিতত্ত্বেরই পরিচয় পাই: “যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব হইয়াছে।--মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নরনারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা।--কাম ও মদন জন্য যেমন নূতন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনিই পুরুষপ্রকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দন জন্য বিশ্বব্যাপী নাম ও রূপের বিকাশ হইয়াছে।--তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নরনারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আছে।

তাহলে, সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকেও শ্রীভগবান উক্ত অসুরমতকে--তথা লোকায়ত-মতকে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণার সঙ্গে অভিন্ন মনে করবার অবকাশ আছে। আমরা গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করেছি। অবশ্যই এ-জাতীয় তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য বলতে গুণরত্নের লোকায়তবর্ণন। এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধানত তার উপর নির্ভর করেই লোকায়তের সঙ্গে কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি তান্ত্রিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন।

অবশ্যই লোকায়তকে এইভাবে ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণা বলে সনাক্ত করবার চেষ্টায় নানা বাধা আছে। প্রধান বাধা হলো, লোকায়ত-সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা এবং তন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা-দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি নেই। কিন্তু লোকায়ত-সংক্রান্ত আমাদের প্রচলিত ধারণাটি প্রধানতই মাধবের কাছ থেকে পাওয়া; এবং আমরা দেখেছি মাধবের উপর ঐকান্তিক

নির্ভরতায় বাধা আছে। অপরপক্ষে, গ্রন্থমধ্যে আমরা তন্ত্রতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে দেখেছি যে, তন্ত্র-সংক্রান্ত আমাদের প্রচলিত ধারণাটিও বহুলাংশেই সংশোধন-সাপেক্ষ। কেননা, তন্ত্রের-আদি অকৃত্রিম রূপটির উপর উত্তরকালে নানা প্রকার বৌদ্ধ ও হিন্দু ধ্যানধারণা অধ্যস্ত হয়েছে এবং তারই ফলে আমরা অনেক সময় এই অধ্যস্ত ধ্যানধারণাগুলিকেই তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ভুল করে থাকি। তন্ত্রের উপর উত্তরকালে অধ্যস্ত ওই ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব মুক্ত হয়ে আমরা যদি তন্ত্রের আদিরূপটির অনুসন্ধান করি তাহলে হয়তো আমরা অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তে পরিচয় পাবো বস্তুবাদেরই--সে বস্তুবাদ যতো অস্ফূট ও যতো প্রাকৃতই হোক না কেন, যতোই স্থূল হোক না কেন তার বাস্তব জ্ঞানের দৈন্য। অতএব, মাধবের প্রভাব মুক্ত হয়ে লোকায়তকে এবং এই অধ্যস্ত ধ্যানধারণাগুলির প্রভাব মুক্ত হয়ে তন্ত্রের আদি অকৃত্রিম রূপকে আমরা যদি চেনবার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো দুয়ের মধ্যে অসঙ্গতি অমন প্রকট মনে হবে না।

কিন্তু, প্রশ্ন উঠবে, তন্ত্র-সংক্রান্ত আমাদের উত্তরকালের ধ্যানধারণাকে যেভাবেই সংশোধন করা যাক না কেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, তন্ত্র প্রধানতই একটি সাধনপদ্ধতি; তার তত্ত্বের দিকটুকু এই সাধনপদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত। অর্থাৎ, তন্ত্রের এই আনুষ্ঠানিক দিকটিই প্রধান। এবং যদি তাই হয় তাহলে লোকায়তের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সঙ্গতি কোথায়?

উত্তরে বলা যায়, লোকায়ত নামেরও হয়তো এককালে কিছু আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছিলো। এ-বিষয়ে প্রাচীন রচনার কিছুকিছু ইংগিত উল্লেখ করা যায়।

প্রাভাকর মীমাংসকদের সমালোচনা করে কুমারিল ভট্ট বলছেন, “প্রায়ৈণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়ন্তিকৃত। তম আস্তিকপথে কর্তুম অয়ম যত্নঃ কৃতো ময়া” (বার্তিক: ১.০)। অর্থাৎ, লোকে মীমাংসাকে প্রায় লোকায়তারই

সামিল করে তুলেছিলো, আমি তাকে আস্তিক-পথে নিয়ে আসতে যত্নবান হয়েছি। প্রশ্ন হলো, কুমারিল এখানে লোকায়ত-শব্দকে ঠিক কোন অর্থে ব্যবহার করছেন? আধুনিক বিদ্বানেরা বলেন, প্রাভাকর মীমাংসকেরা নিরীশ্বর-বাদী ছিলেন এবং সেই অর্থেই কুমারিল তাঁদের প্রায়লোকায়তিক বলে বর্ণনা করছেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক দিকের উপর একান্ত গুরুত্ব আরোপ করবার উৎসাহ ছাড়া পূর্বমীমাংসার কথা ভাবা যায় না-প্রাভাকর এবং ভাট্ট উভয় সম্প্রদায়ের বেলাতেই এই কথা। অতএব, এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কুমারিল এখানে লোকায়ত শব্দের সাহায্যে শুধুমাত্র নিরীশ্বরবাদই বোঝাতে চাইছেন না, ঈশ্বর-বিহীন অনুষ্ঠান-পরায়ণতার কথাই উল্লেখ করছেন।

ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হলেও অসুরেরা-তথা লোকায়তিকেরা-যে কোনো-না-কোনো প্রকার অনুষ্ঠান-পরায়ণই ছিলো এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতার সাক্ষ্যও অগ্রাহ করা যায় না। অসুর প্রসঙ্গেই শ্রীভগবান বলছেন,

যজন্তে নামষজৈন্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম। ১৬,১৭।।

অর্থাৎ সংক্ষেপে, দাস্তিক অসুরেরা নামেই যজ্ঞ করে থাকে। বলাই বাহুল্য, বেদ-বাহ্য বলেই ঈশ্বর-বিহীন অসুরদের যজ্ঞকে বেদপন্থীদের পক্ষ থেকে নামেমাত্র যজ্ঞ বলে নিন্দ করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আলোচনায় বর্তমানে যে-কথা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা হলো শ্রীধর স্বামীর নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা যদি গীতার শ্রীভগবান-বর্ণিত অসুরমতকে লোকায়ত-মত বলেই এবং অতএব ওই অসুরদের, লোকায়তিক বলেই-সনাক্ত করতে সন্মত হই তাহলে আমাদের পক্ষে একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, বেদবাহ্য এবং ঈশ্বরবিহীন হলেও লোকায়তের সঙ্গে কোনো-না-কোনো রকম যজ্ঞ কর্মের সম্পর্ক ছিলো। অসুরদের যজ্ঞ-প্রসঙ্গে আমরা ঋগ্বেদের একটি চিত্তাকর্ষক সংক্ষ্যেয়াও উল্লেখ

করেছি। ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে: তুমি মায়াসমূহের দ্বারা, যাহারা নিজেদের মুখে স্বধা (অন্নহবি:) প্রদান করিত, সেই মায়াবীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলে। ভাষ্যে সায়নাচার্য কৌষীতকী ও বাজসনেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কৌষীতকী বলেন, অসুরের অগ্নিকে পরাভূত করিয়া নিজেদেরই হোম করিত। বাজসনেয়ী বলেন, দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধায়ুক্ত হইল, তাহার পর অসুরের অভিমান ভরে ঠিক করিল, “আমরা কাহাকেও হোম করিব না?; অতএব নিজেদের মুখে হবিপ্রদান করিয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অবমাননা করিল। প্রশ্ন হলো, এখানেও কি অসুর বলতে লোকায়তিকদের-অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিকদেরই-বুঝতে হবে? সে-প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু তন্ত্রসাধনার পঞ্চমকারের মধ্যে চারটি মকারমন্ত, মাংস, মীন, মুদ্রা-নিজেদের মুখেই হবিপ্রদানের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে এ-হবি যতোই নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য মনে হোক না কেন।

দুই

এইভাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে এবং আরো কিছুকিছু প্রাচীন তথ্যের ইংগিত অনুসরণ করে আমরা লোকায়ত বলতে প্রধানতই তান্ত্রিকাদি ধ্যানধারণাকে বোঝবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আধুনিক রুচি-বিচারে তন্ত্র অনেকাংশেই বীভৎস বিকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। অপরপক্ষে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই তন্ত্রেরই প্রভাব সুবিশাল ও সুগভীর। অতএব প্রশ্ন ওঠে, ওই বীভৎস বিকৃতিই যদি তন্ত্রের আদি-অকৃত্রিম তাৎপর্য হয় তাহলে তা এতো বড়ো একটা দেশকে এতো শতাব্দী ধরে এমন গবীরভাবে কী করে প্রভাবিত করলো? অবশ্যই আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রের উপর জটিল অধ্যাত্মতত্ত্ব আরোপ করে যেন তন্ত্রের নগ্নতা-নিবারণ করতে চেয়েছেন; কিন্তু এ-জাতীয় ব্যাখ্যা আমাদের কাছে কৃত্রিম মনে হয়েছে বলেই আমরা তা গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেছি।

তার বদলে আমরা সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি, আধুনিক বিচারের মানদণ্ড যা অমন বীভৎস বিকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয় তারই আদি-তাৎপর্য অন্য কিছু হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, সে-আদি-তাৎপর্যের সন্ধান করা যাবে কী করে, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে? আমাদের মনে হয়েছে, অধ্যাপক জর্জ টমসনের সাম্প্রতিক রচনায় এই বাঞ্ছিত পদ্ধতিটির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তার পদ্ধতিই গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু সে-পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টায় আমাদের আলোচনা অনিবার্যভাবেই নানান দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেননা, আমরা এমন কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছি লোকায়তর আলোচনায়-তথা ভারতীয় দর্শনের আলোচনায়-সাধারণত যা তোলা হয় না। ফলে আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাটিকেই অনেকাংশে সংশোধন করবার প্রয়োজন হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা-

প্রচেষ্টার পরিবর্তে আমাদের আলোচনা প্রধানত কয়েকটি অনভ্যন্ত সমস্যার সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে চেয়েছে। এখানে এ-জাতীয় সমস্যার কিছুকিছু পরিচয় দেবো।

প্রথমত অবশ্যই, যে-গৃহ সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণত ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয় সেগুলির উৎস এবং আদি-তাৎপর্য সংক্রান্ত সমস্যা। তন্ত্রের উৎস-সন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমরা মানবসমাজের আদিম পর্যায়ের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার আলোচনায় গিয়ে পড়েছি এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে মানবমনের যে প্রাকৃত বিশ্বাস এবং সাধনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন ওঠে, তন্ত্র যদি আদিম সমাজেরই স্মারক হয় তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতোদিন ধরে--এমনকি অত্যন্ত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত--তার প্রভাব এমনভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে কী করে? অতএব আমরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছি এবং এই বৈশিষ্ট্য বলতে প্রধানত দুটি বিষয়ের আলোচনা উত্থাপন করেছি।

এক: অসমান উন্নতির নিয়ম বা Law of uneven development। অর্থাৎ সমগ্র ভারত জুড়ে সব মানুষেরই উন্নতি একইভাবে এবং সমান তালে ঘটেনি। তাই এমনকি আজকের দিনেও আমাদের দেশের এলাক-বিশেষে প্রাচীন ট্রাইব্যাল সমাজের পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে-ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার-এর লেখক একেই fragments of a prehistoric world' - remnant to our own day of the Stone Age আখ্যা দিয়েছিলেন।

India thus forms a great museum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture.

The specimens are not fossils or dry bones, but living communities...

সাম্প্রতিক ভারত সংক্রান্ত এ-মন্তব্য প্রাচীন-ভারত প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আরো প্রযোজ্য হবে। অতএব, এ-অনুমাণে বাধা নেই যে, বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে উন্নত ও সভ্য সমাজের পাশাপাশিই প্রাকৃত প্রাচীন সমাজ সহাবস্থান করেছে। অতএব, বিশেষত পুরাকালে এই সহাবস্থানের ফলে প্রাচীন সমাজের প্রাকৃত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান যে সভ্য সমাজের সংস্কৃতির মধ্যেও সংক্রমিত হবে। এতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

বস্তুত, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় আদিবাসীদের ধ্যানধারণা এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব। আধুনিক বিদ্বানেরা সাধারণত এই আদিবাসীদের অনার্য বা আর্য-পূর্ব বা আর্যেত্বের বা দ্রাবিড়--বা ওই ধরনের কোনো নাম দিয়ে থাকেন। অতএব, তাদের পরিভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্যেতার জাতিদের অবস্থান।

কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি বলেই আমাদের কাছে এ-বিষয়ে আরো কিছু সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যমাত্রেরই বাস্তব ভিত্তি থাকতে বাধ্য। অতএব, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যদি ট্রাইব্যাল সংস্কৃতির প্রভাব অমন গভীর হয় তাহলে অনুমান করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় - সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও ওই ট্রাইব্যাল-সমাজের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ থেকেছে। ফলে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করেছি।

দুই: বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশ ও ট্রাইব্যাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যাল-পর্যায়ের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের প্রভাব যে এতো ব্যাপক ও গভীর তার ব্যাখ্যায় শুধুমাত্র এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট নয় যে, এ-দেশে সভ্য ও প্রাচীন বা ট্রাইব্যাল সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করেছে; তাছাড়াও অনুমিত হয় যে, রাষ্ট্রশাসনভুক্ত সভ্য এলাকাতেও বাস্তব ট্রাইব্যাল-সমাজের স্মারক অনেকাংশেই অক্ষুন্ন থেকেছে! কীভাবে তা সম্ভব হতে পারে? কৌটিল্যের সংঘবৃত্ত এবং প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি। এগুলির সাম্য অনুসারে অনুমিত হয় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়কদের একটি মূল নীতি ছিলো আশপাশের ট্রাইব্যাল-সমাজগুলিকে আক্রমণ করে তাদের রাষ্ট্রশাসনভুক্ত করা। অতএব, অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে এই ট্রাইব্যাল-সমাজের মানুষের রাষ্ট্রশাসিত সভ্য-সমাজের আওতায় এসে পড়েনি; তার বদলে বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়ে-অতএব কৃত্রিমভাবেই তারা সভ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। ফলে তাদের জীবন থেকে মাত্র অসমাপ্তভাবেই বিলুপ্ত হয়েছে ট্রাইব্যাল সমাজের বৈশিষ্ট্য। আমরা গ্রন্থ মধ্যে দীর্ঘভাবে ট্রাইব্যাল-সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ সংক্রান্ত প্রকল্পটির আলোচনা করেছি এবং তার সাহায্যেই আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি যে, তন্ত্রের উৎসে প্রাচীন পর্যায়ের প্রাকৃত বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণার পরিচয় থাকলেও তা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এতো দীর্ঘ দিন ধরে ও এমন গভীরভাবে কী করে প্রভাবিত করেছে।

তৃতীয়ত, তন্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আমাদের পক্ষে সাংখ্য-দর্শনের উৎস ও আদিরূপ সংক্রান্ত সমস্যাও উত্থাপন করতে হয়েছে। কেননা, তন্ত্রের মতোই সাংখ্য-মতেও প্রকৃতিই প্রধান, জগৎকারণ। এবং তন্ত্রের মতোই সাংখ্য-মতেও এই প্রকৃতি বহুলাংশে নারীরূপে কল্পিত: “বাচ্যবস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে-যেমন নারী পুরুষকে বশ করে;

প্রকৃতির ক্রিয়াও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং হাব ও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে”। অপরপক্ষে অধ্যাপক বেলভেলকার ও রানাডে দেখাচ্ছেন, কালক্রমে সাংখ্যের পুরুষ বলতে যাই বোঝাক না কেন আদিতে তা পুরুষ-মানুষবোধকই ছিলো। যদি তাই হয় তাহলে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কোনো বড়ো প্রভেদ নেই। সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলছেন, যথা স্ত্রী-পুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিস্তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গন্যেৎপত্তি। স্বভাবতই সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান বর্ণিত অসুর মতের--অতএব শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা অনুসারে লোকায়ত-মতেরও-কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বস্তুত, সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তার পার্থক্য যে নেহাতই সামান্য, এ বিষয়ে জৈন রেখকেরা ইতিপূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত দেখাচ্ছেন, শীলাঙ্ক-রচিত। সুত্রকৃতঙ্গসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য ও লোকায়তার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। অতএব, তন্ত্র তথা লোকায়ত-প্রসঙ্গেই আমরা সাংখ্যদর্শনের উৎস ও আদিরূপ সংক্রান্ত বহু মতবাদসমাকীর্ণ সমস্যার মধ্যেও প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছি এবং যতো আংশিকভাবেই হোক না কেন, একটি সমাধানেরও সন্ধান করেছি। ”

চতুর্থত, তন্ত্র ও সাংখ্যের উৎস-সংক্রান্ত সমস্যা যতোই জটিল হোক না কেন, তারই সমাধান-প্রচেষ্টায় আমরা জটিলতর একটি সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছি প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং সাম্প্রতিক যুগেও তার স্মারকের সমস্যা। তন্ত্র ও সাংখ্য নারীপ্রধান ধ্যানধারণা বলেই তার মধ্যে মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান-কিংবা, শ্রীযুক্ত ক্ষিত্তিমোহন সেন-এর মতে এদেশে যাকে ক্ষেত্রপ্রধান বলা হতো সেই-সমাজ-বাস্তবের প্রতিবিম্ব অনুমেয়। অতএব এই মাতৃপ্রধান সমাজবাস্তবের পটভূমি ছাড়া তন্ত্র ও সাংখ্যকে সম্যকভাবে বিচার করা যায় না।

বস্তুত, আমরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, লোকায়ত-তথা তন্ত্র ও সাংখ্য সংক্রান্ত অনেক ধারণা যে আজো আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে তার প্রধানতম কারণ হলো ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণা বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা এখনো অসম্পূর্ণ। অবশ্যই, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দকে অনুসরণ করে স্যর জন মার্সাল মোহেনজোদারোর ধর্মপ্রসঙ্গে এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া, ডক্টর এরেনফেলস তাঁর ‘মাদার রাইট ইন ইন্ডিয়া’ এবং শ্রীযুক্ত দীক্ষিত তাঁর ‘মাদার-গডেস’ গ্রন্থে ভারতে মাতৃপ্রধান সমাজ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মাতৃপ্রাধান্য-প্রসঙ্গে মর্গান, এঙ্গেলস এবং বিশেষ করে ব্রিফন্ট-এর গবেষণা বিদ্বানমহলে আজো অনাদৃত বলেই এতো অজস্র তথ্যের ব্যাখ্যাও অস্পষ্ট ও অসন্তোষজনক হয়ে থেকেছে।

পঞ্চমত, প্রাক-অধ্যাত্মবাদী-এবং সেই অর্থে প্রাকৃত পর্যায়ের বস্তুবাদী চিন্তাচেতনার সমস্যাও। কেননা, তন্ত্র ও সাংখ্য শুধুমাত্র নারী প্রাধান্যের পরিচায়ক নয়, প্রাক-অধ্যাত্মবাদী চেতনারও পরিচায়ক। জগৎকারণ ওই প্রধান শুধুই female principle নয়, material principles অবশ্যই উত্তরকালে তন্ত্রের উপর বিবিধ অধ্যাত্মতত্ত্ব আরোপিত হয়েছে; তবুও তন্ত্রের মূল তত্ত্ব বলতে দেহতত্ত্ব: যাহা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। এবং আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানবদেহকেই এইভাবে উপমা হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রের আদি-অকৃত্রিম রূপটির মধ্যে অধ্যাত্মবাদের অবকাশ নেই। অপরপক্ষে সাংখ্যকেও উত্তরকালে আস্তিক-এমনকি সেশ্বর-করে নেবার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু বাদরায়ণের সাংখ্য-খণ্ডন প্রভৃতি সাংখ্যের প্রাচীনতর পরিচয়গুলিকে পরীক্ষা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় সাংখ্য-মতের আদিরূপটির মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের স্থান থাকা সম্ভব নয়।

অতএব, আদিতে তত্ত্ব এবং সাংখ্য উভয়ই প্রাক-অধ্যাত্মবাদী চিন্তাচেতনার অচেতনকারণবাদের-পরিচায়ক। লোকায়তিক ধ্যানধারণার এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা কিছুটা পরোক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করে বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন তুলেছি, অধ্যাত্মবাদ ও চেতনকারণবাদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ ফুটে উঠবার ফলেই মানব-চেতনায় আধ্যাত্মবাদের বা চেতনকারণবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব, প্রাক-বিভক্ত সমাজের স্বাক্ষর বহন করছে বলেই লোকায়তিক ধ্যানধারণা প্রাক-অধ্যাত্মবাদী হয়ে থেকেছে।

। তিন।

বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল এবং আমাদের পক্ষে কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়নি। বস্তুত, পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেবার চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্যও ছিলো না। কেননা আমাদের ধারণায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত গবেষণা আজো অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য বিষয়ের মতোই লোকায়তসংক্রান্ত সমস্যাগুলির পূর্ণাঙ্গ সমাধান-সন্ধান কিছুটা অকাল-প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য। তার বদলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এ-বিষয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির বিচার এবং প্রকৃত সমস্যাবলীর স্বরূপ-নির্ণয়। বর্তমান গ্রন্থে আমরা প্রধানত এই চেষ্টাই করেছি।

তবুও আমরা এমনকি এ-কথাও দাবি করতে পারি না যে, লোকায়ত-সংক্রান্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যাই আমাদের পক্ষে উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে-সমস্যাগুলি উত্থাপন করতে পারিনি তার মধ্যে প্রধান হলো পালি পুথি বর্ণিত ছ'জন নাস্তিকদের নিয়ে সমস্যা। এদের নাম: পুরণ কিস্প, মক্ষলি গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলথিপুত্ত, নিগস্থ নাতপুত্ত। সাধারণত এঁদের,-বিশেষ করে এদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে-লোকায়তিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। অতএব ভূমিকায় আমরা এদের মতামতের সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো এবং আমাদের পক্ষে কেন এদের সমস্যা সম্যকভাবে উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি তাও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবো।

এঁদের কার মতবাদ যে ঠিক কী রকম ছিলো সে-কথা সঠিকভাবে সনাক্ত করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন। কেননা বিভিন্ন গ্রন্থে এদের উপর বিভিন্ন মতামত আরোপিত হতে দেখা যায়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক ব্যাসাম একটি চিত্তাকর্ষক ছক তৈরি করেছেন। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, দীঘ-নিকায়র

সামান্যফলসুত্তে এঁদের ষে-পরিচয় পাওয়া যায় খুব সম্ভব সেইটিই সবচেয়ে মৌলিক।

সামান্যফলসুত্তের আখ্যায়িকাটি মোটের উপর এই;

যুদ্ধ তখন ১২৫০ জন ভিক্ষু নিয়ে মগধের রাজধানী রাজগহতে অবস্থান করছেন। সে-সময়ে রাজা অজাতিসত্তু, আধ্যাত্মিক উপদেশের প্রয়োজন বোধ করলেন। প্রশ্ন হলো, কার কাছে এ-উপদেশ পাওয়া সম্ভব? রাজার ছ'জন মন্ত্রী একে একে ওই ছ'জন জ্ঞানীর নাম উল্লেখ করলেন এবং প্রত্যেককেই সুবিখ্যাত, গণাচারিয়ো, তিথ্থকারো, সাধুসন্মতো, চিরপঞ্চজিতো প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করলেন। কিন্তু এদের নাম শুনে রাজা কোনো উৎসাহ দেখালেন না। অবশেষে রাজকুমারদের চিকিৎসক জীবক বুদ্ধের নাম প্রস্তাব করলেন। রাজা তাতে সন্মত হলেন এবং বুদ্ধের কাছেই গমন করলেন।

ষে-প্রশ্ন রাজার চিত্তকে চঞ্চল করেছিলো তা এই: বৈষয়িক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল তো স্পষ্টই দেখা যায়; কিন্তু সন্ন্যাসের কোনো সুফল কি প্রদর্শন করা সম্ভব? রাজা বুদ্ধকে বললেন, ইতিপূর্বে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের কাছে তিনি এ-প্রশ্ন করেছেন; কিন্তু কোনো সুফল পাননি। বুদ্ধ রাজাকে অনুরোধ করলেন, উপরোক্ত ছ'জন নাস্তিক এ-প্রশ্নের কী কী উত্তর দিয়েছেন তা খুলে বলতে। উত্তরে রাজা যা বললেন প্রধানত তারই উপর নির্ভর করে আমরা পুরাণ-কসসপ প্রমুখের মতামত বোঝবার চেষ্টা করে থাকি।

উত্তরগুলি বিচার করে আধুনিক বিদ্বানেরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, এর মধ্যে নিগন্তু নাতপুত্তর মতটি বর্ধমান মহাবীরের মতের সঙ্গে অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক; অতএব তাকে লোকায়তিক না বলে জৈন বলাই বাঞ্ছনীয়। সঞ্জয়ের উত্তর অত্যন্ত দুর্বোধ্য: অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া, তাকে গ্রীক দার্শনিক ফিরোর শিষ্যদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই অর্থে সঞ্জয় চূড়ান্ত সন্দেহবাদী-কোনোরকম জ্ঞানের

সম্ভাবনাই তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু লোকায়ত বলতে এ-রকম চূড়ান্ত
অবিশ্বাসবাদ বোঝবার কোনো কারণ নেই।

অজিত কেশকম্বলীর মতবাদ যে ঠিক কী সে-বিষয়েও অন্তত কিছুটা
অস্পষ্টতা আছে। সামান্যফল সূত্রের বর্ণনা অনুসারে অজিতের মত হলো,

দান যজ্ঞ হোম এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম সমূহের কোনো ফলবিপাক
নাই। ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, উপপত্তিক কোনো
সত্তাও নাই। ইহলোকে সন্মগ-গতো (সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন?) কোনো শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ
নাই,--যাহারা সম্যক গমন করেন, যাঁহারা স্বয়ং অভিন্ন সাক্ষ্য দ্বারা ইহলোক এবং
পরলোকগুলিকে অনুধাবন করিতে পারেন এবং নিজেদের জ্ঞান অপরের কাছে
বিতরণ করিতেও পারেন। চারি মহাভূত-বিশিষ্ট পুরুষ যখন মারা যায় তখন তার
কায়ার পৃথিবী পৃথিবীতে প্রবেশ করে, কায়ার জল জলে প্রবেশ করে, কায়ার
তেজ তেজে প্রবেশ করে, কায়ার বায়ু বায়ুতে প্রবেশ করে এবং ইন্দ্রিয়গুলি শূন্যে
বিলীন হয়। চারজন শববাহী--এবং শবাধার হলো পঞ্চম--তাহার মৃতদেহকে
লইয়া যার এবং সৎকারস্থান পৌছানো পর্যন্ত মানুষেওরা তাহার গৌরব কীর্তন
করে। তাহার আস্থিগুলি কপোতের ন্যায় হইয়া যায় (পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়)
এবং তাহার আগল্হতিগুলি ভস্মে পরিণত হয়। ভিক্ষা অথবা দান-যাহারা এইরূপ
তুচ্ছ মিথ্যা প্রলাপ বকে তাহাদিগকে আস্তিক্যবাদী বলা হয়। মৃত্যুর পর মুর্থ ও
পণ্ডিতের মধ্যে প্রভেদ ছিল হয় এবং মরণের পর আর কিছুই থাকে না।

অজিতের এই মতটিও অনেকাংশে দুর্বোধ্য। সেই কারণেই এর
নানারকম ব্যাখ্যা হয়েছে। যেমন, বুদ্ধঘোষ বলছেন, অজিত পরলোক মানতেন,
কিন্তু মানুষের পক্ষে পরলোক-প্রাপ্তির সম্ভাবনা মানতেন না। এ-ব্যাখ্যা ঠিক হলে
অজিতকে লোকায়তিক বলতে বাধা হবে; কিন্তু এ-ব্যাখ্যা ঠিক কিনা সে-বিষয়ে

আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি না। অবশ্যই, এ-জাতীয় ব্যাখ্যার জটিলতায় প্রবেশ না করেও সামান্যফলসুত্তের অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট নির্দেশগুলির উপর নির্ভর করে প্রশ্ন তোলা যায়, অজিতকে লোকায়তিক বলে সনাক্ত করা কতখানি যুক্তিসম্মত হবে? তাঁর মতে দান, যজ্ঞ, হোম সুকৃত--সমস্তই নিরর্থক মানুষ চতুর্ভূত-বিশিষ্ট দেহ ছাড়া কিছুই নয়-মৃত্যুর পর এই চতুর্ভূত প্রকৃতিতেই প্রত্যাবর্তন করে, কিছুই বাকি থাকে না। এ-জাতীয় বক্তব্যের সঙ্গে অন্তত মাধববর্ণিত লোকায়ত মতের সাদৃশ্য আছে; কেননা মাধবের বর্ণনা অনুসারে লোকায়তিকেরা যাগযজ্ঞকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল মনে করেন এবং বলেন, ভস্মীভূতান্ত দেহস্য পুনরাগমনং, কুতঃ? কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মাধবের ওই লোকায়ত-বর্ণনা সংশয়াতীত বলে গ্রহণ করাও নিরাপদ নয়। তাছাড়া, সামান্যফলসুত্ত-বর্ণিত অজিতের মতের সঙ্গে মাধব-বর্ণিত লোকায়ত-মতের সাদৃশ্য আংশিকমাত্র, অজিতের অন্যান্য মন্তব্যের সঙ্গে মাধব-বর্ণিত লোকায়তের মিল নেই। অজিতের মতে ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই। মাতা নেই, পিতা নেই এবং তজ্জাত-নয় এমন কোনো সত্তাও নেই। শ্রমণ নেই, ব্রাহ্মণ নেই; জ্ঞান নেই, জ্ঞানের উপদেশ নেই। দেহতিরিক্ত সত্তা বলেও কোনো-কিছু নেই; শাশানগমনেই সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি।

এজাতীয় মতবাদের লোকায়তিক না বলে বরং চূড়ান্ত অর্থে সন্দেহবাদ বা scepticism আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুত, রিস-ডেভিডসও অজিতের মতকে লোকায়তিক না বলে the view of a typical sophist হিসেবেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

সামান্যফলসুত্ত বর্ণিত নাস্তিকদের মধ্যে বাকি থাকে আরো তিনজনের কথা: পুরাণ কস্‌সপ, মক্ষলি গোসাল এবং পকুধ কাচায়ন। এরা তিনজনেই মোটামুটি একই মতবাদ পোষণ করতেন এমন কথা অনুমান করবার অবকাশ আছে।

In certain other passage of the Pali canon the distribution of doctrines among the six teachers is significantly altered, in a way which strongly suggests that the credos ascribed in the Samanna-phala Sutta to Makkhali, Purana and Pakudha were aspects of a single body of teaching

এখন, জৈন পুঁথিপত্র থেকে এই তিনজনের মধ্যে মক্ষলি গোসাল-এর মতবাদ এবং সাধন-পদ্ধতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তার কারণ, মক্ষলি গোসাল দীর্ঘদিন ধরে মহাবীরেরই অনুগামী ছিলেন। যদিও নানান বিবাদ-বিসংবাদের পর শেষপর্যন্ত মহাবীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়েছিলো। এই কারণে জৈন লেখকের মক্ষলিকে হয়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন এবং এমনকি অনেকাংশে উপহাসের পাত্র হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কারণেই জৈন পুঁথিতে--বিশেষত ভগবতীসূত্রে --মক্ষলির জীবনী এবং মতামত সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যগুলি অবশ্যই অলৌকিক কাহিনীর আবর্জনায় অনেকাংশেই অস্পষ্ট; তবুও এগুলির মধ্যে থেকে অন্তত কিছু পরিমাণ বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক ব্যাসাম্ প্রধানত এইজাতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করেই মক্ষলি-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, ষষ্ঠ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মতোই মক্ষলি একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম আজীবিক সম্প্রদায়। মৌর্য যুগেই এ-সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত সাফল্য ঘটেছিলো। তারপর সম্প্রদায়টি ভেঙে যায়। কিন্তু অনেক পরে দক্ষিণ ভারতে চোল-রাজাদের আমলে এই আজীবিক সম্প্রদায়েরই পুনর্বিকাশ ঘটে; তারই ফলে তামিল ভাষায় লেখা আজীবিকদের গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আজীবিক নামটির অর্থ অনেকাংশেই অনিশ্চিত; আধুনিক বিদ্বানেরা তার নানারকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আজীবিকদের সাধনপদ্ধতিও অনেকাংশে দুর্বোধ্য; কেননা তার মধ্যে নগ্নতা, নাচ, গান--এমনকি হয়তো কামাচারেরও স্থান ছিলো। কিন্তু আজীবিকদের দার্শনিক মতবাদ অনেকাংশেই স্পষ্ট। তার নাম নিয়তিবাদ। অধ্যাপক ব্যাসাম এই নিয়তিবাদের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন:

The fundamental principle of Ajivika philosophy was Fate, usually called Niyati. Buddhist and Jaina sources agree that Gosala was a rigid determinist, who exalted Niyati to the status of the motive factor of the universe and the sole agent of all phenomenal change. This is quite clear in our locus classicus, the Samanna-phala Sutta...

Fatalism proper finds no place in orthodox Hinduism, Buddhism, or Jainism...The Indian doctrine of karma, as it is usually interpreted, provides a rigid framework within which the individual is able to move freely and to act on his own decision...

This doctrine Gosala opposed. For him, belief in free will was a vulgar error. The strong, the forceful, and the courageous, like the weakling, the idler, and the coward, were all completely subject to the one principle which determined all things...

The path of transmigration was rigidly laid out and every soul was fated to run the same course through a period of 8,400,000 mahakalpas. This figure is corroborated by independent testimony, and is a measure of the gigantic and weary universe of the Ajivika cosmologists.

আজীবিকদের দার্শনিক তত্ত্ব বলতে যদি প্রধানত এই হয় তাহলে তাদের লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া কতোখানি সঙ্গত হবে?

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামান্যফলা-সুত্তে আমরা যে-ছ'জন নাস্তিকের উল্লেখ পাই তাদের কাউকেই নিঃসংশয়ে লোকায়তিক আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

কিন্তু আমরা গ্রন্থমধ্যে এদের কথা আলোচনা যে উত্থাপন করতে পারিনি। তার কারণ সম্পূর্ণ অতন্ত্র। আসলে এদের কথা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আদিরূপের সঙ্গে—এবং বৌদ্ধভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে—এমনভাবে জড়িত যে, তার আলোচনা বাদ দিয়ে এঁদের কারুর কথাই সম্যকভাবে আলোচনা করবার উপায় নেই। কিন্তু নানা কারণে আমাদের পক্ষে এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের উৎস সংক্রান্ত সমস্যা তোলা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্যই গ্রন্থের কলেবর। লোকায়ত-প্রসঙ্গে অন্যান্য সমস্যাগুলির আলোচনা তুলতে গিয়েই এ-কলেবর রীতিমতো বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিক হলেও আমরা বৌদ্ধ-ভারতের দার্শনিক পরিস্থিতির কথা তুলতে সমর্থ হয়নি।

প্রথম খণ্ড

পটভূমি

১ম পরিচ্ছেদ

লোকায়তর অর্থবিচার

ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটির তাৎপর্য সত্যিই বিস্ময়কর।

আমাদের দেশে জনসাধারণের দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শন—এই দুটি কথা বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নি। নাম পাওয়া যায় একটিই: লোকায়ত। লোকায়ত মানে জনসাধারণের দর্শন, লোকায়ত মানেই আবার বস্তুবাদী দর্শন। অবশ্যই জনসাধারণের দর্শন যখন বলা হচ্ছে তখন পুরোটাই যেন ঠেস দিয়ে বলবার চেষ্টা: সাধারণ মানুষের বুদ্ধিটা তেমন সরেস নয়, তার জন্যেই এই মাটির পৃথিবীটাকেই তারা চরম সত্য মনে করে। তবু ছোটো করবার উৎসাহে বলা হলেও কথাটা ছোটো নয়; জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুবাদের সম্পর্ক যে এতো নিবিড় তার ইঙ্গিত আর কোনো দেশের দার্শনিক পরিভাষার মধ্যে টিকে আছে কি না খুবই সন্দেহের কথা। তাই লোকায়ত-দর্শনের আলোচনার শুরুতে এই ইঙ্গিতটিকেই স্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবে হবে।

জনগণের দর্শন ও বস্তুবাদী দর্শন

লোকায়ত বলতে বোঝায় সাধারণ লোকের দর্শন, জনসাধারণের দর্শন। লোকেষু আয়তো লোকয়তঃ। অর্থাৎ কিনা, সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এ-দর্শনের ওই রকম নাম। মাধবাচার্যের লেখা সর্বদর্শনসংগ্রহ বলে সংস্কৃত পুঁথির ইংরেজী তর্জমা করবার সময় অধ্যাপক কাওয়েল(১) লোকায়ত শব্দটিকে এই এই রকমই একটা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সে-চেষ্টার পিছনে প্রাচীনদের সম্মতিরও অভাব নেই। দিব্যবিধান(২) নামের বৌদ্ধ পুঁথির স্থানবিশেষে লোকায়ত শব্দের সোজাসুজি এই অর্থই ধরা হয়েছে। জৈন লেখক বুদ্ধিজনের ষড় দর্শনসমুচ্চরের উপর টীকা রচনা করবার সময় গুণরত্ন(৩) বলছেন, যারা সাধারণ লোকের মতো নির্বিচার আচরণ করে তাদেরই বলে লোকায়ত। কিন্তু শুধুমাত্র নাস্তিকদের নজিরই নয়; লোকায়ত বলতে যে জনগণেরই দার্শনিক চেতনা বুঝতে হবে এ-কথা অগ্রণী আস্তিকরাও বারবার স্বীকার করেছেন। স্বয়ং মাধবাচার্য(৪) বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের পক্ষে লোকায়ত নামটি বেশ মানানসই হয়েছে, কেননা সাধারণ লোক নীতিকামশাস্ত্র নিয়ে বিভোর হয়ে অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে আর তাই আমল দেয় না পরলোকের কথাকে,—ফলে তাদের চার্বাক-মতানুসারী মনে করাই ঠিক। মাধবাচার্যের ঢের আগে শঙ্করাচার্য(৫) লোকায়তিক ও প্রাকৃতজন—এই দুটি শব্দকে একসঙ্গে আর একনিশ্বাসে উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন দু’-এর মধ্যে সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ!

কিন্তু ওই লোকায়ত নামেরই আরো মানে হয়। লোকায়ত হলো ইহকাল-সংক্রান্ত দর্শন: যারা পরকাল মানে না, আত্মা মানে না, ধর্ম মানে না, মোক্ষ মানে না, তাদেরই বলে লোকায়তিক। তারা মনে করে জল-মাটি-আগুন-হাওয়া দিয়ে গড়া এই মূর্ত পৃথিবীটাই একমাত্র সত্য, আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছুই

বোঝায় না। কথায় বলি বটে আমার দেহ, যেন আমি আর দেহ দুটো আলাদা
কিছু। কিন্তু এ হলো নেহাতই কথার কথা। যেমন কিনা বলা হয় রাহুর মাথা।
আসলে রাহু তো আর সত্যিই মাথাটুকু ছাড়া কিছুই নয়।

তাহলে এই মানে অনুসারে লোকায়ত হলো দেহাত্মবাদ, বস্তুবাদ।
ইংরেজী পরিভাষায় যাকে বলে মেটিরিয়ালিস্‌ম্।

অধ্যাপক তুচি(৬) দেখাবার চেষ্টা করেছেন, ব্যুৎপত্তির দিক থেকেও
লোকায়ত শব্দ এই রকমই একটা অর্থের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য বৃদ্ধসম্মতি হিসাবে
এ-কথার পক্ষে তিনি যে-নজিরটি দিচ্ছেন তা কিছুটা জটিল: বুদ্ধঘোষ(৭) বুঝি
আয়াত শব্দটাকে আয়তন অর্থে ব্যবহার করেছেন—আয়তন বলতে বোঝায়
ভিত্তি। তাই যে-মতবাদের ভিত্তি হলো এই ইহলোক,—মাটির পৃথিবী,—তাকেই
বলে লোকায়ত।

বলাই বাহুল্য, অধ্যাপক তুচির পক্ষে এই অর্থটি প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা
যতোখানিই কষ্টকল্পিত হোক না কেন, লোকায়ত নামটিকে আমরা সাধারণত
বস্তুবাদ-সূচক অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। লোকায়ত বলতে বস্তুবাদই বোঝায়। আর
তা বোঝবার জন্যে খুব একটা ঘোরালো প্রমাণের সত্যিই দরকার নেই। কেননা,
হরিভদ্র(৮) ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে লোকায়তমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, লোক
বলতে শুধু সেইটুকুই যা কি না ইন্দ্রিয়গোচর: এতাবানেবলোকেহয়ং
বারানিন্দ্রিয়গোচরঃ। টীকাকার মণিভদ্র(৯) কথাটাকে আরো পরিষ্কার করে
বলছেন, লোক মানে নিছক পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ।

তার মানে, প্রত্যক্ষে যেটুকু ধরা পড়ে লোকায়তিকরা শুধুমাত্র
সেইটুকুকেই সত্যি বলে স্বীকার করেন। তারই নাম লোক। লোকই একমাত্র
সত্য।

১. E. B. Cowell SDS 2n. cf. S. N. Dasgupta. HIP 3:515 cf.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: বৌদ্ধধর্ম ৩৭

২. S. N. Dasgupta op. cit. 3:514.

৩. গুণরত্ন: তর্কন্যায়দীপিকা ৩০০—“লোকা নির্বিচারাঃ সামান্যা
লোকাস্তদ্বদাচরন্তিস্মেতি লোকায়তা লোকায়তিকা ইত্যপি”।

৪. মাধবাচার্য: সর্বদর্শনসংগ্রহ ১।

৫. শঙ্করাচার্য: ব্রহ্মসূত্রভাষ্য: ১.১.১: “দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মোতি
প্রাকৃতজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নঃ”।

৬. S. N. Dasgupta op. cit. 3:514-5.

৭. Ibid 3:515n.

৮. হরিভদ্র: ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ৮১ শ্লোক।

৯. St. Petersburg Dictionary-তেও লোকায়ত শব্দের অর্থ করা
হয়েছে materialism. cf. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: বঙ্গদর্শন—শ্রাবণ ১২৮১,
“ইহলোক ঐ দর্শনের সর্বস্ব, তজ্জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হয়”।

প্রত্যক্ষ ও প্রবঞ্চনার প্রতিষেধক

কিন্তু কেন? যেটুকুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাচ্ছে সেটুকু ছাড়া আর কিছুই ওঁরা সত্যি বলে মানতে চাননি কেন? এ-প্রশ্নের জবাব হিসাবে মণিভদ্র দুটি যুক্তি উল্লেখ করছেন, দুটিরই তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, অবশ্যই ধর্মের প্রবঞ্চনাটা এড়াবার জন্যে। অনুমান, আগম ইত্যাদি জ্ঞানের তথাকথিত অন্যান্য উৎসের দোহাই দিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তের দলে সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটা মোহের সঞ্চার করে। এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণকে স্বীকার করা নিরাপদ নয়। মণিভদ্রের ভাষায়:

এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিঞ্চিৎ
অনুমানাগমাদিদার্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থম্ মুঞ্চজ্ঞান্
স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যতক্ষ্যগম্যাগম্যেহয়োপাদদেয়াদিসংকটে
পাতয়ন্তি, মুঞ্চধার্মিকাক্ষম্ চ উৎপাদয়ন্তি...(১০)

দ্বিতীয়ত,—এবং ওই দ্বিতীয় যুক্তিটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ—
লোকায়তিকেরা নাকি বলতেন, অপ্রত্যক্ষকে (অর্থাৎ কি না যা প্রত্যক্ষভাবে জানা
যাচ্ছে না তাকেও) যদি সত্যের সম্ভাবনা দিতে হয় তাহলে দরিদ্রের পক্ষে তার
দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয় দাসের পক্ষে দাসত্বের কথা
ভুলে যাওয়া। কেননা যে দরিদ্র তার পক্ষে দারিদ্র্যটুকুই প্রত্যক্ষ, যে দাস তার
কাছে দাসত্বটুকুই প্রত্যক্ষ। কিন্তু যদি অপ্রত্যক্ষকেও অস্তিত্বের সম্ভাবনা দিতে হয়
তাহলে দরিদ্রও ‘স্বর্ণরাশির মালিক হয়েছি’ এমন কথা কল্পনা করে নিজের দুস্থ
অবস্থাকে অবহেলায় দলন করতে পারে, দাস মনে করতে পারে সে আর দাস

নয়, স্বামী। এক কথায়, এইভাবে দরিদ্র-ধনিভাব ও সেব্য-সেবকভাব সব কিছু নস্যাত্ হয়ে যায়। মণিভদ্রের ভাষায়:

কিদ্ চ অপ্রত্যক্ষম্ অপি অস্তিত্বতয়া অতু্যপগম্যতে চেৎ জগৎ অনপহুতম্
এব তাৎ, দরিদ্রঃ হি স্বর্ণরাশীঃ মে অভি ইতি অদ্ভুধ্যায় হেলয়া এব দৌঃশ্চ্যম্
দলয়েৎ, দাসঃ অপি দ্বেচেতসি স্বামিতাম্ অবলম্ব্য কিংকরতাম্ নিরাকূর্য্যাৎ
ইতি।...এবং ন কশ্চিৎ সেব্য-সেবকভাবঃ দরিদ্রধনিভাবঃ বা স্যাৎ।(১১) (টাইপে
কিঞ্চিৎ ভুল থাকতে পারে)

তার মানে কি এই এ লোকায়তিকেরা প্রত্যেকের উপর এতোখানি জোরে
যে দিতে চেয়েছিলেন তার কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এইভাবেই দরিদ্রকে
তার দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন রাখা যাবে, দাসকে সচেতন রাখা যাবে দাসত্ব
সম্বন্ধে? এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, অজিত কেশকম্বলী, মক্ষলি গোসাল, পূর্ণ কস্যপ
প্রমুখ যে-ক'জন দার্শনিককে সাধারণত বস্তুবাদী বা লোকায়তিক বলে স্বীকার
করা হয় তাঁরা শুধু যে ক্রীতদাস ছিলেন তাই নয়, দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও
করেছিলেন! দাসত্ব-চেতনা মন থেকে মুছে গেলে এ-বিদ্রোহ নিশ্চয়ই সম্ভবপর
নয়।

অবশ্যই মণিভদ্র কোথা থেকে লোকায়তিকদের এই যুক্তিগুলি সংগ্রহন
করেছিলেন তা জানতে পারলে ওই প্রশ্নের জবাব ভালো করে বুঝতে পারা
যেতো। কিন্তু তা জানবার কোনো উপায় নেই। কেননা, লোকায়তিকদের লেখা
সমস্ত পুঁথিই বিলুপ্ত হয়েছে।

১০. মণিভদ্রঃ: ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা, ৮১ শ্লোক।

১১. Ibid.

বিলুপ্ত পুঁথির কথা

কোনো কালে লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্র বলতে সত্যিই কি কিছু ছিলো? ছিলো। তার প্রমাণ, ওই বৌদ্ধ পুঁথি বিদ্যবদান। তার প্রমাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য। খোঁজ করলে হয়তো আরো প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-দুটি প্রমাণই বা কম কিসের?

দিব্যাবদানে(১২) স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে: লোকায়তং ভাষ্য-প্রবচনম্। লোকায়তের উপর এমন কি ভাষ্য ছিলো, প্রবচনও ছিলো। কতোদিন আগে ছিলো? কী নাম সেই ভাষ্যের? এই দুটি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। কোথা থেকে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যিশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত দেড় শ' বছর আগে পতঞ্জলি তাঁর এই বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। আর ওই বইতেই(১৩) ব্যাকরণের একটি নিয়ম ব্যাখ্যা করবার প্রসঙ্গে তিনি লোকায়তের উপর ভাণ্ডরি নামের বর্তিকা বা ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন: বর্নিকা শব্দ স্ত্রী লিঙ্গে নাকি বর্তিকাও বোঝাতে পারে, যেমন, 'বর্নিকা ভাণ্ডরি লোকায়তস্য, বর্তিকা ভাণ্ডরি লোকায়তস্য'। এর থেকে নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয় যে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত দেড় শ' বছর আগে পর্যন্ত লোকায়ত-শাস্ত্র নিশ্চয়ই ছিলো, এবং তার উপর অন্তত একটি ভাষ্যও নিশ্চয়ই ছিলো, সে ভাষ্যের নাম ভাণ্ডরি।(১৪)

কিন্তু এই নামটাই টিকে আছে। পুঁথিগুলি বিলুপ্ত হয়েছে।

কেন বিলুপ্ত হলো? সত্যি বলতে, তেমন জোর গলায় এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দেবার উপায় নেই। তবে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু(১৫) বলছেন, খুব সম্ভব উত্তরযুগে পুরোহিতদল এবং সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীয়া ভারতবর্ষে বস্তুবাদীদের অনেক পুঁথিপত্র ইচ্ছে করে নষ্ট করেছিলো। যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই মানতে হবে সেকালেও যে-মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে দেশশাসনের ক্ষমতা ছিলো তারাও জনগণের এই দর্শনটি সম্বন্ধে—অর্থাৎ লোকায়ত বা বস্তুবাদী দর্শন

সম্বন্ধে,—খুব সহনশীলতার পরিচয় দেন নি। তার মানে, একালের সঙ্গে সেকালের যতো তফাতই থাক না কেন, অন্তত একটা বিষয়ে মিল আছে: জনসাধারণের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে শাসক-সম্প্রদায়ের কঠিন বিধান।

অথচ ওই কথাটিই আবার পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু মানতে রাজী নন, তাই তাঁর উক্তি স্ববিরোধী। প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করতে এগিয়ে তিনি সেকালের যে-ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান তার মূল কথা হলো,

I imagine, however, that in spite of the vast mental and cultural difference between the small thinking minority and the unthinking masses, there was a bond between them or, at any rate, there was no obvious gulf. The graded society in which they lived had its mental gradation also and these were accepted and provided for. This led to some kind of social harmony and conflicts were avoided.(১৬)

মোদ্দা কথায়, চিন্তাশীল বলতে সেকালে ছিলো মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ। বাকি মুচ জনতার মধ্যে কোনো রকম চিন্তার বালাই ছিলো না। কিন্তু এ-দু'-এর মধ্যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক তফাতটা বিরাট হলেও একটা বন্ধনও ছিলো। অন্তত কোনো প্রফট খাদ ছিলো না। ক্রমানুসারে সাজানো যে-সমাজটিতে তারা বাস করতো সে-সমাজে মানসিক ক্রমানুসারও ছিলো। সেগুলি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো এবং তার জন্যে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিলো। এরই দরুন দেখা দিয়েছিলো একটা সামাজিক সামঞ্জস্য এবং সম্ভব হয়েছিল সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া।

চিত্রটি মনোরম। সন্দেহ নেই। একালের বাস্তবটা যদি ওই কাল্পনিক অতীতের অনুরূপ হতো—যদি সংঘাত না থাকতো, যদি শুধু সামঞ্জস্যই থাকতো—তাহলে আজকে অনেকে নিশ্চয়ই নিশ্চিত হতে পারতেন। কিন্তু সেকালের ওই সরল-সুন্দর ছবিটি এঁকে পণ্ডিত জবাহরলালা নেহেরু আমাদের মনে যেটুকু নেশা ধরিয়েছিলেন তা তিনিই এক মুহূর্তে ভেঙে দিলেন লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্রগুলি ধংস করবার কথা উল্লেখ করে।

১২. S. N. Dasgupta op, cit. 3:514.

১৩. পাণিনি ৭.৩.৪৫।

১৪. G. Tucci (in PFIPC-1925: 35) এ-বিষয়ে আরো তথ্য উল্লেখ করেছেন। R. Garbe (ERE 8.138) আরো একটি প্রমাণ হিসাবে ভাস্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (৩.৩.৫৩) উল্লেখ করেছেন।

১৫. J. Nehru DI 80.

১৬. Ibid 77.

বিতণ্ডাবাদী

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু যাদের মূঢ় জনতা বলে বর্ণনা করেছেন তাদেরই দার্শনিক চেতনাটুকু নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। কেননা, প্রাচীনেরা বারবার লিখে গিয়েছেন যে লোকায়ত বলতে শুধুই বস্তুবাদী দর্শন মনে করা চলবে না, মনে রাখতে হবে এই হলো দেশের জনসাধারণের দর্শন।

অবশ্যই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মাধবাচার্যই বলুন আর শঙ্করাচার্যই বলুন—লোকায়ত দর্শনকে যখন তাঁরা সাধারণ লোকের দর্শন বলে উল্লেখ করেছেন তখন তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত দার্শনিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া নয়; তার বদলে লোকায়ত-দর্শনকে ওই বলে খাটো করবার বা ছোটো করবার চেষ্টাই।

মূঢ় জনতা। তাদের বোধটা নেহাতই স্থূল, তাই তারা মনে করেছে দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছুই নেই। তাদের দৃষ্টিটা নেহাতই সংকীর্ণ, তাই তারা ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোক বা পরকালকে দেখতে পায় নি। তাদের রুচিটা নেহাতই কদর্য, তাই তারা মনে করেছে অর্থ ও কামই পরম পুরুষার্থ—ধর্ম ও মোক্ষের কথা শুনলে তারা ভয় পেয়েছে, ভেবেছে মাথায় হাত বোলেতে এসেছে বুঝি!

কিন্তু লোকায়তিকদের লেখা পুঁথিপত্রগুলি বিলুপ্ত হলেও তাঁদের বিদ্রূপ করবার জন্যেই বিপক্ষরা তাঁদের সম্বন্ধে যতটুকু টুকরো-টাকরা সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন সেগুলিকে পরীক্ষা করলে সন্দেহ হয়, লোকায়তিকেরা যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন সেগুলির মধ্যে এই রকমের হাবাগোবা বোকাসোকা মনোভাবের পরিচয় ছিলো না। এমন কি, মনে রাখা দরকার, লোকায়তিকদের বর্ণনায় স্বয়ং বুদ্ধঘোষ(১৭) বিতণ্ডাবাদী বলে বিশেষণ ব্যবহার করে গিয়েছেন। অন্যান্য পুঁথিতেও হুবহু একই কথাই লেখা আছে(১৮)। এখন

বিতণ্ডা আর বাদ—এই দুটি কথাই যে একসঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা খুবই সমস্যায় পড়েন। কেননা, ন্যায়সূত্র(১৯) অনুসারে বিতণ্ডা মানে হলো নিছক নেতিবাচক তর্ক—একটা মত খণ্ডন করবার জন্যে তর্ক করা হচ্ছে কিন্তু কোনো পাল্টা-মত স্থাপন করবার উৎসাহে নয়। আর বাদ বলতে বোঝায় ঠিক এর উল্টো: একটা মত স্থাপন করবার উদ্দেশ্যেই বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করবার চেষ্টায় তর্ক। তাই সমস্যা হলো, একই সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে দুটো কথাই কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? একালের পণ্ডিতেরা তাঁদের ওই সমস্যা নিয়ে থাকুন। আমাদের যুক্তির পক্ষে আপাতত যেটা খুবই জরুরী কথা সেটা হলো, লোকায়তিকেরা রীতিমত ভালো যুক্তিতর্ক করতে জানতেন। তাঁদের যুক্তিতর্কগুলি ছিলো খুবই ধারালো। সে-সব যুক্তিতর্কের কিছুকিছু নমুনা পাবেন মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে(২০), আরো নানান বইতে(২১)। এমনকি, আমরা পরে দেখবো, এ-কথা অনুমান করবারও অবকাশ রয়েছে যে প্রাচীন ভারতে যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন লোকায়তিকেরাই।

তাই চিন্তার জড়তার দরুনই তাঁরা এই জড় জগৎটাকে একমাত্র সত্য মনে করেছেন, এ-কথা বললে তথ্যবলের চেয়েও দেহবলের পরিচয় দেওয়া হবে। লোকায়তিকদের বিপক্ষরাই তাঁদের সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখে গিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় তাঁরা চিন্তা করতে জানতেন, এবং সে-চিন্তা খুবই তীক্ষ্ণ। লোকায়ত-দর্শনের ধ্বংসস্তুপ থেকে যখন তার পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করবো তখন এ-কথার আরো ভালো নজির দেখানো সম্ভব হবে।

কিন্তু সে-সব কথা না হয় আপাতত ছেড়েই দিলাম। আপাতত না হয় মেনেই নিলাম যে জনসাধারণ মূঢ়, প্রাকৃত, উচ্চাঙ্গের চিন্তার অযোগ্য। আর তার জন্যেই তারা ও-রকম স্থূল কথাবার্তাকেই, -বস্তুবাদকেই, -সত্য বলে মনে করেছে। তাহলেও, অন্তত এটুকু তো মানতেই হবে যে, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শন আর জনসাধারণের দর্শন—দুটো কথা

আলাদা কথা নয়। তার বদলে, একই কথার এপিঠ-ওপিঠ। কেননা, প্রাচীরেরাও বারবার লিখে গিয়েছেন, আর আধুনিক পণ্ডিতেরাও স্বীকার করছেন, লোকায়ত কথার মানে একটা নয়। জনসাধারণের দর্শন। বস্তুবাদী দর্শন। দুই-ই।

১৭. T. W. Rhys Davids DB 2:167. cf. S. N. Dasgupta op. cit. 3:513

১৮. S. N. Dasgupta op. cit. 3:512n

১৯. Ibid 3:512

২০. সর্বদর্শনসংগ্রহ ৫।

২১. হরিভদ্রের ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্ন ও মণিভদ্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভারতের ঐতিহ্য

সেখান থেকে একালের কথায় আসা যাক। একালের কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেননা, লোকায়ত দর্শনের পুঁথিপত্রগুলি যতোকাল আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাক না কেন, হাজার হোক আমরা তো আজকের দিনে এ-আলোচনার তাৎপর্য কতোখানি সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার বই কি।

আজকের দিনে আমরা বারবার শুনতে পাই, বস্তুবাদী দর্শনটার সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ-দর্শন নেহাতই বিদেশী ব্যাপার, পশ্চিমী ব্যাপার—দেশের জমিতে এর কোনো শিকড় ছিলো না। আমাদের দেশের ইতিহাস আলাদা, জীবনের আদর্শ আলাদা,—সব কিছুই অন্য রকমের। পশ্চিমের আদর্শটা হলো বস্তুবাদী আদর্শ, ভোগের আদর্শ,—ভুল আদর্শ। তারই মোহে পড়ে আজকের পশ্চিমী সভ্যতা কী রকম উন্মাদের মতো আত্মনাশের পথে এগিয়ে চলেছে! তার বদলে, আমাদের দেশের আদর্শ হলো ত্যাগের আদর্শ, আধ্যাত্ম-চেতনার আদর্শ। আজ বরং আমাদের দেশের এই আদর্শকেই গ্রহণ করতে পারলে পশ্চিমী সভ্যতা অমন ভয়াবহ ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু তার বদলে আমরা যদি আমাদের নিজস্ব আদর্শটিকে ছেড়ে এই প্রাচ্যের জমিতে ওই পশ্চিমী বস্তুবাদের বীজ বুনতে যাই তাহলে অঘটন ঘটবে, জন্মাবে এক বিষবৃক্ষ,—তার ফল আমাদের কল্যাণ করবে না।

এই কথাগুলিই এতোবার, এতোভাবে(২২), আমাদের বলা হয়েছে যে শুনতে শুনতে অনেকেই মনে করেছেন, সত্যিই হয়তো বা তাই। সত্যিও বুঝি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনের কোনো স্থান নেই, সত্যিই বুঝি আমাদের দেশের জমিতে শুধু অনাবিল অধ্যাত্মবাদেরই বিকাশ ঘটেছে।

অথচ এতোগুলি কথার মধ্যে একটিও সত্যি কথা নয়।

প্রথমত, পাশ্চাত্য দর্শন যে বস্তুবাদী দর্শন, এই কথাটাই ভুল। আজকের পাশ্চাত্য দেশগুলি যে বস্তুবাদের মোহে পড়েই অমন আত্মনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, সে-কথাটা আরো বেশি ভুল। আত্মনাশের আয়োজন যে নেই তা নয়: পৃথিবীর বুক থেকে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে শোনা যায় আর একটা মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে। কিন্তু তার সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্কটা কী রকম? ঐকান্তিক বিরোধের সম্পর্কই। কেননা আজকের দিনে যাঁরা সত্যিই এই মৃত্যুর মহাযুদ্ধের বড়ো বড়ো যজমান তাঁদের কাছে বস্তুবাদ দর্শনই বিরাট বিভীষিকার মতো। তাই তাঁদের মুখপাত্ররা বস্তুবাদকে হাজারবার খণ্ডন করেও স্বস্তি পান না, আবার নতুন করে খণ্ডন করবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন(২৩)। এবং বস্তুবাদকে খণ্ডন করে অধ্যাত্মবাদী আর ভাববাদী মতবাদকে রকমারি মুখোস পরিয়ে রকমারি উপায়ে প্রচার করতেই তাঁরা আজ ব্যস্ত। অবশ্যই, আজকের ইয়োরোপের দার্শনিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করবার অবকাশ আমরা এই বইতে পাবো না। যাঁরা সে-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং দেখাচ্ছেন আজকের দিনে স্বার্থান্ধ যুদ্ধবাদীরা কী ভাবে বস্তুবাদকে ধূলিস্যাৎ করে তারই ধ্বংসস্তুপের উপর অধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,- পাদটীকায় তাঁদের বই-এর নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হলো(২৪)।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হলো অপর প্রশ্নটি: ভারতীয় দর্শন সত্যিই কি অনাবিল অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন?

২২. যথা... “the fundamental characteristic of Indian thought was an idealistic one”: G. Tucci PFIPC-1925, 35.

২৩. Philosophy for the Future দ্রষ্টব্য।

২৪. H. K. Wells - Pragmatism of Imperialism ইত্যাদি

কাদের ধ্যানধারণা?

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দর্শন-বিষয়ে একটি দু'খণ্ডের বই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেশ-বিদেশের নানা দার্শনিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এই ভূমিকায় তিনি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য হলো বহির্জগতের চেয়ে মানুষের অধ্যাত্মজগতের প্রতিই অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া।

The characteristic of Indian thought is that it has paid greater attention to the inner world of man than to the outer world.(২৫)

ভারতবর্ষে যে বস্তুবাদী চিন্তাধারার কোনো রকম পরিচয়ই ছিলো না এ-কথা অবশ্য ও-বইতে সরাসরি বলা হয় নি। চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন বলে একটা কিছু ছিলো বই কি। এমন কি আলোচ্য গ্রন্থে লোকায়ত দর্শনের জন্যে ১০৭৯ পাতার মধ্যে রীতিমতো ৬ পাতা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু প্রশ্ন ওঠে, এই লোকায়ত দর্শনের মর্যাদাটা নিয়ে। আমাদের দেশে সত্যের সন্ধান মানুষের যে-বিচিত্র অভিযান তার মধ্যে লোকায়ত-দর্শনের তাৎপর্য ঠিক কতোটুকু? এ-দর্শন কাদের দর্শন ছিলো?

ভারতীয় দর্শনের যে-কোনো একটি পাঠ্যপুস্তক উল্টে দেখতে পারেন। দেখবেন লেখা আছে, লোকায়ত দর্শন ছিলো মাত্র মুষ্টিমেয় অধঃপাতে-যাওয়া সুখাস্থেষীর মনের কথা। নিছক নিজেদের ভোগবিলাস ছাড়া তারা আর কোনো

আদর্শকেই আদর্শ বলে মানতো না। তারা শুধু ঘি খাবার তালেই ঘুরতো,—তা সে ধার করেই হোক আর যে করেই হোক!

এ-হেন মতবাদ যে নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটাবে, সে-কথা কি আর খুলে বলবার দরকার আছে? তবু দেখবেন, ভারতীয় দর্শনের বেশির ভাগ বইতে লেখা আছে, সেকালের ঋষিরা লোকায়ত দর্শনের এই ভয়াবহ পরিণামটির কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার ব্যাপারেরো আলস্যের পরিচয় দেন নি। কেননা, লোকায়ত দর্শনের উৎপত্তি নিয়ে মৈত্রায়ণ উপনিষদে(২৬) একটি অদ্ভুত গল্প আছে। একবার নাকি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। তখন দেবগুরু বৃহস্পতি এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি অসুরগুরু শুক্রের ছদ্মবেশ ধরে অসুরশিবিরে প্রবেশ করে প্রচার করলেন এই বস্তুবাদী মতবাদ। ফলে অসুরদের নৈতিক পতন ঘটলো, আর তারই দরুন তারা দেবতাদের কাছে পরাজিত হলো।

লোকায়ত দর্শনকে দেশের লোকের সামনে এই ভাবে এক ভয়াবহ ব্যাপার বলে প্রচার করবার চেষ্টা শুধু উপনিষদে নয়, পৌরাণিক সাহিত্যেও। কাহিনীটা মোটের উপর একই(২৭)।

অবশ্যই এই কাহিনীর মধ্যে দেবগুরুর নিজস্ব যে-নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা সত্যিই ভালো না মন্দ, সে-প্রশ্নের আলোচনা উপনিষদাদির পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা কাহিনীটির মূল উদ্দেশ্য হলো, লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে একটি ভীতি প্রচার করা। শুধুমাত্র এই ভীতিপ্রচারই নয়। এমন কি, সেকালের আইন-কর্তারাও এ-দর্শনের বিরুদ্ধে রীতিমতো আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। প্রমাণ মনুস্মৃতি। মনু(২৮) বলেছেন, অতিথিযোগ্য কালেও লোকায়তিকেরা (হৈতুকঃ = বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ) উপস্থিত হয় তাহলে এমন কি বাক্যদ্বারাও এদের সম্ভাষণ করা চলবে না। লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে মনুর আরো নানারকম কঠিন কঠিন বিধান(২৯) আছে।

তবুও, লোকায়ত নামটির অর্থ বিচার করতে গিয়েই দেখা গেলো, আতঙ্কজনক গল্প প্রচার করে, আইন করে, বই পুড়িয়ে—আরো হাজারো অকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের মন থেকে সেকালের শাসকেরা এই দর্শনটি সত্যিই সরাতে পারে নি। লোকায়ত দর্শন মানে শুধু বস্তুবাদ নয়, জনগনের দর্শনও। জনসাধারণের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের সম্পর্ক যে কতো নিবিড় সে কথা আজো আমাদের দেশে এই নামটির মধ্যেই পরিষ্কার ভাবে টিকে রয়েছে।

তাই এ-কথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে ভারতীয় দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তব জগৎটাকে ছেড়ে মানুষের অধ্যাত্ম জগৎটির দিকেই মনোযোগ দেবার চেষ্টা।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটে নি। নিশ্চয়ই ঘটেছিল। কিন্তু সে-দর্শন ছিলো একটি সংকীর্ণ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিলো না। সেই সংকীর্ণ শ্রেণীর হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা ছিলো বলেই ওই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পুঁথিপত্রগুলিকে পুড়িয়ে ফেলবার কোনো কারণ তো ঘটেই নি; বরং এ-জাতীয় দার্শনিক রচনার প্রচার যাতে প্রশস্ত হয় তার জন্যেও দেশে নানাবিধ ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু তাই বলে শুধুমাত্র ওই ধরনের পুঁথিপত্রগুলিকেই দেশের দার্শনিক চিন্তাধারার একমাত্র পরিচায়ক মনে করাটা কি ঠিক? যে-সব পুঁথি বিলুপ্ত হয়েছে সেগুলির সাক্ষ্যকেও তো উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশে অধ্যাত্মবাদী দর্শন যে শুরুতে শুধুমাত্র শাসন-শ্রেণীর চেতনাদেই প্রতিভাত হয়েছিলো এ-কথা উপনিষদের ঋষিরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলে গিয়েছেন। প্রমাণ: ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ (।।৫।৩।।)। এখানে উপনিষদের গল্পটির মূল কথাটুকু উল্লেখ করা যাক:

শ্বেতকেতু আরুণেয় এক সময়ে পাঞ্চগল সমিতিতে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রবাহণ জৈবলি তাঁকে প্রশ্ন করলেন: হে কুমার, তোমার পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন কি? শ্বেতকেতু বললেন, নিশ্চয়ই দিয়েছেন। প্রবাহণ তখন শ্বেতকেতুকে পরলোকতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যা-সংক্রান্ত পরের পর পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। শ্বেতকেতু একটিরও জবাব দিতে পারলেন না। তখন প্রবাহণ বললেন, তবে কেন বলছিলে যে তুমি উপদিষ্ট হয়েছে? ফলে মনের দুঃখে শ্বেতকেতু পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, সেই রাজন্যবন্ধু আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার একটিরও জবাব দিতে পারি নি। পিতা স্বীকার করলেন, তিনি নিজেও এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানেন না—জানলে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতেন।

তারপর গৌতম (শ্বেতকেতুর পিতা) নিজেই রাজভবনে গেলেন। রাজা অভ্যাগতকে সমাদর করলেন। সকলে রাজা সভায় উপস্থিত হলে গৌতমও সেখানে গেলেন। রাজা তাঁকে বললেন, মনুষ্যসম্বন্ধী বিত্ত আপনারই থাকুক। আপনি আমার ছেলের কাছে যে-কথা বলেছিলেন আমাকে তাই বলুন। শুনে রাজা বিষণ্ণ হলেন।

রাজায় আঞ্জায় গৌতম সেখানে দীর্ঘকাল বাস করলেন। তারপর রাজা তাঁকে বললেন, আপনি যে আমাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার পূর্বে পুরাকালে কোনো ব্রাহ্মণই এই বিদ্যা লাভ করে নি। (এ-বিদ্যা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়গণেরই জানা ছিলো)। এই জন্যই সর্বত্র রাজ্যশাসন করবার ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতেই রয়েছে।

“তন্মাধ্য সৰ্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূৎ”—ওই অধ্যাত্মবিদ্যার দরুনই সৰ্বত্র ক্ষত্রিয়দের শাসনক্ষমতা ছিলো। ক্ষত্রিয় বলতে সে কালের শাসক-শ্রেণী এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই। প্রশাসন বলতে যে রাজ্য শাসনই বোঝাচ্ছে এ-কথা ডয়সন স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণ করেছেন। ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর সম্পর্ক শাসক-শ্রেণীরই সাহিত্যে আর কোথাও এমন স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা।

ভেবে দেখা দরকার বিশেষ করে একটি বিষয়ের কথা: অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শাসনক্ষমতার সম্পর্কটা শাসক-শ্রেণীর সাহিত্যে উলটো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা? অর্থাৎ, প্রশ্ন হলো, অধ্যাত্মবাদের দরুনই শাসনক্ষমতা, না, শাসনক্ষমতার দরুনই অধ্যাত্মবাদ? এ-বিষয়ে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা যাই হোক না কেন, অন্তত উপনিষদে যেটুকু কথা লেখা রয়েছে সেটুকুকেও কেউই উড়িয়ে দিতে পারবে না: অধ্যাত্মবাদ শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শাসনের হাতিয়ারও।

২৫. S. Radhakrishnan HPEW 1:21.

২৬. মৈত্রী উপনিষদ ৭.৮.৯।

২৭. বিষ্ণুপুরাণ ৩.১৮।

২৮. মনু ৪.৩০।

২৯. মনু ২.১১ ইত্যাদি।

অধ্যাত্মবাদের উৎস

অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উৎস কেন শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীর মানুষের চেতনায়?—এ-প্রশ্ন পরে তোলা যাবে। আপাতত তার চেয়েও জরুরী প্রশ্ন হলো, বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে জনসাধারণের নাড়ির যোগটা নিয়ে। এই যোগাযোগ সম্ভব হলো কেমন করে?

ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র থেকেই এ-প্রশ্নের একটা ভারি আশ্চর্য জবাব পাওয়া যাচ্ছে। খুব মোটা ভাষায় বললে বলা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায় নি, তাই।

কিন্তু খেটে খাবার প্রশ্ন উঠছে কেন? দার্শনিক আলোচনার আসরে এ-ধরনের প্রসঙ্গ খুবই স্থূল আর খাপছাড়া শোনায় না কি?

তবু উপায় নেই। লোকায়ত দর্শনের ধ্বংসস্তুপ থেকে যে-দু'চারটে ভাঙা-চোরা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তার থেকেই ও-দর্শনের আসল রূপটিকে চেনবার চেষ্টা করতে হবে। আর এই সব চিহ্নের মধ্যে একটি চিহ্ন সত্যিই ওই খেটে খাবার প্রসঙ্গই তুলছে।

চিহ্নটা কী রকম?

বাইস্পত্যসূত্রম(৩০), প্রবোধচন্দ্রোদয়(৩১) ইত্যাদি পুরোনো কালের একাধিক পুঁথিপত্রে লেখা আছে, লোকায়ত মত অনুসারে বার্তাই হলো একমাত্র বিদ্যা। (অবশ্যই, শুধু বার্তার কথাই নয়, তার সঙ্গে দণ্ডনীতিও।) লোকায়ত দর্শনের রহস্য উদঘাটন করবার ব্যাপারে এই সূক্ষ্ম সূত্রটি যে কতো জরুরী সে-কথায় আমরা বারবার ফিরতে বাধ্য হবো। আপাতত দেখা যাক, এই কথাটি থেকেই খেটে খাবার প্রসঙ্গ কেন উঠতে বাধ্য।

বার্তা মানে কী? কৌটিল্য(৩২) বলছেন, বার্তা মানে হলো কৃষি, পশুপালন আর বাণিজ্য। অবশ্যই, বাণিজ্য বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি কৌটিল্যের

যুগেও,-অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট জন্মবার প্রায় সোয়া তিন শ' বছর আগেও,-তাই বোঝাতো কিনা খুবই সন্দেহের কথা। কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো তর্ক উঠবে না যে বার্তা শব্দের মুখ্য অর্থ হলো চাষবাস।

তাহলে, লোকায়তিকদের কাছে চাষবাসের কথাটাই ছিলো সবচেয়ে জরুরী।

এই মনোভাবটির সঙ্গে দেশের শাসকশ্রেণীর মনোভাবটির যে কতোখানি তফাত তা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। মনু(৩৩) বলছেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিকাজ নিষিদ্ধ। একবার নয় আধবার নয়, বারবার বলছেন। আর শুধু মনুর আইনই নয়, পুরোনো কালের অন্যান্য আইনের বইতেও(৩৪) সরাসরি লেখা আছে যে বেদজ্ঞানের সঙ্গে কৃষিকর্মের সঙ্গতি নেই।

শ্রম বা কর্মজীবন সম্বন্ধে শাসক-সমাজের মনোভাবটা এই জাতীয় আইন-কানুন থেকেই আন্দাজ করা যাবে। এবং এইখান থেকে মূলসূত্র পেয়েই আরো একটি কথা বুঝতে পারা যাবে: ওই শাসক সমাজের দার্শনিক চেতনা যখন চূড়ান্ত ভাববাদের রূপ পেলো তখন কেন ঘোষিত হলো যে, যে-কোনো রকম কর্মই প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞানের পক্ষে অন্তরায় মাত্র(৩৫)।

৩০. S. N. Dasgupta HIP 3.532.

৩১. Ibid.

৩২. অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ১:৬।

৩৩. মনু ১০.১১৬।। cf. SBE 25:86, 106sq., 420sq., 420n.

৩৪. SBE 14:176

৩৫. শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র: ১.১.১।

ওরা কাজ করে

জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিলো। তার বিস্তারিত দলিলপত্র সংগ্রহ করা কঠিন নয়। সাধারণভাবে, দর্শনের একটি মূল সমস্যাতে বোঝবার জন্যে এই দলিলগুলি মহামূল্যবান। দর্শনের ওই মূল সমস্যাটি হলো বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সমস্যা: চেতনা আগে না বস্তুজগৎ আগে, চেতনা প্রাথমিক না বস্তু প্রাথমিক? আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় সমস্যাটা অনেক সময় চেতনাকারণবাদ-বনাম-অচেতনাকারণবাদ হিসাবে দেখা দিয়েছে: চেতনপদার্থকেই বা চেতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলবো, না, অচেতন পদার্থকেই পরম সত্য বলা হবে?

আমাদের দেশের দার্শনিক দলিলগুলিকে বিচার করলে দেখা যায়, চিন্তানায়কদের সঙ্গে স্বাভাবিক কর্মজীবনের যোগসূত্র যতোই বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততোই তাদের চেতনা থেকে বিপুল হয়েছে বহির্বাস্তবের অমোঘ যথার্থের কথা। অর্থাৎ কিনা, কর্মকে নীচবৃত্তি মনে করতে পারবার দরুনই মানুষ ভাববাদের দিকে অগ্রসর হতে পেরেছে। কিন্তু সব মানুষই তো আর কর্মকে খাটো করতে পারে না। তাহলে যে সমাজ টিকবে না, পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে যাবে। অন্ন-উৎপাদনের দায়িত্বটা অন্তত একদল মানুষকে গ্রহণ করতেই হবে। বস্তুত, যতোক্ষণ না একদল মানুষ ওইভাবে অন্ন উৎপাদনের দায়িত্বটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে ততোক্ষণ পর্যন্ত আর একদলের পক্ষে এ-কাজকে হীন, অধমের লক্ষণ বলে মনে করা সম্ভবই নয়। তাই কর্মকে শুধু সেই শ্রেণীর মানুষই খাটো করতে পারে যে-শ্রেণী কিনা কর্মের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী দর্শনে সমাজের সব-শ্রেণীর মানুষের চেতনাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বদলে পাওয়া যায় শুধু মাত্র সেই

শ্রেণীর চেতনা যে শ্রেণী কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ না করেও অপরের কর্মফলটুকু উপভোগ করবার অধিকার পেয়েছিলো।

এই তত্ত্বটিকে বোঝবার জন্যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে দলিলপত্র এতো রয়েছে যে অন্য কোনো দেশে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়। তার কারণ, আমাদের দেশে সমাজ-ইতিহাসের ওই পর্যায়ের বিকাশ—যে-পর্যায়ে ধীরে ধীরে পরান্নজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি—খুবই দীর্ঘদিনস্থায়ী হয়েছিলো। ফলে অজস্র রচনায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য কোনো দেশে এমনটা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা। আর সেই কারণেই দলিলগুলি সত্যিই মহামূল্যবান। কেননা, ভারতীয় ইতিহাসে যে-কথা স্পষ্ট ও প্রকট ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারই সাহায্যে অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যে-কথা অস্পষ্ট আর আবছা হয়ে গিয়েছে তা বুঝতে পারবার সুযোগ হতে পারে।

ভাববাদের উৎস নিয়ে আলোচনা তুলতে হবে। কিন্তু আমাদের যুক্তির এই অবস্থায় যেটুকু কথা একান্ত প্রাসঙ্গিক সেটুকু হলো, জনসাধারণের দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শন এই দুটি কথা আমাদের দেশে কেন দুটো আলাদা নাম পায় নি।

যারা মাটি কামড়ে পড়ে ছিলো মাটির পৃথিবীটাকেই তারা সত্যি বলে মেনেছে। লোকায়তিকদের কাছে বার্ভা বা চাষবাসের চেয়ে বড়ো বিদ্যা আর কিছুই ছিলো না। আর তাই জন্যেই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই সবচেয়ে বড়ো সত্যি।

তাই বলেছিলাম, খুব মোটা কথায় বললে বলা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায় নি। আর তাই জন্যেই তারা বস্তুবাদী দর্শনকে অমনভাবে আপন করে নিয়েছিলো।

সত্যিই কী আশ্চর্য ওই ‘লোকায়ত’ নামটি! এই নামের মধ্যেই খেটে খাওয়ার ইঙ্গিতটুকুও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, নামটার মূলে রয়েছে

দুটি শব্দ: লোক + আয়ত। তার মধ্যে আয়ত কথাটা কী করে পাওয়া সম্ভব তাই ভাবতে ভাবতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত(৩৬) বলছেন ‘আ+যৎ+অ’ করে কথাটা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। এখন ‘আ’ উপসর্গের অর্থ হলো ‘সম্যক ভাবে’। আর ‘যৎ’ ধাতুর মানে হলো চেষ্টা করা, উদ্যম করা, কাজ করা। তাই আয়ত বলতে ‘সম্যকভাবে চেষ্টা করবার’ অর্থও বোঝাতে পারে বই কি। এই তো গেলো ‘আয়ত’ শব্দের মানে। আর ওই ‘লোক’ বলে কথাটার মানে কী? এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌(৩৭) বলছেন, ‘লোক’ কথাটির সঙ্গে লাতিন শব্দ locus এবং লিথুনিয়ান laukas শব্দের তুলনা করা যায়। লিথুনিয়ান শব্দটির মানে, চাষের জমিই। আর লাতিন শব্দটির মানে, a clearing of forest—চাষের জন্য জঙ্গল-সারফ-করা জায়গা। সংস্কৃততেও ‘লোক’ শব্দের আদি ও অকৃত্রিম অর্থের সঙ্গে যে চাষের-জমির সম্পর্ক ছিলো না, এমন কথাও খুব জোর করে বলা যায় না। কেননা মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌-ই বলছেন, শুরুতে লোক শব্দের আগে একটা উ থাকতো—উলোক। এই উলোক=উরুলোক। এবং তার মানেই হলো জমি, মাঠ ইত্যাদি।

তাই লোকায়ত মানেও যা, বার্তাকেই একমাত্র বিদ্যা মনে করাও তাই। একই কথা। কৃষকদের কথা।

ওরা কাজ করে। ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়। তাই ওদের চেতনার নাম হলো লোকায়ত।

লোকায়ত-দর্শন আজো বিলুপ্ত হয় নি

বিপক্ষের লেখায় ঘৃণা আর বিদ্রূপের খোরাক যোগাবার মতো দু'চারটে টুকরো কথা বাকি রেখে এই বার্তা-বাদী সম্প্রদায়টির সমস্ত পুঁথি দেশ থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু ওই বার্তা-নিয়ত মানুষগুলি? তারা তো আর সত্যিই সেই সঙ্গে দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। তাই লোকায়তিক পুঁথিপত্র দেশ থেকে বিলুপ্ত হলেও লোকায়তিক চেতনাটি বিলুপ্ত হবার কথা নয়।

আর সত্যিই তা হয় নি।

এই সত্যটি আবিষ্কার করলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর আবিষ্কার সাম্প্রতিক ভারততত্ত্বে এক প্রকাণ্ড বিস্ময়।

তিনি,—এবং বোধহয় তাঁর মতো বড়ো ভারততাত্ত্বিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম,—অনুভব করলেন যে শুধুমাত্র লিখিত দলিলের রাজ্যে বাস করে দেশের চিন্তাধারার পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়। তাছাড়াও তিনি বুঝেছিলেন যে, যে-মুষ্টিমেয় মানুষ সমাজের সদর-মহলকে আলো করে রেখেছেন,—যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা গুণী, যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা বিদগ্ধ,—শুধুমাত্র তাঁদের ধ্যানধারণার খবর পেলেই দেশের ধ্যানধারণাগুলিকে পুরোপুরি জানা সম্ভব হবে না। কেননা, দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে এবং সমাজের নিচের তলায় মানুষদের মধ্যে আজো বেঁচে রয়েছে এমন সব ধ্যানধারণা যার সঙ্গে উপরতলার আভিজাতিক ধ্যানধারণাগুলির মিল হয় না। এবং মহামহোপাধ্যায়ের পক্ষে যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার সেটা হলো, দেশের ওই পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে, ওই ছোটো জাতের মানুষদের মনে, যে-চেতনা আজো সত্যিই বেঁচে রয়েছে তা আসলে লোকায়তিক চেতনাই। মহামহোপাধ্যায় লিখছেন:

The influence the Lokayatikas and of the Kapalikas is still strong in India. There is a sect, and a large one too, the followers of which believe that deha or the material human body is all that should be care for; their religious practices are concerned with the union of men and women and their success (siddhi) varies according to the duration of the union. These call themselves Vaisnavas, but they do not believe in Vishnu or Krishna or his incarnations. They believe in deha. They have another name, Sahajia, which is the name of a sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last four centuries of their existence in India.(৩৮)

অর্থাৎ, ভারতবর্ষে আজো লোকায়তিক আর কাপালিকদের প্রভাব খুব প্রবল। আজো এমন অনেক সম্প্রদায় টেকে রয়েছে যার অনুগামীরা মনে করে দেহই হলো একমাত্র সত্য; তাদের ধর্মে স্ত্রী-পুরুষের মিলনই একমাত্র অনুষ্ঠান এবং তাদের মতে সিদ্ধি নির্ভর করছে এই মিলনের দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর। তারা নিজেদের বৈষ্ণব বলে; কিন্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বা তাঁর কোনো অবতার তারা মানে না। তারা বিশ্বাস করে শুধু দেহতে। তাদের আর একটা নাম হলো সহজিয়া, ভারতবর্ষে শেষ চার শতাব্দী ধরে মহাযান বৌদ্ধদের যে-অস্তিত্ব ছিলো তার থেকেই এ-নামের সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিলো।

মহামহোপাধ্যায়ের-এর এই শেষ মন্তব্যটি স্পষ্টভাবে বোঝা গেলো না। তিনি বলছেন, লোকায়ত মত-ই আজো নানান নামের অন্তরালে, নানান সম্প্রদায় হিসাবে, আমাদের দেশে টেকে রয়েছে। তার মধ্যে একটির নাম হলো সহজিয়া। আবার, সেই সঙ্গেই তিনি বলছেন, এই সহজিয়া নামটিই মহাযান বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায়ের নাম। এ-কথা কেমনভাবে সম্ভব হতে পারে? কিংবা, যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে বৌদ্ধদের সঙ্গে লোকায়তিকদের সম্পর্কটা ঠিক কী রকম? মহামহোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে এই জাতীয় নানান প্রশ্ন ওঠে।

কিন্তু এ-সব প্রশ্নের চেয়ে ঢের আকস্মিক মনে হবে ওই ভাবে একনিশ্বেসে লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে কাপালিকদের নাম উল্লেখ করা। শুধু তাই নয়, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, লোকায়তিক সম্প্রদায়গুলি যে-ভাবে আজো আমাদের দেশে টেকে আছে, তারা শুধুই যে দেহতত্ত্বে আস্ত্রাবান তাই নয়, তাদের আর একটি পরিচয় হলো কামসাধনা: স্ত্রী-পুরুষে মিলন!

তার মানে, খুব ব্যাপকভাবে আমরা যে-মতবাদগুলিকে বলি তান্ত্রিক মতবাদ। বামাচার।

কিন্তু বস্তুবাদের সঙ্গে এই বামাচারের সম্পর্ক কী? এ-প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কেননা, মহামহোপাধ্যায় যে ওইভাবে বামাচারী কাপালিকদের সঙ্গে লোকায়তিকদের এক করে দিচ্ছেন তার পেছনে রয়েছে পুরোনো পুঁথির নজির। পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে, লোকায়ত আর কাপালিক একই।(৩৯) এ-নজিরকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩৭. M. Monier-Williams SED 906.

৩৮. H. P. Shastri L 6.

৩৯. Ibid.

বামাচার-এর তাৎপর্য

তাহলে লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে হলে নানান রকমের প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। প্রথমত, বিপক্ষের লেখায় লোকায়তিকদের সম্বন্ধে যে সব ছোটো ছোটো বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র সেগুলি থেকেই লোকায়ত দর্শনের বিলুপ্ত রূপটিকে খুঁজে পাবার আশা নেই। পুঁথিত গণ্ডি পেরিয়ে দেশের মানুষদের দিকেও চেয়ে দেখতে হবে—বিশেষ করে সেই সব মানুষদের, যারা চাষ করে। কেননা, তাদের মধ্যে লোকায়ত দর্শন আজো বেঁচে রয়েছে,— যদিও সমাজের সদরমহলের বিদগ্ধ পুঁথিপত্রের আসরে কোনো এককালে তার যে-স্থান ছিলো সে-স্থান আজ আর নেই!

এইভাবে লোকায়ত-দর্শনের উৎস সন্ধানে বেরুলে দেখা যায় বামাচারী মতামত ও আচার-আচরণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আর ঠিক এইখানটিতে এসেই যেন ঠেকে যেতে হয়। কেননা, আমাদের আজকালকার শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিবোধের কাছে ওই সব মতবাদ ও আচরণের মতো কদর্য ও বিকৃত ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না!

তাহলে উপায়? আমাদের আধুনিক রুচিবোধের খাতিরে লোকায়তের উৎস অনুসন্ধানটাকে কি ছেড়ে দিতে হবে?

অবশ্য, আর একটা সম্ভাবনাও বাকি থাকে। এমন তো হতেই পারে যে আমাদের রুচিবোধ, নীতিবোধ নেহাতই একালের ব্যাপার। অর্থাৎ কিনা, সমাজ-বিকাশের উন্নততর পর্যায়ের অবদান। অপরপক্ষে, বামাচারী মতাদর্শ সেকালের ব্যাপার। যদিও আজকের দিনেও তা টেকে রয়েছে তবুও তা অনেকাংশেই আজকের পৃথিবীরই আনাচে-কানাচে আদিম মানুষদের পক্ষে টেকে থাকবার মতোই। তার মানে এ-ধরনের ধ্যানধারণার উৎস সমাজ-বিকাশের অনেক পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের মধ্যে। একালের রুচিবোধ ও নীতিবোধকে সেকালের

পক্ষেও সত্য বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। আর যদি তাই হয় তাহলে এমনটা হওয়া সত্যিই অসম্ভব নয় যে, যে-উদ্দেশ্য থেকে সমাজের ওই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে বামাচারী ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিল তা বুঝতে পারা যাবে না শুধুমাত্র আধুনিক কালের লাম্পট্য-ব্যবহারকে মনে রাখলে।

কিন্তু এই বামাচারী ধ্যানধারণাগুলির উৎস সন্ধান করা যাবে কী ভাবে? কোন সূত্রে এগিয়ে?

সিদ্ধিদাতার অনুসরণে

খবর পাওয়া গেলো, তান্ত্রিক সাহিত্যের আসর জমিয়ে রয়েছেন খোদ গণেশ বা গণপতি। তন্ত্ররাজ্যে তাঁর এমনই খ্যাতি যে অষ্টশতনামের মহিমা না জুটলেও অন্তত পঞ্চাশটি(৪০) চিত্তাকর্ষক নাম তাঁর ঠিকই জুটেছিলো।

তাই আশা হলো, সিদ্ধিদাতার শরণাপন্ন অলে হয়তো তন্ত্র-রহস্যও বুঝতে পারা অসম্ভব হবে না।

আর সত্যিই যেন সিদ্ধিদাতা! আপনি যদি গণপতির পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে থাকেন তাহলে সেকালের ভারতবর্ষের কতো অপরূপ দৃশ্যই না দেখতে পাবেন—দেখতে পাবেন কতো সব আশ্চর্য মানুষ, কতোই না তাদের আশ্চর্য বিশ্বাস!

এমনকি, ভারতীয়-দর্শনের অনেক জটিল রহস্যের কিনারা পাবার চেষ্টাকে এই গণপতিই হয়তো শেষ পর্যন্ত সফল করতে পারেন।

শুধুমাত্র সংকীর্ণ অর্থে লোকায়তিক বা চার্বাক দর্শনের সমস্যার কথাই বলছি না। বামাচারী ধ্যানধারণার উৎস নিয়ে সমস্যাটুকুও নয়। সিদ্ধিদাতার শরণাপন্ন হলে ভারতীয় দর্শনের আরো অনেক জটিল প্রশ্নের কিনারা হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বিশেষ করে দুটি বিষয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

প্রথমত, লোকায়তিকদের সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত, লোকায়তের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক।

বিষয় দুটি কেন অতো বিস্ময়কর মনে হয়েছে এখানে তার সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

৪০. বিশ্বকোষ ৫: ২০২।

লোকায়ত ও সাংখ্য

এক: সাংখ্য। সাংখ্য-দর্শনের মূল কথাগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কতোখানি প্রভাবিত করেছে সে-কথা ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু এর জন্মবৃত্তান্ত আজো অস্পষ্ট-বেলভেলকার(৪১), রানাডে(৪২), জনস্টন(৪৩) প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতেরা সে-বৃত্তান্তের সন্ধানে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কী রকম যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন,-খুব জোর গলায় কোনো কথা বলতে পারছেন না। তার প্রধান কারণ হলো, এ-বিষয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্রের কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশকে এঁরা সকলেই অগ্রাহ্য করছেন। একটি নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে, জৈনদের লেখা থেকে। সূত্র-কৃতঙ্গ-সূত্র(৪৪) নামের জৈন পুঁথিতে লোকায়ত নাস্তিকদের ঠিক পরেই সাংখ্য মতের আলোচনা তোলা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গেই ভাষ্যকার শীলাঙ্ক(৪৫) বলছেন, লোকায়ত ও সাংখ্যের মধ্যে খুব কিছু তফাত নেই।

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কেননা এই নিরীশ্বর প্রধানকারণবাদের সঙ্গে পরের যুগে ঈশ্বরতত্ত্ব জুড়ে দিয়ে একে যতোই আস্তিক সাজাবার চেষ্টা করা হোক না কেন, আদি অকৃত্রিম অবস্থায় এর সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক যে ছিলোই না এ-কথা আশা করি ভারতীয় দর্শনের ছাত্রমাত্রেই স্বীকার করবেন। মূল সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তিকদের ঘনিষ্ঠতার কথা পুরোনো কালেরই আরো কিছু কিছু বইতে স্পষ্টভাবে রয়েছে। সেগুলির আলোচনা পরে তোলা হবে।

আপাতত যে-কথা হচ্ছিলো: সিদ্ধিদাতা গণেশই আমাদের মনে করিয়ে দেন, আজ আমরা ব্যাপক অর্থে যে-সব ধ্যানধারণাকে বামাচারী বলে উল্লেখ করে থাকি তার সঙ্গে মৌলিক সাংখ্যের সম্পর্ক ছিলো কি না তা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমে দেখা যাক, তান্ত্রিক শক্তিবাদের সঙ্গে সিদ্ধিদাতার সম্পর্কটা কী রকম?

গোপীনাথ রাও-এর(৪৬) ‘এলিমেন্টস্ অব হিন্দু আইকনোগ্রাফি’ -র পাতা ওলটালেই চোখে পড়বে ভারতবর্ষের কতো জায়গায় কতো দেবালয়ে আজো গণেশকে দেখতে পাওয়া যায় এক নগ্ন নারীমূর্তির সঙ্গে মৈথুনরত অবস্থায়। এই মূর্তিগুলির নাম শক্তি-গণপতি। অবশ্যই আজকের দিনে আমি-আপনি গণেশকে ওই অবস্থায় দেখে চোখ নামিয়ে নেবো, কিন্তু যাঁরা ওই মূর্তি রচনা করেছিলেন তাঁদের মনে আধুনিক যুগের, আধুনিক সমাজের, রুচিবোধ বা নীতিবোধ নিশ্চয়ই ছিলো না। কেননা তাহলে তাঁরা এ-জাতীয় মূর্তিকে অন্তত দেবালয়ে স্থান দিতে পারতেন না। তাই প্রাচীন কালের,-অর্থাৎ কিনা, সমাজবিকাশের অতি প্রাচীন স্তরের-ধ্যানধারণাগুলিকে বুঝতে হলে এই শক্তি-গণপতির সাক্ষ্যকেও তো সত্যিই উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শক্তিকে ওইভাবে আঁকড়ে ধরে গণপতি যেন বলছেন: এই হলো সৃষ্টির মূলতত্ত্ব,-সৃষ্টিরহস্য যদি জানতে চাও তাহলে এই শক্তিকে চেনো।

সৃষ্টির মূলে শক্তি। নারী। প্রকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই শক্তির সঙ্গে সাংখ্যের প্রকৃতির কি কোনো মিল নেই? আপনি বলবেন, সাংখ্যের প্রকৃতি নেহাতই অমূর্ত দার্শনিক ধারণামাত্র, আমাদের দেশের মানুষ তাকে কখনোই তান্ত্রিক শক্তির মতো মূর্ত নারীমূর্তি হিসাবে কল্পনা করে নি।

কিন্তু আজকের দিনে এ-কথাও আপনি খুব জোর গলায় বলতে পারবেন না। কেননা, সিন্ধু আর ইরাবতীর কিনারা থেকে হাজার কয়েক বছরের পুরোনো ধুলো সরিয়ে সম্প্রতি নানারকম নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এবং অন্তত স্যর জন মার্সাল(৪৭) তো দাবি করছেন, এগুলিকে প্রকৃতিমূর্তি বলেই সনাক্ত করতে হবে। তছাড়া মনে রাখবেন, ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্বমূলক কাজ যতোখানি হওয়া দরকার তার তুলনায় কিছুই যেন হয় নি। তাই কোনখানে মাটির তলায় যে কোন ধরনের

সাক্ষী গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে তার হৃদিস সত্যি আমরা জানি না। দেশে যে ঠিক কী নেই এ-কথা বলবার আগে কিছুটা হুঁশিয়ার হওয়ার দরকার।

৪১-৪৩. আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের ‘সাংখ্য দর্শনের উৎস’ অধ্যায়ে এই মতগুলির উল্লেখ করেছি

৪৪. S. N. Dasgupta op. cit. 3:527.

৪৫. Ibid

৪৬. T. A. G. Rao EHI Vol. I. Part I.

৪৭. J. Marshall MIC 1:51.

লোকায়ত ও বৈদিক ঐতিহ্য

দুই: লোকায়তিক চেতনার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক। সিদ্ধিদাতাকে অনুসরণ করতে করতেই এ-বিষয়ে যে-তথ্য পাওয়া যায় তা সত্যিই পরমাশ্চর্য। কথাটা একটু খুলেই বলি।

বৈদিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। উত্তর যুগে যাঁরা এ-ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা লোকায়তিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ঘৃণায়-বিদ্বেষে মুখর। এবং লোকায়তিকদের পক্ষ থেকেও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে বিদ্রূপ তাও কম তীক্ষ্ণ নয়। উত্তরকালের এই পরিস্থিতি দেখে মনে হয় লোকায়তের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্কই নেই। কিংবা যা একই কথা, সম্পর্ক নেহাতই অহিনকুলের মতো।

কিন্তু সিদ্ধিদাতার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে এগোতে দেখা গেলো, উত্তরকালের এই পরিস্থিতিটি সনাতন নয়,—নিছক উত্তরকালেরই ব্যাপার। তার মানে, সুদূর অতীতে লোকায়তিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধ ছিলো কিনা তা একান্তই সন্দেহের কথা। কেননা, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই লোকায়তিক ধ্যানধারণার রাশিরাশি চিহ্ন থেকে গিয়েছে। তার মানে, বৈদিক চিন্তাধারারও একটা ইতিহাস আছে। এবং সে-ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় উত্তর যুগে এ-ঐতিহ্যের বাহকেরা যে-সব ধ্যানধারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, আদিকালে তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা ওই সব ধ্যানধারণাকেই সত্য বলে মনে করেছেন!

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ নামের যে সাহিত্যরাশি তা রাতারাতি রচিত হয় নি, অনেক যুগ সময় লেগেছিলো,—ঠিক যে কতো শতাব্দী তার নিখুঁত হিসেব দেবার মতো ঐতিহাসিক গবেষণা এখনো বাকি আছে। কিন্তু সন-তারিখের হিসাব নিয়ে সুনিশ্চিত হতে না পারলেও অন্তত এটুকু কথা জোর গলায় বলবার মতো

দলিল রয়েছে যে ওই কয়েক শতাব্দী ধরে বৈদিক মানুষেরা একই রকমের সমাজ-ব্যবস্থায় বাস করেন নি। তাঁদের সমাজজীবনে অনেক অদলবদল হয়েছে এবং সেই অদলবদলের পরিণাম হিসাবেই তাঁদের ধ্যানধারণাতেও অনেক রকম মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, এইভাবে বদলাতে বদলাতে বৈদিক ঐতিহ্য শেষ পর্যন্ত উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের রূপ পেলো, এবং তারো অনেক পরের যুগে শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকেরা নিজেদের চূড়ান্ত ভাববাদী দর্শনকে পেশ করবার সময় প্রচার করবার প্রাণপাত চেষ্টা করলেন যে তাঁদের ভাববাদটা নিষক ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক চিন্তাই। বেদের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই উপনিষদের আর একটি নাম বেদান্ত। এবং, শঙ্কর প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা সাধারণভাবে দেশে এই ধারণাই সৃষ্টি করেছে যে বৈদিক সাহিত্যের আগাগোড়াই বুঝি ওই রকমের নিটোল অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ।

সিদ্ধিদাতা কিন্তু এই ধারণাটিকে সন্দেহ করতে শেখান। কেননা গণপতিকে দেখতে পাবেন খোদ সংহিতাসাহিত্যের মধ্যেই। ঋগ্বেদ(৪৮)-এ পাবেন। যজুর্বেদ(৪৯)-এ পাবেন। এবং, যেটা আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, ঋগ্বেদ(৫০)-এ দেখবেন স্বয়ং বৃহস্পতির সঙ্গে গণপতির কোনো তফাত নেই। কথাটা জরুরী। কেননা, লোকায়ত দর্শনের আদিগুরু বলে যাঁর খ্যাতি তাঁর নামও বৃহস্পতিই।

আপত্তি উঠবে, নামে কী এসে যায়? ঋগ্বেদের ওই বৃহস্পতির সঙ্গে লোকায়ত-দর্শনের সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা খুবই সন্দেহের কথা। অন্তত কোনো রকম বাস্তব সম্পর্ক আজো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয় নি।

তা অবশ্য হয় নি। কিন্তু এতোদিন ধরে দেশে যে-ঐতিহ্যটা চলে আসছে তাকেও এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না!

তাছাড়া, কথা হলো বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়তিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক শুধুমাত্র ওই নামটিকে আশ্রয় করেই নেই। বস্তুবাদী চেতনার,—এমনকি ওই বামাচারী চেতনারও,—অজস্র স্মারক বৈদিক সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। এতো অজস্র যে সেগুলিকে খুঁজে পাবার জন্যে খুব বড়োসড়ো বেদজ্ঞ পণ্ডিত হবারও প্রয়োজন নেই। এই বই-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এ-ধরনের কিছু কিছু চিহ্ন বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি।

৪৮. ঋগ্বেদ ২.২৩.১।

৪৯. বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩.১৯।

৫০. ঋগ্বেদ ২.২৩.১ cf. R. G. Bhandarkar VS 147ff.

ভাষাজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্র

অথচ, আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে, দেশবিদেশের এতো বড়ো বড়ো সংস্কৃতজ্ঞরা বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে অমন নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এই জাতীয় চিহ্নগুলিত তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনাই তোলেন নি। অনুমানে মনে হয়, তার আসল কারণ হলো তাঁরা একালের ধ্যানধারণাকেই একমাত্র সম্বল করে বৈদিক-সাহিত্য পাঠ করেছেন। ফলে, স্মারকগুলির-বিশেষ করে বামাচারের স্মারকগুলি,-কোনো রকম তাৎপর্য নির্ণয় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি: অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বৈদিক সাহিত্যের শুধু শব্দ-রাশিই গ্রহণ করেছেন। কেননা, বৈদিক সাহিত্য আর যাই হোক একালের ব্যাপার নয়। তাই শুধুমাত্র একালের ধ্যানধারণার সাহায্য নিলেই বৈদিক শব্দরাশি সম্বন্ধে হাজার স্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বৈদিক চিন্তাজগতের পুরো খবরটা পাওয়া সম্ভব হবে না। আর্থার এ্যাভেলন, ওরফে স্যর জন উড্রফ্(৫১), তন্ত্র-প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, শুধুমাত্র ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্র বুঝতে পারা যাবে না, ভাষাজ্ঞান ছাড়াও আরো কিছুর দরকার আছে:

...more is required for the understanding of a Hindu Shastra than linguistic talent, however great.

বলাই বাহুল্য ভাষাজ্ঞানকে কোনো ভাবে ছোটো করবার চেষ্টায় তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করছি না। বস্তুত, ভারতীয় পুঁথিপত্র বোঝবার ব্যাপার দেশ-বিদেশের দিকপাল বিদ্বানেরা গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অসামান্য পরিশ্রম এবং অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করতে না পারলে আজ আমরা অনেকাংশেই অন্ধ হয়ে থাকতাম। কিন্তু প্রাচীনেরাই বলেছেন, বেদবেদান্তের

প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার পথে শব্দার্থরাশি-গ্রহণ প্রথম সোপান হলেও সব নয়(৫২), তারপর আরো কিছুর দরকার পড়ে।

বৈদিক সাহিত্য বিচারে এ-কথা যে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা প্রতিপদেই দেখতে পাবো। আর সেই সঙ্গে দেখতে পাবো, ঠিক কোন অর্থে কথাটা সত্যি। কেননা, প্রাচীনেরা যে-অর্থে কথাটা বলতেন তা ঠিক নয়।

এখানে অবশ্যই সব কথা আলোচনা করা যাবে না: বাক্যজন্য-জ্ঞান ছাড়াও প্রাচীন পুঁথিপত্রকে বোঝবার জন্যে আরো কী প্রয়োজন, শুধুমাত্র তার ইঙ্গিতটুকু দেওয়া যায়।

কিসের প্রয়োজন? একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির। তাই সমস্যা হলো, কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে?

সমস্যাটা যদি কেবল আমাদের দেশের পুরানো পুঁথিপত্রের তাৎপর্য খোঁজবার সমস্যা হতো তাহলে না হয় অন্য কথা ছিলো। কিন্তু তা নয়। যে-কোনো দেশেরই পুরোনো কালের পুঁথিপত্র বোঝবার ব্যাপারে সমস্যা ওঠে, এবং মানবজাতির অভিজ্ঞতা যেহেতু সবদেশেই মোটের উপর এক ধরনের সেইহেতু সব দেশের বেলাতেই এ-সমস্যা মোটামুটি একই।

সমস্যাটা মোটের উপর সমান বলে এমন তো হতেই পারে যে আমাদের দেশের পুরোনো পুঁথিপত্র নিয়ে আলোচনা খুবই জরুরী হবে। কেননা যদি কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে অন্য কোনো দেশের পুরোনো দলিল নিয়ে আলোচনা সার্থক হয়ে থাকে তাহলে সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করেই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার অনেক দুর্বোধ্য বিষয় আমরা হয়তো বুঝতে পারবো।

আর এইদিক থেকেই আমার সবচেয়ে বড়ো ঋণ অধ্যাপক জর্জ টম্ সনের কাছে। যদিও তিনি ভারততত্ত্ববিদ নন, সংস্কৃতজ্ঞ নন,-গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। বস্তুত আজকের পৃথিবীতে তাঁর মতো বড়ো গ্রীকতত্ত্ববিদ খুব কমই আছেন।

বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আমরা যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন গ্রীক সাহিত্যে নিয়েও মোটের উপর তার অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত কোন পদ্ধতির সাহায্যে তিনি এ-সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন তার আলোচনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই করেছি। কেননা, এই পদ্ধতির কথাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এবং আমার স্থির বিশ্বাস, একালের ওই গ্রীকতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতা থেকে ভারততত্ত্ববিদরাও যদি লাভবান হতে রাজী হন তাহলে ভারততত্ত্বের আলোচনাতেও যুগান্তর আসবে। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও আমি প্রাচীন পুঁথিপত্রের নানান রকম দুর্বোধ্য কথাবার্তার অর্থ নির্ণয়ে সাহসী হয়েছে তা প্রধানত এই পদ্ধতির সাহসেই।

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিলো: বৈদিক সাহিত্যে লোকায়তিক চেতনা এবং এমন কি বামাচারী ধ্যানধারণার স্মারক নিয়ে কথা। এ-ধরনের স্মারক যে অজস্র রয়েছে তার প্রমাণ হল বৈদিক সাহিত্যই, নমুনা দেখা যাবে পরের পরিচ্ছেদে। অথচ, উত্তরকালে আমাদের দেশে বৈদিক ও লোকায়তিক ঐতিহ্য এমনই বিরুদ্ধ হয়েছে যে খোদ বৈদিক সাহিত্যেই এ-জাতীয় স্মারক শব্দের মধ্যে ভূতের মতো মনে হতে পারে। এমন ব্যাপার কী করে সম্ভবপর হলো?

মানুষ আর মানুষের ধ্যানধারণা

আপনি যদি মানুষের কথা বাদ দিয়ে মানুষের ধ্যানধারণাগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করেন তাহলে এ-সমস্যার, এবং এই জাতীয় আরো অনেক সমস্যার, কোনোদিনই কোনো রকম কিনারা খুঁজে পাবেন না।

আপনি যদি মানুষের কথা মনে রেখে মানুষের ধ্যানধারণাগুলিকে বুঝতে রাজী হন তাহলে এ-সমস্যার, এবং এই রকম আরো অনেক সমস্যার, কিনারা খুঁজে পাবেন।

তাহলে শুরুতেই ঠিক করা দরকার, কোন পথে এগোবার চেষ্টা করবো।

আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই বলা হয়েছে, বেদ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ কিনা, কোনো মানুষের রচনা নয়। এই কথা যে ঠিক নয় আশা করি তা খুব বড়ো করে আলোচনা করবার দরকার নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই একমত হয়ে বলবেন, এটা নেহাতই সেকেলে কুসংস্কার। কেননা খ্রীষ্টান পৃথিবীতেও আজকাল যে-রকম মেরী মাতার বিশুদ্ধ গর্ভধারণের বিস্ময়কর কাহিনীতে বিশ্বাস ক্ষয়ে গিয়েছে হিন্দু পৃথিবীতেও সেই রকম বেদের অপৌরুষেত্বে বিশ্বাস শুলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওই একই কুসংস্কার কী ভাবে অন্য মূর্তিতে আজকের দিনেও অনেক বিদ্বানের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা ভালো করে দেখা দরকার।

কেউ কেউ মনে করেন, ধ্যানধারণার আলোচনায় শুধু মাত্র ধ্যানধারণার কথাটুকুই প্রাসঙ্গিক। তাই যাদের মাথায় এই ধ্যানধারণাগুলি এসেছিলো তারা কী খেতো, কী পরতো, কেমনভাবে বাঁচতো, অন্যান্য মানুষদের কোন চোখে দেখতে,—এই জাতীয় প্রশ্ন তোলা অবাস্তব। যাঁরা আজো এ-কথা বলেন তাঁরা আসলে ওই পুরোনো কুসংস্কারেরই এক আধুনিক সংস্করণে আস্থাবান। কেননা

ধ্যানধারণাগুলিকে এই চোখে দেখতে গেলে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হবে ওগুলি যেন স্বয়ম্ভু, নিরালম্ব-আকাশে ফোটা ফুলের মতো। কিন্তু আকাশকুসুমটা ঠাট্টার কথা, বাস্তবের বর্ণনা নয়। কেননা আকাশে সত্যিই ফুল ফোটে না। তেমনি, আসমান থেকে ধ্যানধারণার জন্ম হয় না, শুধুমাত্র মানুষের মাথাটেই ধ্যানধারণার বিকাশ হয়। এবং সেগুলির উৎসে রয়েছে মানুষের পারিপার্শ্বিক। ধ্যানধারণার আলোচনা তাই যাদের ধ্যানধারণা তাদের কথা এবং মূর্ত পারিপার্শ্বিকের কথা বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

ধ্যানধারণাগুলিকে খিলানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। খিলান শূন্যে ভর করে থাকতে পারে না, তার জন্যে ভিত্তিস্তম্ভ প্রয়োজন। এই ভিত্তিস্তম্ভ হলো মানুষের মূর্ত সমাজজীবন। ধ্যানধারণাকে এইভাবে বোঝবার চেষ্টার নাম দেওয়া হয় ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা(৫৩)। আজকের দিনে অবশ্য নানা কারণে এবং নানাভাবে এই ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়।

অথচ, এ-ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করাও যা বেদকে অপৌরুষেয় মনে করাও তাই। একই কুসংস্কার, শুধু রূপের তফাত-একটা সেকেলে, অপরটা একেলে। কিন্তু দু’ -এরই মূল কথাটা হলো মানুষকে বাদ দিয়েও মানুষের ধ্যানধারণাকে বোঝা সম্ভবপর-ধ্যানধারণাগুলো সেন স্বয়ম্ভু, গগনকুসুমের মতো।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সত্য বলে মেনে অগ্রসর না হলে ভারতীয় দর্শনের নানা দুর্বোধ্য সমস্যার কোনো কিনারা করার চেষ্টাই অসম্ভব। কেন? তা বলবার অবকাশ পাবো পুরো বইটি জুড়েই। আপাতত, বৈদিক সাহিত্যে লোকায়ত ও বামাচারী চিন্তাধারার বিস্ময়কর স্মারকগুলির প্রসঙ্গে কথাটা যতোটুকু ওঠে শুধু সেইটুকুর উল্লেখ করা যায়।

৫২. ব্রহ্মসূত্র ১.১.১।। “অথ” শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শঙ্কর রামানুজ প্রমুখের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৫৩. K. Marx and F. Engels GI ইত্যাদি।

ধর্মবিশ্বাসের আগে

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এই স্মারকগুলিকে যতো বিস্ময়করই মনে হোক না কেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় আস্থা নিয়ে অগ্রসর হলে আর তেমন বিস্ময়কর মনে হয় না। কেননা, ওই বৈদিক ধ্যানধারণার মতোই লোকায়তিক ও বামাচারী ধ্যানধারণাগুলি সত্যিই অপৌরুষেয় নয়—সমাজ-বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে মানুষের মাথায় এগুলি দেখা দিয়েছিলো। বামাচারের কথাই বিশেষ করে বলি। আধুনিক চোখে দেখলে মনে হয়, শুধুমাত্র বীভৎস কামবিকার। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার ঠিক কোন পর্যায়ে এগুলির উৎস তা যদি খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে আর এগুলিকে কামবিকার বা লাম্পট্য-ব্যবহার বলে মনে করবার কোনো অবকাশই থাকে না। কেননা, সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে বোঝা যায় এগুলি সেই সমাজের মানুষের কাছে শুধুই যে উদ্দেশ্যমূলক তাই নয়, বাঁচা-মরার সমস্যার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজ-বিকাশের সেই পর্যায় থেকে এগুলিকে উপড়ে যদি আজকের সমাজে, কিংবা সমাজ-বিকাশের কোনো পরবর্তী পর্যায়ের আবহাওয়ায়, নিয়ে আসবার চেষ্টা করা হয় তাহলে অবশ্যই ওই আদিম-গুরুত্বের দিকটা মরে যাবে, মুছে যাবে—যা ছিলো উদ্দেশ্যমূলক তাই হয়ে দাঁড়াবে উদ্দেশ্য-বিরোধী কামবিকার। অর্থাৎ কিনা ধ্যানধারণাগুলি বিপরীতে পরিণত হবে। যেমনটা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকাংশ লিখিত পুঁথিপত্রের বেলায়। কিন্তু ওই বামাচারী ধ্যানধারণাগুলির উৎস সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ে তা লেখার হরফ আবিষ্কার হবে আগেকার পর্যায়। তাই বামাচারকে বোঝবার জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের লিখিত পুঁথিপত্রগুলিকে একমাত্র সম্বল মনে করলে আধুনিক গবেষক ভুল করবেন।

আরো কথা আছে। সমাজ-বিকাশের সেই প্রাচীন পর্যায়টির কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে বোঝা যায়, সে-অবস্থায় মানুষের মাথায় ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারা জন্মাবার অবকাশই পায় নি। হয়তো, সেই স্তরের চিন্তাধারাকে কোনো রকম দার্শনিক সংজ্ঞা দিতে যাওয়া ভুল হবে। কেননা, এ-চেতনা বহুলাংশেই অস্ফুট ও অব্যক্ত। এই স্তরের চেতনায় বাস্তব প্রকৃতির বাস্তব নিয়মকানুন সম্বন্ধে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান নেহাতই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর; জ্ঞানের ওই দৈন্য সে-অবস্থায় মানুষের বাস্তব দৈন্যেরই অনুরূপ। সমান করুণ। তবুও, যেটা হলো আসলে জরুরী কথা, এ-অবস্থায় মানুষের চেতনায় ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার জন্মই সম্ভবপর হয় নি। মানুষ তখনো দেবতার পায়ে মাথা কুটতে শেখে নি, পরলোকতত্ত্বের আলেয়ায় ভুলে সংসারকে অসার মনে করবার অবকাশ পায় নি, অবসর পায় নি দুনিয়াটা মনগড়া কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার। তাই যতো মূক, যতো অস্পষ্ট, যতো অব্যক্তই হোক না কেন,—সমাজ-বিকাশের এই স্তরে মানুষের চেতনাটা লোকায়তিকই, দেহাত্মবাদীই।

কিন্তু, সমাজ-বিকাশের এ-রকম কোনো পর্যায়ের কথা কি সত্যিই বাস্তব? এ-রকম কোনো পর্যায়ের কথা কি সত্যিই জানা গিয়েছে?

গিয়েছে। কেননা, পুরো পৃথিবীর বুক জুড়ে সমস্ত মানুষই সমান তালে উন্নত হতে পারে নি। আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে নানা জায়গায় মানুষের দল আদিম দশাতেই পড়ে রয়েছে। এবং তাদের দিকে দেখলে বোঝা যায় তাদের মাথায় ঈশ্বরের ধারণা জন্মায় নি, তারা প্রার্থনা করতে শেখে নি,—এক কথায় তারা এখনো অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদী চিন্তাধারার পরিচয় পায় নি।

Religion is characterized by belief in God and the practice of prayer or sacrifice. The lowest savages known to us have no gods and know nothing of prayer or

sacrifice. Similarly whenever we can penetrate the prehistory of civilized peoples we reach a level at which again there are no gods and no prayer of sacrifice.(৫৪)

ধর্মের লক্ষণ হইলো ঈশ্বরের বিশ্বাস এবং উপাসনা ও বলিদান-মূলক ক্রিয়াকাণ্ড। যে-সব মানবদলকে সবচেয়ে আদিম অবস্থায় থাকতে দেখা গিয়েছে তাদের কোনো ঈশ্বর নেই এবং তারা প্রার্থনা বা বলিদানের কথা কিছুই জানে না। তেমনি, সভ্য মানুষদের প্রাক্-ইতিহাস পর্যন্ত যখনই পৌঁছোনো যায় তখন আমরা এমন করে স্তরে পৌঁছুই যেখানে ঈশ্বর নেই, উপাসনা নেই, বলিদান নেই।

ভারতীয় ধ্যানধারণার ইতিহাসে যদি লোকায়তিক চেতনার উৎস সন্ধান করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিকাশের একটি এই রকম স্তরেই গিয়ে পৌঁছতে হয়। তার সাক্ষী স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে লোকায়তিক চিন্তাধারা চিরকালই ওই রকম মূক, অব্যক্ত ও অচেতন অবস্থায় পড়েছিলো। বস্তুত, ওই রকমই একটা অস্ফুট ও অচেতন দেহতত্ত্ব হিসাবে তার জন্ম হলেও ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় দেখা যায়, কোনো একটা যুগে এই লোকায়তিক চেতনাই রীতিমতো সচেতন বস্তুবাদী দর্শনে পরিণত হয়। পুঁথি লেখা হয়েছিলো, ভাষ্য রচনা হয়েছিলো এবং তার সে-সব ভাঙাচোরা টুকরো আজো পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে বোঝা যায় লোকায়তিকদের যুক্তিতর্ক একটা যুগে কী রকম শানানো-সবল হয়ে উঠেছিলো। কি করে যে তা সম্ভবপর হয়েছিলো তা আজো আমরা পুরোপুরি জানতে পারি নি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা আজো অনেক বাকি আছে।

কিন্তু তার আগে, যে-প্রসঙ্গ থেকে এতো কথা উঠেছে সেটুকুর আলোচনা সেরে নেবার চেষ্টা করা যাক।

বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লোকায়তিক ঐতিহ্যের তফাতটা উত্তর যুগে এতো প্রকট হওয়া সত্ত্বেও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বামাচারী ও এমনকি লোকায়তিক চেতনার এত অজস্র স্মারক কি করে টেকে রয়েছে?

তার কারণ নিশ্চয়ই লোকায়তিক ধ্যানধারণাও যে-রকম আকাশ থেকে জন্মায় নি, উত্তর যুগের বৈদিক অধ্যাত্ত্ববাদ ও ভাববাদী ধ্যানধারণাও সেই রকমই আকাশ থেকে জন্মায় নি। উভয়ের উৎসই হলো সমাজ-বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে। এখন, সমাজ-বিকাশের যে-সব বিভিন্ন পর্যায় সেগুলির মধ্যে বাঁধাধরা সম্পর্ক আছে: কোন পর্যায় আগের এবং কোন পর্যায় পরের, শুধু এইটুকুই সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নয়, এমন কি কোনো দেশের কোনো মানুষই আগের পর্যায়কে লঙ্ঘন করে একেবারে পরের পর্যায়ে উঠে যেতে পারে নি। তার মানে, পশুর রাজ্যে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলতে চলতে মানুষ যে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার আওতায় এসে পৌঁছলো তা একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়েই, কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ পেরিয়েই। এই দিক থেকে সব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতাই মোটের উপর এক রকমের। তাই আজকের দিনেও পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষেরা যে-অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেই দিকে চেয়ে দেখলে এগিয়ে-যাওয়া মানুষের দল তাদের বিস্মৃত অতীতটাকে খুঁজে পাবে। কেননা, এগিয়ে-যাওয়া মানুষেরাও এককালে ঠিক ওই রকমেই পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে ছিলো—সে-পর্যায় না পেরিয়ে একেবারে সরাসরি উন্নত পর্যায়ে উঠে আসা কোনো দেশের বা কোনো জাতের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

এ-কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন লুইস্ হেনরি মর্গান। তার ‘প্রাচীন সমাজ’ নামের বই শুধুই যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ তাই নয়, যে-কোনো দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের প্রকৃত তাৎপর্য-নির্ণয়ে অপরিহার্য হাতিয়ারও।

মানুষের ধ্যানধারণার সঙ্গে সমাজ-বিকাশের পর্যায়-বিশেষের অঙ্গঙ্গি সম্পর্কের কথা এবং এই পর্যায়-পরস্পরায় অনিবার্য ধারাবাহিকতার কথা মনে রাখলে বৈদিক সাহিত্যে বামাচারী ও লোকায়তিক ধ্যানধারণার স্মারকগুলি দেখে খুব বেশি বিস্ময়ের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ে লোকায়তিক ও বামাচারী ধ্যানধারণার উৎস, বৈদিক মানুষেরাও এককালে তার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সে-পর্যায়কে পিছনে ফেলে এলেও তাঁদের সাহিত্য থেকে তার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যায় নি। এই স্মৃতি হিসেবেই সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণার অনেক চিহ্ন বৈদিক সাহিত্যে টেকে গিয়েছে। তার মানে, বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকরা উত্তর যুগে যে-সব ধ্যানধারণাকে অমন ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, এককালে তাঁদের নিজেদের মনেই-অর্থাৎ তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের মনে-সেগুলি চরম সত্যের মর্যাদা পেতো।

আর্য-অনার্য মতবাদের সংকট

আর ঠিক এই কথাটিকে স্পষ্টভাবে চেনবার পথে বিঘ্ন ঘটায় আধুনিক পণ্ডিত মহলে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি মতবাদ। মতবাদটি হলো, আর্য-অনার্য বা আর্য-দ্রাবিড়-সংক্রান্ত মতবাদ: অনার্যদের এই দেশে প্রবেশ করবার পর শিক্ষিত ও সংস্কৃত আর্যদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু কিছু অসংস্কৃত অনার্য-বিশ্বাস প্রবেশ করেছিলো। কী করে করলো? তাই নিয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। ক্ষিতিমোহন সেন(৫৫) বলছেন, এ হলো করুণাময়ের লীলা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু(৫৬) বলছেন, এর কারণ হলো আগন্তুক আর্যদের অসীম সহনশীলতা। এ. বি. কীথ(৫৭) অতো ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাই করছেন না, শুধু ঘোষণা করছেন যে স্থানীয় অসভ্য মানুষদের নানান ধ্যানধারণা আর্যদের ধ্যানধারণার রাজ্যে 'সেঁদিয়ে' গিয়েছিলো।

এখন এই আর্য-অনার্য মতবাদ যে শেষ পর্যন্ত ধোপে কতোখানি টেকবে তা খুব সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এককালে বিদগ্ধ সমাজ এ-মতবাদ নিয়ে যতোখানি উৎসাহ দেখিয়েছিলো আজদের দিনে তার তুলনায় উৎসাহ অনেক কমেছে(৫৮)। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পণ্ডিতমহলের ঝোঁকটা দিক বদল করছে: এককালে ঝোঁক ছিলো যা কিছু উন্নত ধরনের চিন্তা তাকেই আর্য আখ্যা দেবার, একালে যেন তথাকথিত দ্রাবিড়দের প্রতিই শ্রদ্ধা ও পক্ষপাতটা বেশি(৫৯)।

অবশ্যই আমাদের পক্ষে এ-জাতীয় তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ হবে না, প্রয়োজনও নেই। আমাদের পক্ষে যেটুকু কথা প্রাসঙ্গিক সেটুকু হলো ভবিষ্যতে এই আর্য-অনার্য মতবাদের কপালে যাই থাকুক না কেন বর্তমানে এ-মতবাদ সত্য নির্ণয় প্রচেষ্টার যে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। আসলে আর্যই বলুন, বৈদিক মানুষই বলুন, বা যাই বলুন না কেন—তাদের

নিজেদেরও একটা অসভ্য অতীত ছিলো, এবং সে-অতীতের নানা স্মারক পরের যুগের বৈদিক সাহিত্যেও টেকে থাকতে বাধ্য; তাই সেগুলিকে নির্বিচারে অনার্য বা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে গৃহীত মনে করা চলবে না। অর্থাৎ কিনা, এই আর্য-অনার্য মতবাদ সত্যই হোক আর ভ্রান্তই হোক—তারই মোহে আমরা যেন বৈদিক মানুষদেরই নিজস্ব অতীতটার সন্ধান প্রচেষ্টায় উদাসীন না হই।

৫৫. ক্ষিতিমোহন সেন: ভারতের সংস্কৃতি, ভূমিকা।

৫৬. J. Nehoru DI 57, 60, 68, 78.

৫৭. A. B. Keith RPVU 18, 24, 33, 54, 91, 92 ইত্যাদি

৫৮. বাঙালীর ইতিহাস: নীহাররঞ্জন রায়। ভারতের সংস্কৃতি: ক্ষিতিমোহন সেন। S. Radhakrishnan HPEW, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৫৯. Ibid.

সমাজ-বিকাশের ধারা

লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-সন্ধান অগ্রসর হয়ে আমরা সমাজ-বিকাশের কোনো এক প্রাক্-সভা পর্যায়ে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু সে-কথার তাৎপর্য ঠিক কী? তার মানে কি এই যে প্রাচীন সমাজের সেই মানুষেরা বুদ্ধিশুদ্ধির দিক থেকে এমনই খাটো বা নিকৃষ্ট ধরনের ছিলো যে অধ্যাত্মবাদী চিন্তাধারার মহিমাটা তারা বুঝতেই পারে নি? এক কথায় প্রশ্ন হলো,—এর কারণটা কি এই যে তাদের মগজের গড়নটাই বাজে রকমের ছিলো, তাই তারা ইহলোক ছাড়া আর কিছুই সত্যি বলে ভাবতে পারেনি? তাদের লোকায়তিক চেতনাটা কি শুধুই স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক?

তা নয়। আসল কারণটা মগজের গড়ন নয়, সমাজের গড়ন। সমাজের গড়নটা বদলেছে বলেই মানুষের মাথায় এক ধরনের ধ্যানধারণার বদলে আর এক ধ্যানধারণার উদয় হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান(৬০) অনুসারে গত হাজার তিন-চার বছরের মধ্যে মাপ বা গড়ন কোনো দিক থেকেই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের খুব উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তবুও তার চিন্তাচেতনায় আকাশ-পাতাল তফাত দেখা দিয়েছে। কী করে তা সম্ভব হলো? তার কারণ, যদিও মানুষের চিন্তাচেতনা তার স্নায়ুতন্ত্রের উপরই নির্ভরশীল, তবুও এই স্নায়ুতন্ত্রের উপরই পারিপার্শ্বিকের যে-অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে তার কথা বাদ দিলে স্নায়ুতন্ত্রের স্বরূপটাই বুঝতে পারা সম্ভব নয়। এ-কথায় যাঁদের মনে সন্দেহ আছে তাঁরা পাভলভের(৬১) রচনাবলী থেকে প্রমাণগুলি দেখে নেবেন।

লোকায়তিক ধ্যানধারণাকে পিছনে ফেলে মানুষ যে এককালে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণার আওতায় এসে পৌঁছেছিলো তার আসল কারণ তার স্নায়ুতন্ত্রে কোনো রকম আকস্মিক পরিবর্তন নয়,—আসলে তার

সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে এ আমূল পরিবর্তন। অধ্যাত্মবাদের জন্মবৃত্তান্ত জানতে হলে এই পরিবর্তনটাকে ভালো করে বোঝা দরকার।

মানবসমাজের ইতিহাসটা একবার আগাগোড়া দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আজ পর্যন্ত মানবসমাজের যে-ইতিহাস তাকে আমরা মোটের উপর তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

এক: আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ

দুই: বর্তমান শ্রেণী-সমাজ

তিন: আগামী কালের শ্রেণীহীন সমাজ

প্রাক-বিভক্ত সমাজটাকে বলা হয় আদিম সাম্যসমাজ। তার কারণ, এ-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিচয় নেই, পরিচয় নেই রাষ্ট্রব্যবস্থার। শোষণ নেই, শোষিত নেই, শাসক নেই, শাসিত নেই। সবাই স্বাধীন, সবাই সমান, মানুষে-মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব। এ-রকম সমাজ যে কল্পনা নয়, বাস্তব-তার প্রমাণ? প্রমাণ হলো, আজো পৃথিবীর নানান জায়গায় এ-রকম সমাজ সত্যিই রয়েছে, তাই সে-সমাজ স্বচক্ষে দেখা যায়। লুইস্ হেনরি মর্গান এ-সমাজ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাবার জন্যেই জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই এ-হেন সমাজের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ-কয়জাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন যে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ আজ সভ্যতার যতো উচ্চ-স্তরেই পৌঁছোক না কেন, কোনো এক অস্পষ্ট অতীতে তারাও এই সমাজেই বাস করেছিলো।

এ-হেন প্রাচীন সমাজ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য কেন? কেননা, এ-অবস্থায় মানুষের উৎপাদন-শক্তি এতো অনুন্নত যে সকলে মিলে প্রাণপণ পরিশ্রম করে দলের সকলের জন্যে কোনোমতে নিছক প্রাণ-ধারণের

উপাদানগুলি প্রকৃতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। হাতিয়ার যদি উন্নত হয় তাহলে একজন মানুষের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু হাতিয়ার যখন স্থূল ও প্রাকৃত তখন একজন মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করে যেটুকু জিনিস উৎপাদন করতে পারে তাই দিয়ে কোনোমতে শুধু নিজেকে বাঁচানো সম্ভব। এ-অবস্থায় মানুষের শ্রম উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে শেখে নি, তাই এ-সমাজ উদ্বৃত্তজীবী বলে কোনো শ্রেণীর আবির্ভাবও সম্ভব নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সমানে-সমান সম্পর্ক। শুধু তাই নয়। এ-অবস্থায় কারুর পক্ষে একা একা বাঁচবার চেষ্টাও অসম্ভব: প্রকৃতিরাজ্যে বিঘ্ন বিপর্যয়ের অন্ত নেই, স্থূল হাতিয়ার হাতে দুর্বল মানুষদের একমাত্র ভরসা হলো সংখ্যা। মানুষের চেতনারও তাই ঝাঁকটা একের উপরে নয়, ব্যক্তির উপরে নয়, ব্যষ্টির উপরে নয়। তার বদলে, পুরো দলের উপর, সকলের উপর, সমষ্টির উপর। সমষ্টির চেষ্টাতেই মানুষের পক্ষে এ-অবস্থায় বাঁচা সম্ভবপর। তাই শ্রমে অংশ গ্রহণ করবার দিক থেকে সকলের সঙ্গে সকলের সমান, শ্রমের ফল ভোগ করবার দিক থেকেও সকলের সঙ্গে সকলে সমান।

কিন্তু মানুষের উৎপাদন-কৌশল চিরকার একই অবস্থায় টেকে থাকে নি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষের হাতিয়ার শানিত হয়েছে, উন্নত হয়েছে। এবং এইভাবে উন্নত হতে হতে একটা অবস্থায় পৌঁছে দেখা গেলো মানুষকে কোনোমতে টায়েটুয়ে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যতটুকু দরকার তার চেয়েও বেশি জিনিস মানুষ উৎপাদন করতে পারছে। এই অবস্থাতেই প্রথম দেখা দিলো শ্রম-বিভাগ: কিছু মানুষ শুধুমাত্র কারিগরি কাজ নিয়ে থাকবে, অন্য-উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বটা আর তাদের নিজেদের উপর থাকবে না, কেননা বাকি মানুষের উৎপন্ন অল্পের উদ্বৃত্ত অংশটুকু থেকে তাদের খাবার যোগান দেওয়া হবে। এই শ্রমবিভাগের দরুনই মানুষের উৎপাদন-কৌশল দ্রুত উন্নত হতে লাগলো,

কেননা, অল্প উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে যারা মুক্তি পেলো তারা উন্নততর উৎপাদন-যন্ত্র উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে পারলো।

তারপর এইভাবে এগোতে এগোতে মানুষ এসে পৌঁছলো একেবারে নতুন ধরনের এক অবস্থায়। শ্রমবিভাগের এমন এক নতুন পর্যায় দেখা দিলো যার সঙ্গে আগেরকার শ্রমবিভাগের গুণগত ও মৌলিক প্রভেদ। নতুন পরিস্থিতিটা কী রকম? একদিকে উৎপাদন-কর্মের সংগঠন আর একদিকে যারা বাস্তবিকই উৎপাদন করবে তারা। যারা সংগঠক তারা নিজেরা উৎপাদনকাজে অংশগ্রহণ করবে না, নিজেরা পরিশ্রম করবে না, গতির খাটাবে না। তার বদলে তারা মাথা খাটাবে—সংগঠনের জন্যে শুধু মাথা খাটানোরই প্রয়োজন।

এই সংগঠকশ্রেণী থেকেই ক্রমশ দেখা দিলো পুরোহিত-শ্রেণী(৬২)। শুরুতেই তারা নিশ্চয়ই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হয়ে বসে নি: তার বদলে তাদের দায়িত্ব ছিলো উৎপাদন কাজের তদারক করা এবং উৎপাদনের ওই উপায়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা—মাথা খাটিয়ে, ভেবেচিন্তে, পুতো সমাজের উৎপাদন কাজটির পরিচালনা করা। এ-দায়িত্ব তাদের স্বভাবতই অনেকখানি কর্তৃত্বের অধিকারী করেছিলো। কর্তৃত্বশক্তি না থাকলে পুরো সমাজটার কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়।

এই কর্তৃত্বশক্তির প্রভাবেই কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আর উৎপাদন কাজের পরিচালক রইলো না, উৎপাদনের উপায়গুলির শুধুমাত্র রক্ষক রইলো না। তারা ক্রমশই এগুলির মালিক হয়ে দাঁড়ালো। আর এইভাবেই আদিম প্রাক-বিভক্ত সাম্যসমাজ ভেঙে গিয়ে দেখা দিলো নতুন ধরনের সমাজ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। একদিকে মালিক-শ্রেণী,—তারা মাথা ঘামাবে, কিন্তু গতির খাটাবে না। অপর দিকে শ্রমিক-শ্রেণী,—তারা শুধুই গতির খাটাবে, কিন্তু মাথা ঘামাবার সুযোগ-সুবিধে তাদের জন্যে নয়(৬৩)।

অর্থাৎ কিনা, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার দরুন শুধুই যে মালিকে-শ্রমিকে তফাত দেখা দিলো তাই নয়, তারই অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দিলো শ্রমের সঙ্গে চিন্তার বিচ্ছেদ, গতর খাটানোর সঙ্গে মাথা খাটানোর বিচ্ছেদ, কায়িক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ।

আর এই তথ্যটুকু মনে না রাখলে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণার জন্মকাহিনী সত্যই বুঝতে পারা যাবে না। এঙ্গেলস্(৬৪) বলছেন:

With each generation, labour itself different, more perfect, more diversified. Agriculture was added to hunting and cattle-breeding, then spinning, weaving, metal-working, pottery, and navigation. Along with trade and industry, there appeared finally art and science. From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in the human mind: religion. In the face of all these creations, which appeared in the first place to be products of the mind, and which seemed to dominate human society, the more modest productions of the working hand retreated into the background, the more so since the mind that plans the labour process already at a very early stage of development of society (e.g. already in the simply family), was able to have the labour that had been planned carried out by other hands than its own. All merit for the swift advance of

civilisation was ascribed to the mind, to the development and activity of the brain. Men became accustomed to explain their actions from their thoughts, instead of from their needs – (which in any case are reflected and come to consciousness in the mind) – and so there arose in the course of time that idealistic outlook on the world which, especially since the decline of the ancient world, has dominated men's minds.

অর্থাৎ, বংশপরম্পরায় শ্রমের রূপান্তর হতে লাগলো; শ্রম আরো নিখুঁত আরো বিচিত্র হয়ে উঠতে লাগলো। শিকার ও পশুপাওনের সঙ্গে সংযুক্ত হল কৃষি; তারপর সুতোকাটা, কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ। মৃৎশিল্প, নৌচালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আবির্ভাব হলো চারুকলা ও বিজ্ঞানের। গোষ্ঠী বদলে দেখা দিলো জাতি ও রাষ্ট্র। আইন এবং রাজনীতির আবির্ভাব হলো, আর সেই সঙ্গে মানব-মনে মানব-ব্যাপারেরই কাল্পনিক প্রতিবিশ্ব: ধর্ম। এইসব সৃষ্টির পাশে,—যেগুলি কিনা মুখ্যত মনের সৃষ্টি বলেই প্রতীয়মান হয়েছিলো এবং মানবসমাজ নিয়ন্ত্রণে যেগুলির প্রভাবই সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছিলো,—মানবহাতের অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে কীর্তিগুলি পিছিয়ে পড়তে লাগলো, এবং ততোই বেশি পিছিয়ে পড়তে লাগলো যতোই কিনা যে-মন শ্রমের পরিকল্পনা করেছে সেই মনই নিজের হাত ছাড়াও অপরের হাতের সাহায্যে এই পরিকল্পিত শ্রমকে সফল করিয়ে নিতে শিখেছে—সমাজবিকাশের খুব পুরোনো পর্যায় থেকেই এ-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত কৃতিত্ব গিয়ে পড়তে লাগলো মনের উপর, মগজের

বিকাশ ও ক্রিয়ার উপর। প্রয়োজনের দিক থেকে চিন্তার ব্যাখ্যা করবার বদলে মানুষ ধ্যানধারণা দিয়েই চিন্তার ব্যাখ্যা করতে শিখলো (শেষ পর্যন্ত যদিও প্রয়োজনই ধ্যানধারণা হিসেবে মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে ও চেতনায় ধরা দিয়েছে);—এইভাবেই কালক্রমে প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হলো, এবং বিশেষ করে প্রাচীন যুগ শেষ হবার পর থেকে দৃষ্টিভঙ্গিই মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের জন্মকাহিনী আর কোথাও এর চেয়ে স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা খুবই সন্দেহের কথা। এবং, ভবিষ্যতে “বরুণ” নামের পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাবো ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র কতো অভ্রান্তভাবে এই কথাগুলিই প্রমাণিত করে: আমাদের দেশে সমাজের সদরমহল থেকে কায়িক শ্রমের মর্যাদা যতোই মুছে গিয়েছে ততোই মানুষের চেতনায় জন্ম হয়েছে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার।

তাই এ-কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত মানুষের মাথায় অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী ধ্যানধারণার আবির্ভাব হবে কোনো অবকাশ ছিলো। শ্রম বা কর্ম বস্তুতন্ত্র। শঙ্করাচার্যের(৬৫) সমস্ত শক্তির যুক্তি সত্ত্বেও তাই। এ-কথা পরে প্রতিপন্ন করবার অবকাশ পাবো। আপাতত, যে-প্রশ্ন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সেটা হলো আদিম সাম্যসমাজের—প্রাক-বিভক্ত সমাজের—মানুষদের ধ্যানধারণার কথা।

যে-সমাজে উৎপাদন-কর্মের সঙ্গে,—শ্রমের সঙ্গে,—সমস্ত মানুষেরই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সে-সমাজের চিন্তাচেতনাটা,—যতোই মুক ও অস্ফুট হোক না কেন,—প্রাক-অধ্যাত্মবাদী, অতএব লোকায়তিকই হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্র তো তাই-ই প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু এখানে সমস্ত

দলিল পেশ করবার অবকাশ নেই। তার বদলে সমস্যাটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

মানুষের উৎপাদন পদ্ধতিই তাকে আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণীসমাজের আওতায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সেইখানেই শেষ হয় নি। এই উন্নতিই মানুষকে শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যেই একের পর এক পর্যায় পার করে গিয়ে নিয়ে চলছে: দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ, ধনতান্ত্রিক-সমাজ। ধনতান্ত্রিক-সমাজের পূর্ণ বিকাশই শ্রেণীবিভাগের শেষ সীমানা। কেননা, এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ দেখছে তার উৎপাদন শক্তি এমন অবিশাস্য হয়ে উঠেছে যে শ্রেণীসমাজের কাঠামোত মধ্যে একে আর কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব নয়। মানুষের উৎপাদন শক্তি যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে মানুষ-মানুষে বর্তমান সম্পর্কের বিরুদ্ধে, শ্রেণী-সম্পর্কের বিরুদ্ধে(৬৬)। আজকের দিনে ধনতান্ত্রিক সমাজে যে সংকট প্রকট হয়েছে তার সমাধান আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজ। এই শ্রেণীহীন সমাজের কথা আজ আর স্বপ্নকথা নয়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ আজ সচেতনভাবে সেইদিকে এগিয়ে চলেছে।

এই হলো মানব সমাজের তিনটি মূল স্তর: অতীতের প্রাক-বিভক্ত সমাজ, বর্তমানের শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজ।

অতীতের সেই প্রাক-বিভক্ত সমাজের সঙ্গে আগামীকালের শ্রেণীহীন সমাজের সম্পর্কটা কী রকম? আজকের মানুষ কি শ্রেণীসমাজের জ্বালায় যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অতীতের প্রাক-বিভক্ত সমাজে ফিরে যেতে চাইবে নাকি?

—দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগর?

নিশ্চয়ই নয়।

আদিম সাম্যসমাজের আসল ভিত্তি ছিলো দারিদ্র্যের। সবাই সমান, কেননা, সবাই সমান গরিব। আর সবাই সমান গরিব, কেননা, উৎপাদনের পদ্ধতি

তখন এমনই করুণ যে সবাই মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করে কোনোমতে সবাইকে টায়ে-টুয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

আগামীকালের সাম্যসমাজের ভিত্তিতে প্রাচুর্য। কেননা, গত কয়েক হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় মানুষ তার উৎপাদন শক্তিকে এমন অবিশ্বাস্য ভাবে বাড়িয়ে ফেলেছে যে তারই সাহায্যে আজ অভাবনীয় ধনসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও আজকের দিনে মানুষের দুঃখদৈন্য ঘুচছে না। তার কারণ ওই ধনসম্পদ আজ মানুষের অভাবমোচনে নিযুক্ত নয়। লাভ বিক্রি করবার জন্যেওই এগুলি তৈরি করা হয়। তার বদলে, মানুষের অভাব মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুসারে এই অবিশ্বাস্য উৎপাদন শক্তিকে কাজে লাগালে আজ যার-যা-দরকার তাই পাওয়া সম্ভব হবে। অভাব বলে কথাটিকে মানুষ ভুলে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা তোলবার সময় আমরা দেখবো, ঠিক এই প্রসঙ্গেই কার্ল মার্কস্ বলছেন, finding what is newest in what is oldest,—যা কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে যা সবচেয়ে নতুন তাকে দেখতে পাওয়া। সবচেয়ে নতুন মানে?—ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব। শ্রেণীশোষণের অভাব। সবচেয়ে পুরানোর মধ্যেও—আদিম সাম্যসমাজেও—তাই-ই চোখে পড়ে।

কার্ল মার্কস্-ই প্রথম প্রমাণ করলেন, মানুষের ধ্যানধারণার চরম উৎস হলো তার সমাজ-ব্যবস্থায়। তার তাই, সমাজ-বিকাশ সম্বন্ধে যে-কথা ধ্যানধারণার ইতিহাস সম্বন্ধেও তাই হওয়াই শুধু স্বাভাবিক নয়, অনিবার্যও।

তার মানে?

আগামীকালের সাম্যসমাজ অতীতের সাম্যসমাজটার দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা নয়। কিন্তু তবুও অতীত যুগের সেই সমান-সহজ সম্পর্কটাকে ফিরে পাবার

চেপ্টা নিশ্চয়ই: অভাবের ভিত্তিতে নয়, প্রাচুর্যের ভিত্তিতে; নিচুস্তরে নেমে গিয়ে নয়, অতীত যুগের সমান সম্পর্কটাকে উচ্চস্তরে তুলে এনে। মর্গান(৬৭) বলছেন:

It will be a revival, in a higher form, of the liberty, equality and fraternity of the ancient gentes.

অর্থাৎ, সেই প্রাচীন সমাজের গোষ্ঠীগুলিতে যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছিলো আগামী কালের সমাজে, উচ্চতর পর্যায়ে, তার পুনরাবির্ভাব হবে।

দার্শনিক ধ্যানধারণার আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

মানুষের কথা বাদ দিয়ে মানুষের ধ্যানধারণাকে বোঝবার অবকাশ যদি সত্যিই থাকতো তাহলে দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে সমাজ ইতিহাসের এই বহিঃরেখার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হতো। কিন্তু অবাস্তব নয়। ধ্যানধারণার কথা জানতে গেলে যাদের মাথায় ধ্যানধারণার আবির্ভাব হয়েছে তাদের কথাও জানা দরকার।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণ্ডি ছেড়ে আজকের মানুষ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাবার সময় সচেতনভাবে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণাকে পরিত্যাগ করে বস্তুবাদী দর্শনে প্রতিষ্ঠা খুঁজছে। ওই শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তিতে কার্যিক শ্রম ও মানসিক শ্রম,—কর্ম আর জ্ঞান,—দু’-এর ভিতরকার হারানো সম্পর্ক আবার ফিরে আসবে, আর সেই সঙ্গেই দূর হবে ভাববাদের বাস্তব ভিত্তি। মানুষ আর অধ্যাত্মবাদের আলেয়ায় ভুলে প্রবঞ্চনার জলাভূমিতে গিয়ে ডুবে মরবে না, ভাববাদের কথায় মোহগ্রস্ত হয়ে অবাস্তবের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বাস্তব সুখদুঃখগুলোকে ভুলে থাকবে না। তার বদলে, বাস্তব দুনিয়াকে একমাত্র সত্য বলে জেনে দিনের পর দিন একে এমন ভাবে বদল করে চলবে যাতে মানুষের সামনে খুলে যায় প্রকৃত কল্যাণের অসীম দিগন্ত।

আর এই দিক থেকে ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্রগুলিকে সত্যিই পরমাশ্চর্য মনে হয়। কেননা, সেগুলি থেকে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই, সমাজ ইতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে দার্শনিক চেতনার আবর্তনটি কতো ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত: কেননা, প্রাক-বিভক্ত সমাজের ধ্যানধারণা যে প্রাক-অধ্যাত্মবাদীই এ-কথা ভারতীয় দার্শনিক পুঁথিপত্রের মধ্যে স্পষ্টভাবে পরিষ্ফুট দেখতে পাওয়া যায়।

আগামীকালের নিঃশ্রেণীক সমাজের মধ্যে অতীতের সাম্যসম্পর্ককে অনেক উন্নত পর্যায়ে তুলে আনবার পরিচয়; আগামীকালের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদও সেই রকমই প্রাক-বিভক্ত সমাজের লোকায়তিক চেতনাকেই উচ্চতর পর্যায়ে ফিরিয়ে আনবে,—অবশ্যই মূক ও অচেতন দেহতত্ত্ব হিসেবে নয়, সচেতন ও সমৃদ্ধ বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে!

জানি, সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের ইতিহাসকে ইতিভাবে মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টার বিরুদ্ধে নানা রকম আপত্তি উঠবে। বিশেষত এই কারণে উঠবে যে শ্রেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যেই বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঐতিহাসিক ভাবে ঘটেছে। ভবিষ্যতে এই আপত্তি নিয়ে আলোচনা তোলবার অবকাশ পাবো। আপাতত, লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় এগিয়ে যে-অভিজ্ঞতাটিকে খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছে সেটুকুই বর্ণনা করা যাক।

ভাববাদী চিন্তার জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে এঙ্গেল্‌স্-এর যে-উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি তার থেকেই একটা সমস্যার সূত্রপাত হয়: সমাজের সদরমহল থেকে শ্রমনিরত মানুষগুলির মর্যাদা ক্ষেয়া যাবার দরুনই যদি ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণার জন্ম হয় তাহলে প্রাক-বিভক্ত সমাজের,—যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের—মানুষদের মাথায় নিশ্চয়ই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী ধ্যানধারণা বিকশিত হবার কোনো অবকাশই ছিলো না। আর তা যদি না থাকে তাহলে সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণাগুলি বস্তুবাদী হওয়াই সম্ভবপর,—এ-বস্তুবাদ যতো

মুক ও অব্যক্তই হোক না কেন। কেননা, সাম্প্রতিক দার্শনিকদের হাজার রকম বাঙময় বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মানতেই হবে, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের একমাত্র পাল্টা-চেতনা হলো বস্তুবাদ।

লোকায়তিক চেতনার উৎস সন্ধানে এগিয়ে দেখা গেলো, সত্যিই তাই। নানান দিক থেকে এ-বস্তুবাদের দারিদ্র্য অসহ্য ও এমন কি অভাবনীয়। তবুও এ-চেতনা প্রাক-অধ্যাত্মবাদী, কেননা, এর উৎসে প্রাগ-বিভক্ত যৌথ শ্রমের সমাজ!

৬০. B. H. Kirman TMM 29.

৬১. I. P. Pavlov LCR Chapters 11, 20, 21 ইত্যাদি।

৬২. G. Thomson R 7.

৬৩. K. Marx and F. Engels GI 20: “Division of labour only becomes truly such from the moment when a division of material and mental labour appears. (The first form of ideologists, priests, is concurrent.) From this moment onwards consciousness can really flatter itself that it is something other than consciousness of existing practice, that it really represents something without representing something real; from now on consciousness is in a position to emancipate itself from the world and to proceed to the formation of “pure” theory, theology, philosophy, ethics, etc. But even if this theory, theology, philosophy, ethics, etc.”

৬৪. F. Engels DN 288-9.

৬৫. শঙ্করমতে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কর্ম পরুষতন্ত্র। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১.১.৮।

কালীবর বেদান্তবাগীশের তর্জমা ১:১০৫-৮ দ্রষ্টব্য।

၆၆. F. Engels SUS (Karl Marx, Selected Works 1:179)

၆၇. H. L. Morgan AS 562.

প্রয়োজন

এই পরিচ্ছেদ শেষ করবার আগে আর মাত্র দু' -একটা কথা তোলা দরকার।

আমাদের দেশে বহুদিন ধরেই প্রথা চলে আসছে, দার্শনিক আলোচনার শুরুতে চারটি কথা খুব খোলাখুলিভাবে বলে নেওয়া: অধিকার, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন। বিষয় ও সম্বন্ধের কথা কিছুটা বলা হয়েছে। প্রয়োজন ও অধিকারের কথাও তোলা দরকার।

লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনটা কী? প্রয়োজনের প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই স্থান-কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই, প্রশ্নটা হবে, আজকের দিনে আমাদের দেশে লোকায়ত দর্শনের চর্চার কী প্রয়োজন?

দেশের বাস্তব পরিস্থিতির কথা থেকেই শুরু করা দরকার।

সাধারণ মানুষ,—কাজ করে, আমাদের দেশে সে-শ্রেণীর মানুষের ধ্যানধারণারই নাম লোকায়তিক,—তারা নানা রকম সমস্যার ঘূর্ণিতে পড়ে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছে। ফলে, অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী ধ্যানধারণা বর্জন করে তারা চাইছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের কাছ থেকেই পথনির্দেশ পেতে। কিন্তু সেই সঙ্গেই শোনা যায় আর একদল বলছেন, এ সবই শুধু বিদেশ থেকে আমদানি করা মতবাদ। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্যবাদেরও সম্পর্ক নেই, বস্তুবাদেরও নয়।

সাধারণ মানুষের পক্ষে তাই আজ ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই আপত্তিগুলি সত্যি কিনা। প্রয়োজনটা শুধুমাত্র জ্ঞানের খাতিরে নয়। জীবনের তাগিদেও।

সাম্যসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অতীত কোনো দেশের বা কোনো জাতিরই হতে পারে না। তার কারণ, আগেই বলা হয়েছে, পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবার পথটা পৃথিবীর সব-দেশের সব-মানুষের পক্ষেই এক।

আজকের দিনের যে-কোনো জাতি সভ্যতার যতো উঁচু শিখরেই পৌঁছুক না কেন, এককালে তাকে আদিম সাম্য-সমাজেই বাস করতে হয়েছে। এদিক থেকে অন্যান্য দেশের সংগে আমাদের দেশের তফাত প্রধানত দুটো। প্রথমত, আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে আজো নানান রকম মানুষ সেই পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় টিকে আছে, এ-ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত দেশে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের উন্নত ও সংস্কৃত মানুষদের রচনাতেও এমন অনেক চিহ্ন থেকে গিয়েছে যেগুলিকে এই আদিম সাম্যসমাজের স্মারক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু বস্তুবাদ? বস্তুবাদের কথা তো আগেই তুলেছি। এমন কথা একবার নয়, বহুবার বহুভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের দেশের ঐতিহ্যটা বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদ—এ-দেশে অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যেন তৈলধারার মতোই অবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু এ-কথা কি ঠিক? উত্তরটা নিশ্চয়ই নির্ভর করবে, দেশের ঐতিহ্য বলতে ঠিক কী বোঝায়, এই প্রশ্নের উপর। কার চিন্তাধারা,—কোন শ্রেণীর মানুষের? যদি শোষণ-শ্রেণীর চেতনাকেই দেশের একমাত্র দার্শনিক ঐতিহ্য বলে মনে করেন তাহলে মানতেই হবে দেশের ঐতিহ্যে বস্তুবাদী চেতনার কোনো স্থান ছিলো না। কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন ধরনের ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করেছে?—এ-প্রশ্ন যদি দেশের দার্শনিক ঐতিহ্য নির্ণয় করবার সময় প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে মানতেই হবে বস্তুবাদী চেতনা আমাদের দেশের দার্শনিক ঐতিহ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলো। কেননা, সাধারণ মানুষ ভাববাদে বিশ্বাস করে নি, বিশ্বাস করেছে দেহাত্মবাদেই, বস্তুবাদেই। প্রমাণ, প্রাচীনদের অজস্র উক্তি। তাঁরা বলেছেন,—বারবার বলেছেন,—লোকায়ত মানে হলো সাধারণ মানুষের দর্শন, আর এই দর্শন অনুসারে মূর্ত জড় জগৎটাই একমাত্র সত্য; আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, পরলোক নেই, পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম।

তাই দেশের সাধারণ মানুষ যদি তাদের দার্শনিক ঐতিহ্যটি চিনতে চায় তাহলে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা বাদ দিয়ে চলবে কী করে?

কিন্তু লোকায়ত দর্শন নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন শুধুমাত্র এই নয় যে দেশের জনসাধারণ নিজেদের দার্শনিক ঐতিহ্যটিকে স্পষ্টভাবে জানতে ও চিনতে পারবে। প্রয়োজন আরো আছে। আরো একটি বড় প্রয়োজন হলো আজকের দিনে ওই লোকায়তিক চিন্তাধারার সংকীর্ণতাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে, এবং তাকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পর্যায়ে তুলে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

যেমন ধরুন, আদিম সাম্যবাদের নজিরের উপর আধুনিক সাম্যবাদী অতোখানি জোর দেন কেন? তা কি এই কারণে যে আজকের দিনে সেই সাম্যসমাজে ফিরে যাবার কোনো তাগিদ আছে? নিশ্চয়ই নয়। তার বদলে আসলে প্রয়োজন হলো, বিরুদ্ধ-প্রচারকে খণ্ডন করে এইটুকুই দেখানো যে ব্যক্তিগত-সম্পত্তি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি সনাতন নয়। মানুষের ইতিহাসে একটা সময় ছিলো যখন এগুলির জন্মই হয়নি। মানুষের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসছে যখন এগুলির কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরী মর্গানকে কেউই অবশ্য সাম্যবাদের প্রচারক বলবেন না। তার বদলে তাঁকে বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্বের প্রবর্তকই বলতে হবে। কিন্তু ভূয়োদর্শনের প্রভাবে তিনি স্পষ্টভাবেই না এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন(৬৮):

A mere property career is not the final destiny of mankind, if progress is to be the law of the future as it has been of the past. The time which has passed away since civilization began is but a fragment of the past duration of man's existence; and but a fragment of the

ages yet to come. The dissolution of society bids fair to become the termination of a career of which property is the end and aim; because such a career contains the elements of self-destruction.

অর্থাৎ, অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও যদি প্রগতির নিয়মই সত্য হয় তাহলে মানতেই হবে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানুষের চরম নিয়তি হতে পারে না। সভ্যতার শুরু থেকে যেটুকু সময় কেটেছে তা মানুষের পুরো অতীতটার তুলনায় যে-রকম চোখের পলক সেই রকমই চোখের পলক হলো পুরো ভবিষ্যৎটার তুলনায়। যে-সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু সম্পত্তিই তার শেষ ঘনিয়ে এসেছে; কেননা, সে-উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে আত্মনাশের বীজ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সনাতন নয়—আদিম সমাজের দিকে চেয়ে দেখলে এই কথাটি আমরা স্পষ্ট ভাবে জানতে পারি। জানতে পারবার দরকার আছে। সেইদিকে পিছু হটবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাবমুক্ত আগামীকালের সমাজ-ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলবার জন্যেই।

আমাদের দেশের লোকায়তিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনও প্রায় অনুরূপ। এই পরিচয়ের ভিত্তিতেই আমরা বুঝতে পারবো যে ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তার ঐতিহ্যই দেশের একমাত্র দার্শনিক ঐতিহ্য নয়। কিন্তু তাই বলে, ওই লোকায়তিক ধ্যানধারণার দিকে পিছু হটবার কোনো তাদিগই থাকতে পারে না। মনে রাখবে হবে, উৎপাদন-পদ্ধতির এক অতি অনুন্নত পর্যায়ে এই ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিলো। মনে রাখতে হবে, সে অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেটুকু সম্যক পরিচয় তা অতি নগণ্য। তাই, বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক

থেকে এই লোকায়ত-দর্শনের একেবারেই দীনহীন দশা, প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সংবাদ লোকায়তিকেরা উদ্ধার করতে পারেন নি, সেটুকুকে কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা ছাড়া তাঁদের পক্ষে আর কোনো উপায় ছিলো না। ওই রকম একটা কল্পনা থেকে বামাচারী বিশ্বাসের জন্ম। এবং, ওই অবস্থায় প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের দৈন্য যে কী ভয়াবহ তা ওই বামাচারী বিশ্বাস থেকেই প্রমাণ হয়।

আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ যে-বস্তুবাদের দিকে মানুষ এগিয়ে যাবে তার তাৎপর্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই অতীতের ওই লোকায়তিক চেতনার কোনো তুলনাই হয় নাই। তাই সেদিকে ফেরা নয়, বস্তুবাদী চেতনাকেই উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা—এই প্রয়োজনটির কথা মনে রেখে লোকায়ত দর্শনের আলোচনা করতে হবে।

৬৮. Ibid 561; cf. G. Thomson AA 426 “...such a study must be undertaken by scholars, who, like Morgan, believe that ‘a mere property career is not the final destiny of mankind’.”

অধিকার

প্রয়োজন ছাড়াও অধিকারীর কথা।

লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় কি অধিকার-ভেদের কথা সত্যিই তোলা উচিত? প্রশ্নটাকে সোজাসুজি এইভাবে পাড়লে নিশ্চয়ই জবাব দেবার অসুবিধে হবে। কিন্তু এই প্রশ্নেই একটি কথা উত্থাপন করবার অবকাশ পাওয়া যায়। কথাটা জরুরী।

লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় আমরা যতোই অগ্রসর হবো ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে দেখতে পাবো যে আলোচনার অনেক দলিলই সমাজ-বিকাশের এমন এক পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত যে-পর্যায়ে পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব হয় নি। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা অনাদি, সনাতন-এ-রকম কোনো ধারণা নিয়ে এগোলে দলিলগুলির তাৎপর্য চোখে পড়া কঠিন হবে। সাম্প্রতিক যুগে আমাদের দেশে এবং বিদেশেও দিকপাল ভারততত্ত্ববিদ তো বড়ো কম জন্মান নি। বরং, দলিলপত্র বলতে আমরা যেটুকু সংগ্রহ করেছি তার সবটুকুর সঙ্গেই তাঁদের পরিচয় ছিলো। কিন্তু তবুও ব্যক্তিগত-সম্পত্তিকে তাঁরা সনাতন মনে করেছেন আর এই কুসংস্কারের দরুনই তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়েছে। ফলে দলিলগুলি চোখের সামনে থাকলেও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য দেখতে পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কার্ল মার্কস্(৬৯) এক জায়গায় এই সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেই বলেছেন,

Owing to certain judicial blindness even the best intelligences absolutely fail to see the things which lie in front of their noses.

একরকমের আইনগত অন্ধতার দরুনই এমন কি সবচেয়ে উঁচুদের
বুদ্ধিমানেরাও একেবারে নাকের গোড়ায় যা রয়েছে তা মোটেই দেখতে
পান না।

মার্কস্-এর কথায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা
দরকার যে মানব সমাজে যা কিনা নিছক আধুনিক যুগের অবদান সেইটুকুকে
সনাতন বলে ভুল করলে প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রের অনেক তাৎপর্যই চোখে
পড়বে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যিনি চিরন্তন মনে করেন তিনি লোকায়ত
দর্শনের তাৎপর্য কোনোদিনই বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ।

৬৯. K. Marx and F. Engels C 209.

২য় পরিচ্ছেদ

পদ্ধতি প্রসঙ্গে

লোকায়ত দর্শনের আলোচনায় যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তার জন্যে আমি একান্তভাবেই অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের কাছে ঋণী। তাঁর নাম আমাদের পণ্ডিতমহলে মোটেই সুপরিচিত নয়, তাই শুরুতেই আমি তাঁর সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন

অবশ্যই, তিনি ভারততত্ত্ববিদ নন, বর্তমানে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক-এর অধ্যাপক। প্রাচীন গ্রীক বিষয়ে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে আজকের ইয়োরোপে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত সত্যিই মুষ্টিমেয়। এ-কথা যাঁরা অধ্যাপক টম্‌সনের সবচেয়ে বড়ো নিন্দুক তাঁরাও নিঃসংকোচে স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

কেননা, অধ্যাপক জীবনের প্রথমার্ধেই তিনি প্রাচীন গ্রীকতত্ত্বে অসামান্য ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তখনই তিনি প্রাচীন গ্রীক পুঁথিপত্রের উপর য-সব টীকাভাষ্য রচনা করেছিলেন সেগুলি বিদগ্ধ সমাজে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছিলো। অথচ, অমন প্রামাণ্য রচনার শ্রষ্টা হয়েও উত্তর-জীবনে তিনি অনুভব করলেন, প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলিকে সত্যিই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। ইয়োরোপে বহুদিন ধরে গ্রীক-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও যে-যুগের পুঁথিপত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করবার সবচেয়ে মৌলিক কাজটি তখনো বাকি থেকে গিয়েছে। এই চেতনা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে এক গভীর সংকটের রূপ নেয়। দিনের পর দিন তিনি অন্বেষণ করে চলেন এমন কোনো পদ্ধতির যার সাহায্যে ওই সুদূর অতীতকে সম্যকভাবে চিনতে পারা সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত সে-পদ্ধতি তিনি খুঁজে পেলেন। প্রাচীন গ্রীস তাঁর সামনে একেবারে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এ-বিস্ময় বড়ো কম নয়। তাঁর ওই আবিষ্কারের কাহিনী তাঁর মুখেই শুনেছিলাম।

সে-রাতটার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। চোখ বন্ধ করলে পুরো দৃশ্যটি আজো স্পষ্ট দেখতে পারি।

রাত এতো গভীর হয়েছে যে কর্মমুখর বার্মিংহাম শহর নিস্তব্ধ, নিব্বুম। আগুনের সামনে পা-দুটো এগিয়ে দিয়ে অধ্যাপক টমসন কথা বলে চলেছেন। কথা বলতে বলতে একজন মানুষ কী তন্ময়ই না হয়ে যেতে পারেন! অথচ কল্পনা নয়, কবিত্ব নয়—বিজ্ঞানের ধারালো বিশ্লেষণ। যেন দুই আর দুই মিলে চার হচ্ছে, তারই হিসেব। এতো স্বচ্ছ, এতো তীক্ষ্ণ তাঁর প্রত্যেকটি কথা যে শুনতে শুনতে মনে হয়ে মাথার ভিতর একটার পর একটা কপাট খুলে যাচ্ছে। যে-সব কথার মানে থাকতে পারে বলে আগে কোনোদিনই ভাবতে পারি নি,—ভাববার মতো চিন্তার সঙ্গতি ছিল না,—সে-সব কথার সহজ তাৎপর্যটা তিনি যেন একেবারে চোখের সামনে তুলে ধরেন। বলেন, এই দিক থেকে ভেবে দেখো, দেখবে এতোটুকুও অস্পষ্ট নয়।

কথায় কথায় নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুললেন। নিজেকে বাদ দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাটিকে মানুষ কতো স্পষ্ট ভাবেই না বর্ণনা করতে পারে!

প্রাচীন পুঁথিপত্রে যা লেখা আছে তার মানে হয়, প্রতিটি কথার মানে হয়। সে-তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব,—এবং উদ্ধার বলতে একালের ধ্যানধারণাকে সেকালের লেখার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করা নয়। তার বদলে কোনো-না-কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে বুঝতে পারবো সেকালের মানুষে ঠিক কেন, ঠিক কী ভেবে, সেকালের ওই সব পুঁথিপত্র রচনা করেছিলো। এই চেতনাই ক্রমশ তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার পুরো ষোলো আনা হয়ে দাঁড়ালো।

সে যেন এক চরম সংকট। গ্রীক সাহিত্যের ঠিক যে-বিষয়টি সম্বন্ধেই তাঁর তখন অমন খ্যাতি সেই বিষয়টিরই প্রকৃত তাৎপর্য কিনা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! বিষয়টি হলো, এক্সাইলাসের নাটক। অধ্যাপক টমসন বলতে লাগলেন, একটা

এস্পার-ওস্পার না-হলেই নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিই করলাম, হয় এক্সাইলাস বুঝবো আর না হয় তো ছেড়ে দেবো। এমন সময় হাতে এলো একটি বই, ক্রিস্টোফার কড্ডয়েল-এর ‘ইলিউশন্স এ্যাণ্ড রিয়ালিটি’ (১)। মনে হলো, অকূলে কূল পাওয়া যাচ্ছে। কড্ডয়েল-এর বই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো ম্যাক্সবাদ-এর দিকে। পড়লাম এঙ্গেলস্-এর ‘দি ওরিজিন অব ফ্যামিলি’ – ‘পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’ (২)। এঙ্গেলস্-এর বই আমাকে পৌঁছে দিলো মর্গান-এর ‘এল্গেন্ট সোসাইটি’ বা ‘প্রাচীন সমাজ’ (৩) পর্যন্ত। কূল পেলাম। এক্সাইলাস আর ছাড়তে হলো না।

এর পর গ্রীক বিষয়ে তিনি যে-দুটি বই লিখেছেন বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। বই দুটির নাম: ‘এক্সাইলাস এ্যাণ্ড এথেন্স’ এবং ‘স্টাডিস্ ইন্ এল্গেন্ট গ্রীক সোসাইটি’ (৪)।

অবশ্যই, মর্গান নিজে গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ‘প্রাচীন সমাজ’ বলে তাঁর ওই বই-এর প্রধান আলোচনাটা আমেরিকার আদিবাসীদের নিয়ে। আদিবাসী-সংক্রান্ত এই গবেষণা কেমন ভাবে আজকের দিনে একজন শ্রেষ্ঠ গ্রীকতত্ত্ববিদের হাতে গ্রীক সাহিত্য-জগতের তোরণদ্বার উন্মোচন করবার চাবিকাঠি যুগিয়েছে সে-অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে আপনার মনে হতোম সেকালের গ্রীক-সমাজ তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন সে-সমাজের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত, টাল-বেটাল। আর তারই আবর্তে পড়ে তখনকার জনৈক নাট্যকার কেন এক নির্দিষ্ট মতাদর্শে মেতে উঠলেন,—অন্য কোনো রকম রচনা কেন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হলো না,—অধ্যাপক টমসনের মুখে সে-কথা শুনলে আপনার মনে হতো, তিনি কথা বলছেন না—ছবি আঁকছেন! এমনই নির্মল, এমনই প্রত্যক্ষ তাঁর অনুভূতি!

আমার জীবনে এর চেয়ে বড়ো বিস্ময় সত্যিই ঘটেনি।

বিস্ময় শুধু এই কারণে নয় যে এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মুখে থেকে তাঁর এই অসামান্য অভিজ্ঞতার কথাটা শুনতে পেয়েছিলাম। আরো বড়ো বিস্ময় এই কারণে যে আমার নিজের কাছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন নিয়ে যেগুলি ছিলো সবচেয়ে কঠিন আর সবচেয়ে জটিল সমস্যা তাঁর ওই উপলব্ধি আমাকে সেগুলির সমাধান খোঁজবার পথ দেখিয়ে দিলো।

সেদিন রাতে মনে হয়েছিলো, কাঁচের একটু কুঁচো খুঁজতে এ-দেশে,— এতোদূরে,—এসেছিলাম। তার বদলে পেয়ে গেলাম একেবারে হীরের টুকরো। এ-হীরে জীবনভোর আমার সমস্ত প্রচেষ্টার মূলধন হতে পারবে।

মর্গান-এর মূলসূত্র অনুসরণ করে কী ভাবে প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব তার নির্দেশ পাওয়া যায় অধ্যাপক জর্জ টমসনের সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলী থেকে। তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকায়ত-দর্শনের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আমি এই আলোচনার খসড়া তৈরি করেছি। বলাই বাহুল্য, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেহাতই নগণ্য। এদিক থেকে আমার সম্বল হলো পূর্বগামী ভারততত্ত্ববিদদের মৌলিক গবেষণা। মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। কালিদাসের কাছে এ-কথা অতিরঞ্জিত বিনয় হোক আর নাই হোক, আমার কাছে নিছক আত্মোপলব্ধি।

তবু সাহসী যে হয়েছি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রের সঙ্গে অনেক সময় পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতেই, আমি এই পদ্ধতি প্রয়োগ নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছি তার পিছনে প্রধান উৎসাহ অবশ্যই পদ্ধতিটির সম্ভাবনা সম্বন্ধে দক্ষতর বিদ্বানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

আমাদের বিদগ্ধ-সমাজে এ-পদ্ধতি সুপরিচিত নয়। অথচ, এর সম্ভাবনা যেন সীমাহীন। যোগ্যতর বিদ্বান বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে দুর্বোধ্য কোণগুলিকে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়। সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রগুলির সাক্ষ্য অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, মানবজাতির অগ্রগতি-পথের একটি বিশেষ স্তরের লিখিত দলিলপত্র ভারতবর্ষে এমন ভাবে টিকে আছে যা একমাত্র চীন ছাড়া আর কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা খুবই সন্দেহের কথা। তাই অন্যান্য দেশের ইতিহাসে যে-কথা আবছা আর অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সেগুলিকে বোঝা যেতে পারে ভারতীয় ইতিহাসে আজো যা স্পষ্ট ভাবে বেঁচে রয়েছে তারই সাহায্যে।

বলাই বাহুল্য, লোকায়ত-দর্শনের এই আলোচনায় যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি ঘটে থাকে তাহলেই প্রমাণ হবে না পদ্ধতিটি ভ্রান্ত। কেননা, পদ্ধতি ফলপ্রসূতা ছাড়াও প্রয়োগ-পটুত্বের কথা রয়েছে। তবু, আত্মশক্তি সম্বন্ধে মনে কোনো মোহকে প্রশয় না দিয়েও এটুকু ভেবেছি যে, ভুলের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে আমরা কোনোদিনই সত্যে পৌঁছতে পারবো না। এ-বিষয়ে অধ্যাপক টম্‌সনেরই একটি উক্তি(৫) মনে পড়ে:

We cannot reach truth unless we risk error.

হঠকারিতার বরাভয় নয়, অস্বেষীর কাছে আশ্বাসবাণী।

অধ্যাপক টম্‌সনের পদ্ধতিটি ঠিক কী এই পরিচ্ছেদে তার পরিচয় দিতে চাই। তার আগে দেখা দরকার লোকায়ত-দর্শন প্রসঙ্গে সত্যিই এমন সমস্যা ওঠে যার সমাধান পাবার জন্যে একটি কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন আছে।

১. C. Caudwell IL.
২. F. Engels OFPPS.
৩. H. L. Morgan AS.
৪. G. Thomson AA এবং SAGS.
৫. G. Thomson SAGS 36.

লোকায়ত-প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লোকায়তিকদের নিয়ে কী এমন সমস্যা উঠছে যে সমাধানের খোঁজে এইভাবে কালাপানি পার হতে হবে?

আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদের রচনা থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘লোকায়ত’ নামে ইংরেজীতে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এমন কয়েকটি উক্তি সংগ্রহ করেন যার সঙ্গে লোকায়ত-দর্শন সংক্রান্ত আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ-জাতীয় তথ্য তাই ভারতীয় দর্শনের ছাত্রের কাছে সমস্যা সৃষ্টি না করে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সে-সমস্যাকে তুচ্ছ মনে হবে; কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায়, তা নয়।

সমস্যা যে ওঠে এ-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন। বস্তুত, সে-সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা তিনি নিজেই করেছেন। তাছাড়া, তাঁর ওই ছোট পুস্তিকাটির ভিত্তিতেই শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ‘ভারতীয় বস্তুবাদ, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ ও ভোগবাদ’ (৭) নামের ইংরেজী বইতে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটুখানি এদিক-ওদিক তাকালেই,— অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষের অন্যান্য কিছুকিছু প্রাচীন পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেই,—বোঝা যায় এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসু মনকে সত্যিই সন্তুষ্ট করতে পারে না। সমাধান হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার বদলে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত কিছু কিছু নতুন সমস্যারই সৃষ্টি করে।

মহামহোপাধ্যায় লোকায়তিকদের সম্বন্ধে কী রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন? তার থেকে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়? সে-সমস্যার সমাধান হিসাবে তিনি, বা তাঁকে অনুসরণ করে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, যা বলেছেন তা কেন সন্তোষজনক মনে হয় না?

তথ্যগুলির বর্ণনা থেকেই শুরু করা যাক।

প্রথমত, বাহস্পত্যসূত্রম্-এর(৮) সাক্ষ্য। স্বয়ং বৃহস্পতির নামের সংগে জড়িত এই পুঁথিটির সঙ্গে আধুনিক পণ্ডিতমহলের পরিচয় খুব বেশি দিনকার নয়। সম্প্রতি কালে ডক্টর এফ. ডব্লিউ. টমাস এটি সংগ্রহ করেন এবং তাঁরই লেখা দীর্ঘ ভূমিকা ও ইংরেজী তর্জমা সম্বলিত হয়ে ১৯২১-এ পাঞ্জাব থেকে এটি প্রথম ছাপানো হয়। ভূমিকায় ডক্টর টমাস আলোচনা করেছেন, পুঁথিটিকে যে-অবস্থায় আমরা পাচ্ছি তার কোনো কোনো অংশ যেমনই প্রাচীন আবার কোনো কোনো অংশ তেমনি অর্বাচীন। ডক্টর টমাসের মতে, প্রাচীনতম অংশগুলিতে লোকায়ত-দর্শনের আদি ও অকৃত্রিম রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় বলছেন, পুঁথিটির যে-অংশগুলিকে ডক্টর অর্বাচীন মনে করেন তার সাক্ষ্যও কম মূল্যবান নয়।

এখানে পুঁথিটির স্তর-বিচার করবার চেষ্টা করলে আলোচনা অনেকখানি বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা। তাই, সে-আলোচনা মূলতবী রেখে দেখা যাক, পুঁথিটির ঠিক কোন সাক্ষ্যের দিকে মহামহোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান।

এই পুঁথির দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরের পর দুটি সূত্রে,—তাই মহামহোপাধ্যায়ের ভাষায়, যেন এক-নিশ্বাসে,—লোকায়তিক এবং কপালিকদের সম্বন্ধে দুটি কথা বলা হয়েছে:

-অর্থাৎ, অর্থসাধনকালে সর্বত্র লোকায়তিকই হলো শাস্ত্র, কামসাধনে সর্বত্র কাপালিকই শাস্ত্র ।

মহামহোমাধ্যায় বলছেন, এই ভাবে এক-নিশ্বাসে দুটি কথা বলা থেকেই বোঝা যায় কথা দুটি আলাদা নয়। অর্থাৎ, লোকায়তিক ও কাপালিক আলাদা নয়। তাঁর এই উক্তির পক্ষে অবশ্যই আরো একটি যুক্তি দেখানো যায়। তাঁর এই উক্তির পক্ষে অবশ্যই স্বীকার করেন যে কামসাধনার শাস্ত্র বলতে একমাত্র কাপালিকই, তাহলে তাঁর পক্ষে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের কোনো বড়ো রকমের তফাত স্বীকার করা সম্ভব হবে না। কেননা, মাধবাচার্য প্রমুখ সমস্ত লেখকদের মতেই, লোকায়তিকেরা পুরুষার্থ বলতে স্বীকার করেন শুধু অর্থ এবং কাম(৯)। আর, যদি তাই হয় তাহলে কাপালিক বা কামসাধনশাস্ত্র লোকায়তের সঙ্গে অভিন্ন হবারই কথা।

কিন্তু লোকায়তের সঙ্গে কাপালিকদের অভিন্নতা প্রমাণ করবার জন্যে বৃহস্পতি-সূত্রের সাক্ষ্যই একমাত্র নয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরো একটি সাক্ষ্যের কথা তুলছেন এবং এই দ্বিতীয় সাক্ষ্যের সনতারিখ সম্বন্ধেও স্পষ্ট মত ব্যক্ত করছেন।

হরিভদ্র ছিলেন অনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর জৈন লেখক। তাঁর লেখা ষড়দর্শনসমুচ্চয়-এর উল্লেখ প্রথম পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। এ-বইতে তিনি লোকায়তমতের ব্যাখ্যায় করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তাঁর টীকাকার গুণরত্ন লোকায়তিকদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন। অবশ্যই, মহামহোমাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে গুণরত্নের কথাগুলি বিস্তৃত বিবরণ বা বিশ্লেষণ দেন নি। সে-আলোচনায় আমরা পরে ফিরবো। আপাতত, গুণরত্নের মন্তব্যের ঠিক যতোটুকু মহামহোমাধ্যায় নিজে উল্লেখ করেছেন ততোটুকুর উপরই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা যাক।

মহামহোপাধ্যায় বলছেন, যদিও বৃহস্পতির রচনায় লোকায়তিক ও কাপালিকদের কথা স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখিত হয়েছে তবুও গুণরত্নের মতে এ-দু’-এর মধ্যে কোনোই তফাত নেই(১০)। মহামহোপাধ্যায়ের হিসেবে গুণরত্ন ছিলেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক। এবং মহামহোপাধ্যায় বলছেন, তাঁর লেখা পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর সময়েও লোকায়তিক সম্প্রদায় দেশ থেকে বিলুপ্ত হয় নি। কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে মহামহোপাধ্যায়ের নিজের লেখা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তাঁর ধারণায় তাঁর নিজের যুগেও অন্তত বাংলা দেশে নামান্তরের আড়ালে লোকায়তিকের দল সত্যিই টিকে রয়েছে। এই চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের আলোচনায় আমরা একটু পরেই ফিরবো। আপাতত, কাপালিকদের কথাটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। কেননা, গুণরত্ন লোকায়তিকদের সঙ্গে এদের অভিন্নতা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত নন, লোকায়তিকদের এমন বর্ণনা দিচ্ছেন যা ওই কাপালিকদের বর্ণনার সঙ্গে ছবছ মিলে যায়: লোকায়তিকেরা নাকি গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায়, তারা মৈথুনাশক্ত ও যোগী(১১)।

সর্বশেষ বিশেষণটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে আর যাই হোক যোগী শব্দটা কিছুতেই খাপ খায় না। অথচ পুঁথিতে লেখা রয়েছে,—কথাটাকে তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও চলবে না! তাহলে পুঁথিতে যা লেখা রয়েছে তাকে গুরুত্ব দিতে হলে শুধু লোকায়ত নয়, ‘যোগী’ সম্বন্ধেও আমাদের সাধারণ ধারণাকে শুধরে নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু শুধরে যে নেবো তা তো দলিল-দস্তাবেজের উপর নির্ভর করেই। অবশ্যই, দলিলের অভাব নেই। আমরা যতোই অগ্রসর হবো ততোই দেখতে পাবো ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বহুদিন ধরে প্রচলিত আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে খাপ-খায় না এমনতরো দলিল রয়েছে রাশি রাশি। কিন্তু

শুধু দলিল থাকলেই হয় না। দলিলগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করার জন্যে একটা কোনো অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও প্রয়োজন। আমি বলতে চাই, সে-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে অধ্যাপক জর্জ টম্‌সনের গ্রন্থাবলী থেকে। উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে লোকায়ত ও যোগী উভয় শব্দকেই কী রকম নতুন আলোয় দেখা সম্ভব তার আলোচনা পরে তুলবো। আপাতত, শুধু এইটুকুই দেখাতে চাইছি যে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ যে সব ধারণা তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কোনো কাজের কথা নয়। কেননা, তাহলে ভারতীয় দর্শনের পুঁথিপত্রগুলিতেই যা লেখা আছে তাও অস্বীকার করা দরকার।

৭. D. R. Shastri SMIMSH

৮. H. P. Shastri op. cit. 5.

৯. এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০. H. P. Shastri op. cit. 6.

১১. এই গ্রন্থের ৪৩৫-৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য [“লোকায়তিক ধ্যানধারণার উৎস-প্রসঙ্গে: অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত]

লোকায়ত ও কাপালিক

যোগীর কথা ছেড়ে দিলেও কাপালিক নামটিকেই দেখুন না। প্রাচীনেরা বলছেন, লোকায়ত আর কাপালিক একই কথা। কিন্তু আমাদের মনে কাপালিক ও লোকায়ত সম্বন্ধে যেটুকু সাধারণ ধারণা তার সঙ্গে এ-কথার কোনো রকম সঙ্গতি কি খুঁজে পাওয়া যায়?

লোকায়তিকদের সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু সাধারণ ধারণা তার প্রায় চোদ্দ আনাই মাধবাচার্যের লেখা সর্বদর্শনসংগ্রহ থেকে সংগৃহীত। এই বইতে লেখা আছে, লোকায়তিকেরা অনুমান মানে না, আত্মা মানে না, পরলোক মানে না, ঈশ্বর মানে না। তার বদলে তারা মনে করে প্রত্যক্ষই হলো একমাত্র প্রমাণ, দেহই আত্মা, ইহলোকই সব, সুখভোগ ছাড়া কোনো পুরস্কার নেই। মাধবাচার্যের এই লেখা থেকে লোকায়তিকদের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে কাপালিক-সংক্রান্ত ধারণার যোগাযোগ কোথায়? অবশ্যই, কাপালিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটুকু সত্যিই খুব স্পষ্ট নয়—যেটুকু স্পষ্ট তা শুধুমাত্র ভয়াবহ বীভৎসতার একটা ছবি। চীন পর্যটক হুয়েন্সাঙ(১২) ভারতবর্ষে বহু কাপালিক দেখেছিলেন—তাদের গলায় মড়ার খুলির মালা, মড়ার খুলি ভরে তারা মদ খায়। হুয়েন্সাঙ-এর ঢের আগেই বরাহমিহির(১৩) (ষষ্ঠ শতাব্দীতে) তাঁর বৃহৎসংহিতায় কাপালিকদের কথা যেটুকু উল্লেখ করেছেন তার থেকে এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোনো ছবি পাওয়া যায় না। অবশ্যই, কাপালিক সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণাটা প্রধানতই নাটক-নভেল থেকে পাওয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা(১৩) মনে আছে? মনে আছে, কাপালিকদের সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতার চিত্র? কাপালিকদের সম্বন্ধে এই রকম ঘৃণার ভাব শুধুই বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল-এ নয়; তাঁর ঢের আগেকার যুগের নাটকেও। একাদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণমিশ্রের(১৫) প্রবোধচন্দ্রোদয়-এ দেখতে পাই একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও একজন দিগম্বর জৈন

সাধুর সংযম পরীক্ষা করবার জন্যে এক কাপালিক আর এক কাপালিকার চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে; অবশ্যই, তাদের স্বভাবচরিত্রের কোনো বালাই নেই—তাই মঞ্চের উপরেই তারা কামসাধনা শুরু করে দিলো! তারও আগে, সম্ভবট শ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে লেখা ভবভূতির মালতীমাধব(১৬) নাটকে দেখা যায় নায়িকা মালতীকে প্রলুব্ধ করার, এবং শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশ সাধন করার, দায়িত্ব এক কাপালিকার উপরই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় নাটক-নভেল পড়ে শুনে কাপালিকদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো রকম স্পষ্ট ধারণা হোক আর নাই হোক অন্তত একটা তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষের ভাব যে জন্মায় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্যই, লোকায়তিকদের সম্বন্ধেও যেটুকু খাপছাড়া খবর পাওয়া যায় তার মধ্যেও বিদ্বেষের ভাবটা খুবই প্রকট। দার্শনিক পুঁথিপত্রের কথা ছাড়াও এমনকি দেশের খোদ আইনকার্তা বিধান দিয়েছেন, সাধু-সমাজ থেকে লোকায়তিকদের দূর করে দিতে হবে। কিন্তু শুধু সেই কারণেই,—দুই-এর বিরুদ্ধেই বিদ্বেষের ভাব রয়েছে বলেই,—লোকায়ত ও কাপালিক যে এক এ-কথা বলাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ হবে না।

১২. A. Barth RI 214.

১৩. Ibid.

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: কপালকুণ্ডলা।

১৫. প্রবোধচন্দ্রোদয়।

১৬. R. G. Bhandarkar VS 128.

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমাধান

তাহলে, লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্ক নিয়ে একটা সমস্যা উঠছে। অবশ্যই, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের সাধারণ বইতে এ-সমস্যার স্বীকৃতি নেই। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় সাধারণ লেখক নন। তাই তাঁর চোখে এই সমস্যাটি ধরা পড়েছে এবং তিনি এর একটা সমাধান দেবারও চেষ্টা করেছেন।

কী রকম সমাধান?

কাপালিক মানে ঠিক কী,—এ-প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না তুলেও মোটের উপর বারহস্পত্যসূত্রম্ অনুসরণ করেই তিনি ধরে নিচ্ছেন কাপালিক বলতে কামসাধকই বোঝায়। বলাই বাহুল্য, এ-কথায় খু বেশি তর্কের অবকাশ নেই। কেননা, কাপালিকেরা যে একরকমের বামাচারী তান্ত্রিক তা সকলেই স্বীকার করবেন। এবং বামাচারী মানেই হলো কামাচারী। কেননা, বাম কথাটির রকমারি অর্থ সম্ভব বলেও অন্তত এই প্রসঙ্গে বাম মানে ‘কাম’ —বাঁ-হাত বা বাঁ-দিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। প্রমাণ, আনন্দগিরির শঙ্কর-বিজয়(১৭)। বামাচারীদের বর্ণনায় তিনি বলছেন ‘বামবাহুল্যাৎ’, এবং এই বামবাহুল্যের যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা কামবাহুল্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বামাচাঙ্গ বা কামাচারীর অর্থ কি? কাম শব্দটিকে আধুনিক কালে যে-অর্থে গ্রহণ করা হয় বামাচার প্রসঙ্গেও কি সেই অর্থটুকুই পর্যাপ্ত হবে?

এই কাম শব্দটিকে আজকাল আমরা যে-অর্থে বুঝি মহামহোপাধ্যায় কাপালিক-প্রসঙ্গেও সেই অর্থেই বুঝতে চান।

আজকালকার দিনে কাম নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন আমরা তাঁদের বলি কামবিজ্ঞানী বা কামশাস্ত্রজ্ঞ। বাৎসায়নের রচনা এই কথ্যেই কামশাস্ত্র। কিন্তু ওই

কাপালিক সম্প্রদায় বাৎসায়নের চেয়ে অনেক কালের পুরোনো। মহামহোপাধ্যায় তাই সিদ্ধান্ত করছেন, কাপালিকরাই হলো প্রাচীন ভারতে কামবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

কিন্তু তাহলে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্কটা কী রকম? মহামহোপাধ্যায় আবার বাহস্পত্যসূত্রম্-এর সাক্ষ্যই উদ্ধৃত করছেন: এ-বইতেই বলা হয়েছে লোকায়তিকদের মতে বার্তাই একমাত্র বিদ্যা। বার্তা মানে? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে(১৮) কথাটার সংজ্ঞা পাওয়া যায়: কৃষি পশুপাল্যে বানিজ্য চ বার্তা। অর্থাৎ, বার্তা বলতে বোঝায় কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। অবশ্যই, এখানে বাণিজ্য মানে ঠিক কী তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কেননা, কৌটিল্য ছিলেন চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লেখক এবং তখনকার কালে বাণিজ্য বলতে অন্তত আজকাল যা বোঝায় তা বোঝাতো কিনা খুবই সন্দেহের কথা। তাছাড়া, গণ বা সঙ্ঘের আলোচনা প্রসঙ্গে পরে দেখতে পাবো বার্তা শব্দের প্রধানতম অর্থ শুধু কৃষিই। সে যাই হোক, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, লোকায়তিকেরা যদি কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকেই একমাত্র বিজ্ঞান মনে করে থাকেন তাহলে মানতেই হবে এরাই ভারতবর্ষের আদি ‘ইকনোমিস্ট’ বা অর্থনীতি-বিজ্ঞানী।

এই হলো মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত: “লোকায়তিকেরা যেমন তাঁদের বস্তুবাদী দর্শনের সাহায্যে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সূত্রপাত করেছিলেন, তেমনই কাপালিকেরা,—কী ধরনের দর্শনের সাহায্যে তা অবশ্য জানা নেই,—ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কাম-বিজ্ঞানের।”

...as the Lokayata; and that as the Lokayatas, with their Materialistic Philosophy, marked the beginning of the science of Economics, so the Kapalikas, with what system

of philosophy we do not know, marked the beginning of the science of Erotics.(১৯)'

কিন্তু এই উজ্জিক্কেই তাঁর চরম সিদ্ধান্ত হিসাবে স্বীকার করতে হলে একের পর এক সমস্যা উঠবে। প্রথমত, কামশাস্ত্রপ্রণেতা স্বয়ং বাৎসায়ন(২০) লোকায়তিকদের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন; তাই লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের সম্পর্ক যদি সত্যিই গভীর হয় তাহলে কাপালিকদের আর যাই বলা যাক কামশাস্ত্রের আদি-গুরু বলা নেহাতই অসংগত হবে। আদিগুরুকে গালমন্দ করার দৃষ্টান্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে চোখে পড়ে না। কিন্তু এ-ছাড়াও মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরো মৌলিক সমালোচনা ওঠে। তিনি গুরু করলেন এই বলে যে প্রাচীন-পুঁথিপত্রে লেখা রয়েছে লোকায়ত ও কাপালিক আলাদা নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত যখন করছেন তখন বলছেন একটি সম্প্রদায় হলো অর্থনীতি-বিজ্ঞানের প্রবর্তক এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো যৌনবিজ্ঞানের প্রবর্তক। এই দুটি কথাকে যদি এক করতে হয়ে তাহলে মানতেই হবে অর্থনীতির আলোচ্য-অর্থাৎ ধন-উৎপাদন-এবং কামবিজ্ঞানের আলোচ্য-অর্থাৎ মৈথুন ও প্রজনন-অন্তত প্রাচীন যুগের চেতনা অনুসারে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলো। আমাদের আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে কথাটা নিশ্চয় হাস্যকর শোনাবে: ধন-উৎপাদনের সঙ্গে সন্তান-উৎপাদনের সম্পর্ক আবার কী? কিন্তু যে-পুঁথিপত্র নিয়ে আলোচনা তা একালের নয়, সেকালের। এবং সেকালের ধারণা যে ছবছ একালের মতোই হবে তা ভাববার কারণ নেই। বরং প্রাচীনেরা যখন বার্তা-বাদী লোকায়তিকদের সঙ্গে কামাচারী কাপালিকদের এক করতে চাইছেন তখন আধুনিক গবেষকের কাছে নিশ্চয়ই প্রধান প্রশ্ন এই হবে যে একালের ধ্যানধারণাটা যতো পৃথকই হোক না কেন, মানবজাতির ক্রমোন্নতি-পথে সত্যিই কি এমন কোনো স্তরের কথা জানা আছে যখন মানুষের ধারণায় ধন-উৎপাদনের

সঙ্গে মিথুনের ও সন্তান-উৎপাদনের অঙ্গঙ্গি সম্পর্ক ছিলো? যদি তা জানা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে: কাপালিকদের সঙ্গে বা লোকায়তিকদের সঙ্গে মানব-ইতিহাসের সে-রকম কোনো স্তরের যোগাযোগ আছে কি না?

মহামহোপাধ্যায়ের কাছে কিন্তু এ-জাতীয় কোনো প্রশ্ন ওঠবার অবকাশ ছিলো না। তার কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন, কাম বা মৈথুনকে আজকের দিনে আমরা যে-চোখে দেখি প্রাচীনেরাও ঠিক সেই চোখেই দেখতেন এবং আজকের দিনে আমরা যৌন-আচরণের উদ্দেশ্য বলতে যা বুঝি প্রাচীনেরাও ঠিক তাই বুঝতেন। ফলে কামবিষয়ে অত্যধিক উৎসাহ হয় লাম্পট্য, না হয়তো নিছক ভোগাসক্তি,—খুব বেশি সমীহ করে বললে বড়ো জোর বলা যায় কামবিজ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপনা। বস্তুত, কাপালিকদের সম্বন্ধে—তথা, সমস্ত রকম বামাচারী সম্প্রদায় সম্বন্ধেই,—আধুনিক কালে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তার মূলে প্রধানতই হলো এদের কামবাহুল্য।

আর ঠিক ওই কথাটাই ভুল। কেননা, প্রাচীনেরা কাম ও মৈথুনকে যে-চোখে দেখেছেন, এই ক্রিয়ার যে-উদ্দেশ্য কল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে আমাদের আজকালকার ধ্যানধারণার মিল হয় না। তার কারণ খুব সহজ: প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন, আধুনিক নন। তাই আধুনিক ধ্যানধারণাও তাঁদের মধ্যে থাকবার কথা নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিপত্রেই এ-কথার রাশি রাশি প্রমাণ আছে। যেহেতু পরের যুগে আস্তিকেরা, অর্থাৎ বেদপন্থীরা, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বেদনিন্দুকদের বিরুদ্ধে, বিদ্বেষ প্রচার করবার জন্যে এই কামবাহুল্যের নজিরটাকেই অতো বড়ো করে দেখিয়েছিলেন সেইহেতুই এখানে এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যের সাম্প্রতিকই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। বলাই বাহুল্য, বৈদিক সাহিত্যে ভালো কি মন্দ, সুনীতিপরায়ন কি দুর্নীতিপরায়ন—এই জাতীয় প্রশ্ন তোলা আমাদের যুক্তির পক্ষে অবাস্তব। আমরা শুধু এইটুকুই দেখাতে চাই, যৌনব্যবহার

সম্বন্ধে আধুনিক কালের ধারণা দিয়ে প্রাচীন কালের ধারণাকে বোঝবার কোনো উপায় নেই, এবং এ-বিষয়ে প্রাচীনকালের ধ্যানধারণাগুলির চিহ্ন শুধুই যে বেদনিন্দুক ও বৈদিক-ঐতিহ্য-নিন্দিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে টিকে আছে তাই নয়, এমনকি বৈদিকসাহিত্যের মধ্যেই তার অজস্র নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত, বামাচারের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের এই নিদর্শনগুলির গুরুত্বই যেন বেশি: বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে যে-কথা লেখা আছে তারই সাহায্যে কাপালিকাদির মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারের অলিখিত তাৎপর্য অনুমান করা সম্ভব হতে পারে।

১৭. আনন্দগিরি: শঙ্করবিজয়।। সপ্তদশ প্রকরণ, পৃ. ১১৫।।

১৮. অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ১:৮।

১৯. H. P. Shastri op. cit. 6.

বৈদিক সাহিত্যে বামাচার

...all understanding of primitive conditions remains impossible so long as we regard them through brothel spectacles(২১): Engels

অর্থাৎ গণিকালয়ের ঠুলি পরে আদিম অবস্থায় তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব।

আধুনিক যুগের রুচিবোধের কাছে বামাচার যে কী সাংঘাতিক বিদ্রোহ-বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে তার নিদর্শন হিসেবে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। গুহ্যসমাজ বা তথাগত গুহ্যক নামে একটি বৌদ্ধ বামাচারী পুঁথি সম্বন্ধে তিনি বলছেন, এই পুঁথিতে এমন সব মতবাদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এমন সব ক্রিয়াকর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষের জঘন্যতম প্রবৃত্তিও এর চেয়ে ঘৃণিত ও ভয়াবহ কিছুই কল্পনা করতে পারে না এবং তার পাশে গত শতাব্দীর বিলিতি বটতলা বা হলিওয়েল স্ট্রিটের অশ্লীল সাহিত্যেও একান্ত পবিত্র মনে হবে।

...theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the words and specimens of Holiwell Street literature of the last century would appear absolutely pure.(২২)

কথাগুলি নিশ্চয়ই মিথ্যে নয়। তবুও কিন্তু এ-জাতীয় মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার করা অসম্ভব। তার কারণ,

যে-নীতিবোধ ও রুচিবোধের মধ্যে এ-জাতীয় মন্তব্যের উৎস সেটা একান্তই আধুনিক কালের, আধুনিক যুগের অবদান। প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন, তাই আমাদের নীতিবোধ বা রুচিবোধের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিলো না। তাঁরা যে-সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন তা তাঁদের রুচিবোধের অনুপাতেই। তাই আমরা যদি একালের নীতিবোধ নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের দিকে চেয়ে দেখি এবং বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণায় একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠি তাহলে তাঁদের কথার প্রকৃত তাৎপর্য কিছুতেই খুঁজে পাবো না। তাঁরা ঠিক কী ভেবে এ-জাতীয় কথাবার্তা লিখেছিলেন তা জানতে হবে, এবং সে-কথা জানতে হলে অন্তত সাময়িক ভাবে আমাদের রুচিবোধকে মূলতরী রেখে ভেবে দেখতে হবে তাঁদের উদ্দেশ্যটা কী হওয়া সম্ভব।

বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের নিদর্শন নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে কথাগুলি বিশেষ করে তুলছি; কেননা, একালের ধ্যানধারণাগুলিকে সম্বল করে এগোলে বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের নিদর্শনগুলিকে অত্যন্ত বীভৎস কামবিকার ও কুৎসিৎ লাম্পট্যের নমুনা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ বৈদিক ঋষিদের কাছে কথাগুলি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। তাই একালের লাম্পট্য-ব্যবহারটার পটভূমিতে সেকালের ঋষিদের এই সব কথাবার্তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুমান করা সম্ভব।

বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের তাৎপর্য খুঁজতে হলে আজকালকার বটতলাসাহিত্য থেকে কোনোরকম মূলসূত্র পাওয়া সম্ভব নয়—এক কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রেখেই বৈদিক সাহিত্যে বামাচার ও কামাচারের নিদর্শনগুলিকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

একটি নিদর্শন: শুক্ল-যজুর্বেদ (বাজসনেয়ী সংহিতার) ২৩।১২২ থেকে ২৩।১৩১। এই দশটি বেদমন্ত্রেরই আক্ষরিক অনুবাদ দেবার দরকার নেই। আমরা শুধুমাত্র দুটি মন্ত্রের তর্জমা উদ্ধৃত করবো, কেননা, ওই দুটির মধ্যেই খুব

প্রয়োজনীয় একটি ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে—বাকি আটটি মন্ত্রে বারবার একঘেঁয়ে ভাবে, একই কথাবার্তা পাওয়া যাচ্ছে। किसের কথাবার্তা? মৈথুনের। কেবল মনে রাখবেন, এই মৈথুন-দৃশ্যে ও মৈথুন-সংলাপে যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁরা কেউই আজকালকার লম্পটের মতো লোক নন। তার বদলে পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিক: অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উদগাতা, ইত্যাদি। ২৩।।২২ এবং ২৩।।২৩: অধ্বর্যু কুমারীকে অভিমেথন করছেন—দুটি মন্ত্রে অধ্বর্যু ও কুমারীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ২৩।।২৪ এবং ২৩।।২৫: ব্রহ্মা মহিষীকে অভিমেথন করছেন—মন্ত্র দুটিতে ব্রহ্মা ও মহিষীর মধ্যে মৈথুন-সংলাপ। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের আলোচনার পক্ষে ২৩।।২৬ এবং ২৩।।২৭ সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। তাই শুধু এই দুটি বেদমন্ত্রই উদ্ধৃত করলাম।

উর্ধ্বামেনামুচ্ছাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব।

অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনান্নিব।।২৩।।২৬।।

উবটভাষ্য:—উদগাতা বাবাতাম্ অভিমেথয়তি উর্ধ্বাম্ এনাম্ কন্ চিৎ পুরুষম্ আহ। উর্ধ্বাম্ এনাম্ বাবাতাম্ উচ্ছিতাম্ কুরু। কথম্ ইব। গিরৌ ভারম্ মধ্যে নিগৃহ্য হরেৎ এবম্ মধ্যে নিগৃহ্য উর্ধ্বাম্ উচ্ছাপয়। অথ যথা ইতি এতস্য স্থানে। অথাচ উচ্ছাপয় যথা অস্যা বাবাতায়া মধ্যম্ যোনিপ্রদেশঃ এধতাম্। ‘এধ বৃদ্ধৌ’ বৃদ্ধিম্ যায়াৎ অথ এনাম্ গৃহীয়াৎ। শীতে বাতে পুনন্ ইব। যথা কৃষীবলঃ ধান্যম্ বাতে শুদ্ধম্ কুবর্ন গ্রহণমোক্ষৌ ঋটিতি করোতি।

উর্ধ্বামেনামুচ্ছয়োতাদিগিরৌ ভারং হরন্নিব।

অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনর্নিব।।২৩.২৭।।

উবটভাষ্য:-বাবাতা প্রত্যাহ উদগাতারম্। ভবতঃ অপি এতৎ এবম্।
উর্ধ্বম্ এনম্। উদগাতারম্ উচ্ছয়তাম্ উচ্ছাপয়। অত্র স্ত্রী পুরুষায়তে।
গিরৌ ভাবম্ হরন্ ইব। অথ এবম্ ক্রিয়মাণস্য অস্য মধ্যম প্রজননম্
এজতু চলতু। অথ এনম্ নিগ্হীব শীতে বাতে পুনন্ ইব যবান্।

২৩।।২৬: এই স্ত্রীকে উর্ধ্ব তুলিয়া ধরো। পর্বতে যেমন করিয়া তার
উত্তোলন করে। অনন্তর ইহার মধ্যদেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। বায়ুকে শুদ্ধ
করিতে করিতে...

উবট: উদগাতা বাবাতাকে অভিমেখন করিলেন। কোনো পুরুষকে
বলিলেন, এই বাবাতাকে উর্ধ্ব তুলিয়া উপ্তিত করো। কেমন করিয়া?
পর্বতে ভারবস্তুকে মধ্যস্থানে ধরিয়া যেমন ভাবে উত্তোলন করা হয় তেমনি
ইহাকে মধ্যে ধরিয়া উত্তোলন করো। যেমন কৃষক বায়ুতে ধান্য শুদ্ধ
করিতে করিতে ঝাটিতে গ্রহণ করে ও বপন করে...

২৩।।২৭: উর্ধ্ব এই পুরুষকে তুলিয়া ধরো। যেমন করিয়া পর্বতে
ভারবস্তুকে উত্তোলন করা হয়। অনন্তর ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক।
শীতল বায়ুতে যব শস্য শুদ্ধ করিতে করিতে...

উবট: প্রত্যুত্তরে বাবাতা উদগাতাকে বলিল, তোমা কর্তৃকও এই রকমই
করা হউক। এই পুরুষকে, অর্থাৎ উদগাতাকে, উর্ধ্ব তুলিয়া ধরো।
এইখানে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় আচরণ করিতেছে। পর্বতে যেমন করিয়া
ভার তোলে। অনন্তর এইরূপ ক্রিয়মান ইহার মধ্যপ্রদেশ চলিতে থাকুক,
অর্থাৎ মৈথুন চলিতে থাকুক। অনন্তর ইহাকে চালিয়া ধরো। যেমন কৃষক
শীতল বায়ুতে যব শুদ্ধ করিতে করিতে ঝাটিতে গ্রহণ এবং বপন করে

...

উদ্ধৃত অংশের বিশেষ করে একটি বিষয়ের দিকে নজর রাখা দরকার: মৈথুন-সংলাপের মধ্যে কী ভাবে ক্ষেত্রে বীজ বপনের কথাটা এলো! তাহলে বামাচারের সঙ্গে বার্তা-বিদ্যার সংযোগটা মনে হচ্ছে শুধুমাত্র কাপালিক-লোকায়তিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, খোদ বৈদিক ঐতিহ্যের যেন একই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

এ-আলোচনায় পরে ফেরা যাবে।

আপাতত, বড়ো সমস্যাটাই দেখা যাক। সমস্যা হলো: যজুর্বেদে পরের পর দশ দশটি এই রকম মন্ত্র আছে, এবং আধুনিক কোনো পণ্ডিতই বলতে পারছেন না যে উত্তরযুগের লম্পটেরা এগুলি রচনা করে বেদের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। অর্থাৎ, রচনাটি খোদ বৈদিক ঋষিদেরই।

অবশ্যই, পরের যুগের বেদপঞ্জীরা এই মন্ত্রগুলি নিয়ে খুবই বিপদে পড়েছেন। তার কারণ, তাঁদের উত্তরযুগের রুচির সঙ্গে এগুলি কিছুতেই খাপ খায় না। তাই পরের যুগে এমনকি বিধান দেওয়া হয়েছে, এই বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করবার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে(২৩)। প্রায়শ্চিত্তবিধানের মূলে নিশ্চয়ই পাপ-বোধ। অথচ, পুরাকালের বৈদিক ঋষিরা যদি সত্যিই একে পাপাচরণ মনে করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তার জন্য পাঁচ-পাঁচজন যজ্ঞীয় ঋত্বিককে নিয়োগ করতে চাইতেন না। তাই তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই যে একটি বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ সে-বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত, বেদের ছাত্রমাত্রই জানেন এই মন্ত্রগুলির সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

কিন্তু মৈথুনের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের সম্বন্ধ আবার কী? ঠিক কী সম্পর্ক এ-কথার জবাব এখনি দেওয়া যাবে না। কেননা, যজ্ঞ বলে ব্যাপারটির আসল তাৎপর্য নিয়েই প্রচুর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আপাতত, আমরা শুধু

এইটুকুই বলতে চাইছি যে যজ্ঞ মানে যাই হোক না কেন, অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রাচীরের মৈথুনকেও সরাসরি যজ্ঞের মতোই মনে করেছিলেন।

এ-কথার প্রমাণ রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একেবারে শেষের দিকে:

স হ প্রজাপতিরীক্ষাংচক্রে হস্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পযানীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজে
তাং সৃষ্টাহু উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন
এব সমুদপারয়তে নৈনামভ্যসৃজৎ ॥৬।৪।২।।

তস্যা বেদিরূপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিববণে সমিদ্বো মধ্যতন্তৌ মুক্কৌ স
যাচান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো
ভবতি য এবৎ বিদ্বানধোপহাসংচরতাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙক্তেহথ য
ইদমবিদ্বানধোপহাসংচরতস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥৬।৪।৩।।

প্রজাপতি মনে-মনে চিন্তা করলেন, 'এসো আমি এর জন্যে একটি প্রতিষ্ঠা
সৃষ্টি করি। তিনি স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। তাকে সৃষ্টি করে তিনি তার
অধোদেশে মিলিত হলেন (উপাস্ত=মিলিত হলেন। মনিয়ার উইলিয়মস-
এর অভিধান দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে স্ত্রীর অধোদেশে মিলিয়ে হওয়া উচিত
(উপাসীত)। তিনি নিজের উর্ধ্বাখিত গ্রাবাণকে (আক্ষরিক অর্থে গ্রাবাণ
যদিও সোমরস নিষ্কাশনের শিলাখণ্ড, তবুও এখানে শব্দটি স্পষ্টই শিশ্ন-
ব্যঞ্জক) প্রসারিত করে দিলেন। তার দ্বারা তিনি তাকে গর্ভবতী
করলেন ॥৬।৪।২।।

তার (অর্থাৎ স্ত্রীলকটির) উপস্থ (=নিম্নাঙ্গ) বেদি (যজ্ঞবেদী); তার লোম
(=চুল) যজ্ঞতৃণ; তার চর্ম অধিববন (=সোমরস নিষ্কাশনের যন্ত্র); তার
মুক্কদ্বয় (=the two labia of the vulva: রাধাকৃষ্ণণ ও হিউমের তর্জমা
দ্রষ্টব্য) মধ্যস্থ অগ্নি। বাজপেয়-যজ্ঞকারীর কাছে জগৎ যতো বৃহৎ, এই
(তত্ত্ব) জেনে যে মৈথুন করে তার কাছেও জগৎ ততো বৃহৎ। যে স্ত্রী দ্বারা

নিজে শক্তিমান হয়। যে এ (তত্ত্ব) না জেনে মৈথুন করে স্ত্রী তার সুকৃতকে
...।।৬।৪।৩।। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরকম প্রকট বামাচারী চিন্তা যদি উপনিষদের মধ্যে মাত্র একবারই উঁকি
দিতো তাহলে না হয় আধুনিক পণ্ডিতদের পক্ষে একে দেখেও না দেখার ভাবটা
অতোখানি দোষাবহ হতো না। কিন্তু উদ্বৃত অংশের মূল কথাটি শুধুমাত্র উদ্বৃত
অংশটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, অন্যত্রও তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন:

যোযা বাব গৌতম্নিস্তস্য উপস্থ এব সমিধ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধুমো
যোনির্চর্ষিদন্তঃ করোতি তেহঙ্গারা অভিনন্দা বিস্কুলিঙ্গাঃ।।৫।৮।১।।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আল্পতের্গর্ভঃ
সম্ভবতি।।৫।৮।২।।

অর্থাৎ, হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি। তার উপস্থই হলো
সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশ-ক্রিয়াই
হলো অঙ্গার। রতिसম্ভোগই হলো বিস্কুলিঙ্গ।।৫।৮।১।।

এই অগ্নিতে দেবতারা রেতর আল্পতি দেন। সেই আল্পতি থেকেই গর্ভ
সম্ভব হয়।।৫।৮।২।।

আবার বৃহদারণ্যকেও হুবহু এই কথাই দেখতে পাওয়া যায়:

যোযা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধুমো যোনির্চর্ষিদন্তঃ
করোতি করোতি তেহঙ্গারা অভিনন্দা বিস্কুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগৌ দেবা
রেতো জুহ্বতি তস্যা আল্পতৈঃ পুরুষঃ সংভবতি...।।৬।২।১৩।।

তর্জমা আগের উদ্ধৃতিটির অনুরূপ হবে।

তাহলে, উপনিষদের ঋষি মৈথুন-ক্রিয়াকে খোলাখুলি ভাবেই যজ্ঞ বলে উল্লেখ করছেন। কথায় কথায় সোমযাগ থেকে উপমা নেবার চেষ্টাটাও লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের আধুনিক রুচিতে এ-সব কথাবার্তা যতোই কদর্য লাগুক না কেন, উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্বটির প্রতিই যে কতোখানি গুরুত্ব দিতে চান তার পরিচয় পাওয়া যায় নানান দিক থেকে। বৃহদারণ্যকে উক্ত তত্ত্ব বলবার পরই ঋষি তিনজন প্রাচীন জ্ঞানীর নজির দেখাচ্ছেন: বিদ্বান উদালক আরুণি, বিদ্বান নাক মৌদগল্য, বিদ্বান কুমারহারিত—তিনজন বিদ্বানই নাকি এই তত্ত্ব জানতেন এবং সেই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন এবং এই প্রসঙ্গেই এগিয়ে বৃহদারণ্যকের ঋষি বলছেন:

...বৃদাদক আত্মানং পশ্যেত্তদতিমন্ত্রয়েত ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিনং
সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এবাং স্ত্রীপাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্নলোদ্বাসসং
যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥৬।৪।৬।।

সা চেদস্মৈ ন দত্তাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দস্যাৎ
কামমেনাং যষ্টা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ
আদদ ইত্যশা এব ভবতি ॥৬।৪।৭।।

...কেউ যদি নিজেকে জলে দেখে তাহলে জপ করবে, ‘আমাতে তেজ,
ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, যশ, ধন, সুকৃত (আসুক)’।

এই হলো স্ত্রীলোকের মধ্যে শ্রী, যখন সে মলোদ্বাসা হয় (মল+উৎবাসাঃ,
খুব সম্ভব, ঋতুর পর মলবস্ত্র ত্যাগ করবার উল্লেখ করা হচ্ছে)। অতএব
মলোদ্বাসা যশস্বিনী স্ত্রীলোকের নিকট গমন করে তাকে আহ্বান
করবে ॥৬।৪।৬।।

সে (স্ত্রীলোকটি) যদি তাকে কাম দিতে রাজী না হয় তাহলে তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) নিজ বসে আনয়ন করবে। সে (স্ত্রীলোকটি) যদি তাকে (পুরুষকে) কাম দিতে রাজী না হয় তাহলে তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) লাঠি দিয়ে বা হাত দিয়ে প্রহার করে অভিভূত করে বলবে, ‘আমার ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা, আমার যশদ্বারা তোমার যশকে কেড়ে নিচ্ছি’ । এই ভাবে সে (স্ত্রীলোকটি) যশহীনা হয়।।৬।৪।৭।। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে এ-ধরনের উপদেশ দিতে গেলে আমরা ঋষির গৌরব পাবার বদলে নিজেরাই লাঠিপেটা বা কিলচড় খাবো। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদের লেখক মেয়েদের লাঠি-পিটে, কিলচড় লাগিয়ে কামভাব চরিতার্থ করিতে দিতে বাধ্য করবার উপদেশ দিয়েও মারধোর খেয়েছিলেন বলে কোথাও লেখা নেই। বরং তাঁর বইকে প্রাচীনেরা জ্ঞানের আকর বলেই মনে করছেন।

আর, এই থেকে কি প্রমাণ হয় যে মৈথুন ও কাম সম্বন্ধে আমাদের আজকের দিনের যা-ধারণা তার সঙ্গে সেকালের মানুষদের ধারণার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত?

তফাত যে হয়েছিলো এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো রকম অবকাশই নেই। কেননা, মহাভারতের যুগে দেখা যায় এ-বিষয়ে পুরোনো কালের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নতুন কালের ধ্যানধারণাগুলো আর মিল খাচ্ছে না। আদিপর্বের ১২২ অধ্যায় দেখুন(২৪):

পূর্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণপূর্বক কহিলেন, আইস

আমরা যাই! ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্বক ('বলাৎ ইব') লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্বলক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস ক্রোধ করিও না, ইহা নিত্যধর্ম। (এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ ১১।১২২।১৪।)। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যা ত পূর্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিনী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ক্রণহত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। (কালিপ্রসন্ন সিংহের তর্জমা)

যৌনজীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা যে একটি বিশেষ যুগেই বদলেছে—আগে একরকম ছিলো, পরে অন্যরকম হলো—এ-কথার এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হবে? সেই যুগ বলতে ঠিক কোন যুগ,—কোন যুগ থেকে কামজীবন সম্বন্ধে আধুনিক ধ্যানধারণার শুরু,—এ-প্রশ্ন অবশ্যই স্বতন্ত্র।

আমাদের কাছে এখানে প্রধান সমস্যা হলো, সেকালের ধারণাটা ঠিক কী রকম? কোন রকম ধারণার বশবর্তী হলে পরে বৈদিক ঋষিদের পক্ষে কামজীবনকে অতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, অতোখানি উদ্দেশ্যমূলক, মনে করা সম্ভবপর? এ-প্রশ্নের পুরো জবাবটা অবশ্যই শুধুমাত্র বৈদিক সাহিত্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। অন্য কোন দিক থেকে জবাবটা পাবার সম্ভাবনা সে-কথায় একটু পরে ফেরা যাবে। কিন্তু, যেটা খুবই বিস্ময়ের কথা, এ-বিষয়ে বৈদিক সাহিত্য আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করে না। উপনিষদ এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির কাছ থেকেই প্রশ্নটার অন্তত আংশিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে।

উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় ছান্দোগ্য-উপনিষদের বামদেব্য ব্রতের কথা। ‘বামদেব্য’ নামটার দিকে নজর রাখবেন। বৈদিক সাহিত্যেও বামাচারের স্মারক রয়েছে তার একটি স্পষ্ট নিদর্শন ওই নামের মধ্যেই।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে লেখা আছে:

উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো ঙ্গপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদগীথঃ
প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি
তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥২ ১৩ ১ ॥

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাং
প্রজায়তে সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্
কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্ ॥২ ১৩ ২ ॥

আহ্বান করে, সেই হলো হিঙ্কার। প্রস্তাব করে, সেই হলো প্রস্তাব। স্ত্রী
সঙ্গে সে শয়ন করে, সেই হলো উদগীথ। স্ত্রীর অভিমুখ হয়ে শয়ন করে,
সেই হলো প্রতিহার। সময় অতিবাহিত হয়, তাই নিধন। এই বামদেব্য
নামক সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত ॥২ ১৩ ১ ॥

যে এইভাবে বামদেব্য সামকে মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বলে যে জানে সে মিথুনে
মিলিত হয়। (তার) প্রত্যেক মিথুন থেকেই সন্তান উৎপন্ন হয়। সে
পূর্ণজীবী হয়। সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই
পরিহার করবে না-এই-ই ব্রত ॥২ ১৩ ২ ॥

“মিথুনাং মিথুনাং প্রজায়তে সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি জ্যোক্ জীবতি মহান্
প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা” –এই হলো আসল কথা।

মিথুন থেকে কী কী পাওয়া যাবে তার ফর্দ দেখুন:

সন্তান পাওয়া যাবে।

পূর্ণ জীবন পাওয়া যাবে।

পশু পাওয়া যাবে।

মহান্ কীর্তির নামডাক পাওয়া যাবে।

এখানে বিশেষ করে দে-দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি তা হলো, উপনিষদের ঋষি মৈথুনকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনেরই উপায় মনে করছেন না, সেই সঙ্গেই ধনউৎপাদনের উপায় বলেও বর্ণনা করছেন। উপনিষদের যুগেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা অনেকখানিই পশুপালনমূলক; তাই ধনউৎপাদন বলতে প্রধানতই পশুবৃদ্ধি।

আর এই ধারণার দরুনই মিথুনকে এতোখানি জরুরী বলে মনে করা হচ্ছে যে ঋষি মিথুনের বিভিন্ন স্তরকে হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার প্রভৃতি পঞ্চবিধ সামগানের সঙ্গে এক বলে বর্ণনা করছেন। শুধু তাই নয়, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, “ন কাঞ্চন (=কাম্+চন=কোনো স্ত্রীলোককে) পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম ” –কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না, তাহা-ই ব্রত।

তাহলে প্রাচীনদের মনে মিথুন সম্বন্ধে ধারণাটা ঠিক আমাদের মতো নয়।

আমাদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায়? সন্তান।

ঋষিদের ধারণায় মিথুন থেকে কী পাওয়া যায়? শুধু সন্তান নয়, ধনসম্পদও।

আমাদের ধারণায় সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে ধনসম্পদ উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের ধারণায়, ধনসম্পদ উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন-দু’ -এর মধ্যে সম্পর্ক বড়ো গভীর।

এখন, আমাদের ধারণাটা ঠিক না তাঁদের ধারণাটা ঠিক, এ-নিয়ে তর্ক তোলবার দরকার নেই। অবশ্যই, এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা তাঁদের চেয়ে অনেক

স্পষ্ট, অনেক নির্ভুল। তার তুলনায়, তাঁদের ধারণাটার প্রায় পনেরো আনাই কল্পনা। কিন্তু যেটা আসলে ঢের বড়ো কথা, তাঁদের যুগে তাঁদের মনে এই রকমের একটা কল্পনা সত্যিই ছিলো, ছিলো ওই রকমের একটা ভুল ধারণা। তাই তাঁদের লেখা পুঁথিপত্র আমরা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একালের ধ্যান-ধারণাগুলিকে তাঁদের লেখার উপর আরোপ করে বসলে প্রকাণ্ড ভুল হবে—ঠিক কী ভেবে তাঁরা কী লিখেছিলেন সে-কথা আমরা বুঝতেই পারবো না।

তাঁদের মনে যে সত্যিই ওই রকমের একটা ধারণা ছিলো এ-কথার প্রমাণ শুধুই উপনিষদ নয়, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিও। বরং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে এই কথা এতোবার এবং এতো স্পষ্টভাবে তাঁরা লিখে রেখেছেন যে সেদিকে চোখ না পড়াটাই বিস্ময়কর। স্থানসংকুলানের খাতিরে আমরা এখানে মাত্র একটি নমুনার উল্লেখ করতে পারবো; উৎসাহী পাঠক পাদটীকায় অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাবেন(২৫)। আমাদের এই দৃষ্টান্তটি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকা প্রথম অধ্যায় থেকে সংগৃহীত, তর্জমা শঙ্কর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর(২৬):

যে যজমান আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত মনে করে সে ঘৃতপক্ক চরু নির্বাপন করিবে। (অপ্রতিষ্ঠিত অর্থ, পুত্রাদিরহিত ও গবাদিরহিত)।

হে বৎস, যে এইরূপ প্রতিষ্ঠারহিত সে ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত (শ্লাঘ্য) হয় না। (ঘৃতচরুর দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয়।)

তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ক চরুতে) যে ঘৃত আছে তাহা স্ত্রীর পয়ঃ (শোনিতস্বরূপ) আর যে তণ্ডুল আছে তাহা পুরুষের (রেতঃ স্বরূপ); সেই ঘৃততণ্ডুল মিথুন সদৃশ; সেই জন্য এই মিথুনদ্বারাই (ঘৃততণ্ডুলময় চরুপ্রদানদ্বারা) ইহাকে (যজমানকে) সন্ততিদ্বারা ও পশুদ্বারা বর্ধিত করা হয়। (সেই হেতু এই চরু) প্রতিষ্ঠারই হেতু।

এখানেও সেই একই ধারণা: মিথুন থেকে শুধুই যে সন্তান পাওয়া যাবে তাই নয়, ধনসম্পদও। মনে রাখবেন, সে-যুগে ধনসম্পদ বলতে প্রধানত পশুই। তাহলে সে-যুগের যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের ধারণায় ধনউৎপাদন আর প্রজনন এমন কিছু আলাদা ব্যাপার নয়। মিথুন থেকে শুধু সন্তান পাবার আশা নয়, পশুদ্বারা বর্ধিত হবার আশাও। আর এই কথায় যদি বিশ্বাস অটুট হয় তাহলে তাঁরা স্বভাবতই উপদেশ দেবেন: ‘ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্’, কোনো স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করবে না-তাই-ই ব্রত।

আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা বেদ-উপনিষদে এ-ধরনের কথা লেখা আছে দেখে বিলক্ষণ বিরক্তিবোধ করতে পারেন। তার কারণ, এ-ধরনের কথা বলবার পিছনে যেটা হলো নিছক আধুনিক যুগের উদ্দেশ্য সেটাকেই তাঁরা একমাত্র উৎসাহ মনে করেন। আর যদি তাই হয় তাহলে বেদ-উপনিষদের লেখকদের মধ্যে অত্যন্ত স্কুল আর কদর্য মনোবৃত্তি কল্পনা না করে উপায় থাকে না। কিন্তু তাই বা কী করে বলা যায়? হাজার হোক, তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি! ক্রমে আধুনিক পণ্ডিতদের পক্ষে একমাত্র উপায় হলো ঋষিদের এই জাতীয় কথাবার্তাগুলিকে চেপে যাওয়া। আমরা বলতে চাই, ওই পদ্ধতিটাই ভুল। কেননা, প্রাচীনেরা কী ভেবে কী লিখেছেন তা ঠিকমতো বুঝতে হলে সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার যে প্রাচীনেরা ছিলেন প্রাচীন-তাই একালের ধ্যানধারণাগুলি তাঁদের মধ্যে কল্পনা করাটাই অসঙ্গত ও যুক্তিহীন।

২১. F. Engels OFPPS 61.

২২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: বৌদ্ধধর্ম ৮২।

২৩. M. N. Dutta RVS 801n.

২৪. মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ১০৯।

২৫. SBE 12:194, 257sq.,...

২৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ৬-৭।

সন্তান উৎপাদন আর ধন-উৎপাদন

লোকায়তিকদের কথায় ফিরে আসা যাক। কাপালিকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্যা উঠেছিলো বৈদিক সাহিত্যের নজির থেকেই তার যেন একটা কিনারা পাওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতি বলছেন, লোকায়ত আর কাপালিক দু’-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শুধু বৃহস্পতিই নন, গুণরত্নের লেখা বইতেও এই কথাই। এদিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখছেন, লোকায়ত হলো অর্থসাধনশাস্ত্র-আধুনিক ভাষায় ধনউৎপাদনের শাস্ত্র, সায়েন্স অব ইকনোমিক্স। অপর পক্ষে, কাপালিক হলো কামসাধনশাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায়ের ভাষায় সায়েন্স অব ইরোটিক্স।

অবশ্যই, আমাদের আধুনিক ধারণা অনুসারে ইকনোমিক্স-এর সঙ্গে ইরোটিক্স-এর-ধনউৎপাদনের সঙ্গে কামসাধনের-কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি তা না থাকে তাহলে সেকালের পুঁথিপত্রে লোকায়তিকদের সঙ্গে কাপালিকদের অভেদ-সূচক যে-সব কথাবার্তা সেগুলির তাৎপর্য খোঁজবার কোনো মানে হয় না। মহামহোপাধ্যায়ের নিজের লেখার মধ্যে এই রকমেরই একটা পরাজয় স্বীকার করার ইঙ্গিত থেকে গিয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, প্রাচীনদের মত অনুসারে লোকায়ত ও কাপালিক আলাদা নয়। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, লোকায়তিকেরা ছিলেন অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, কাপালিকেরা কামশাস্ত্রের: কিন্তু দু’-এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তিনি কোনো কথাই তুললেন না। অথচ তা যদি না তোলা হয় তাহলে লোকায়ত আর কাপালিক যে কী করে এক হলো সে-সমস্যার সমাধান চেবার চেষ্টাই করা হলো না।

অথচ, আমরা দেখলাম বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা এ-সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। কেননা, বৈদিক সাহিত্য থেকে অন্তত এটুকু বোঝা গেলো যে আজকালকার দিনে ধনউৎপাদন ও সন্তানউৎপাদনকে আমরা

যতোখানিই সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন চেষ্টা মনে করি না কেন প্রাচীনকালের কোনো একটা যুগের মানুষ তা মনে করতো না। আর তাহলে কি এমনটা হতে পারে না যে, যে-কালের বা যে-স্তরের ধ্যানধারণার স্মারক বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে টিকে রয়েছে সেই-স্তরের চেতনা থেকেই লোকায়ত ও কাপালিক মতের উৎপত্তি? সকলেই বলছেন, লোকায়তিকদের মতে অর্থ ও কামই হলো পরম-পুরুষার্থ; কিন্তু এমন কথা তো কেউই বলছেন না যে মানব-চেতনার একটি পুরানো স্তরে যেহেতু অর্থসাধন ও কামসাধন স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা নয় সেই হেতু এমনটা হওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব নয় যে, সেই স্তরের চেতনাই লোকায়তিকদের মধ্যে প্রতিফলিত—তাদের কাছে হয়তো অর্থ ও কাম স্বতন্ত্র পুরুষার্থ নয়, একই পুরুষার্থের যেন এপিঠ-ওপিঠ।

অবশ্যই মানি, বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের বা কামাচারের স্মারককে সূত্র হিসেবে অবলম্বন করে লোকায়তিকদের কথা বোঝবার চেষ্টা করলে রাশি রাশি প্রশ্ন উঠবে। কেননা, বেদনিন্দুক বা নাস্তিক বলেই যাদের প্রধান পরিচয় বেদমন্ত্রের সাহায্যে তাদের কথা বুঝতে পারবার দাবিটা সরাসরি অসম্ভব মনে হবারই কথা। বিশেষত, আর্ষ-অনার্য মতবাদ রয়েছে—পণ্ডিত মহলে অনেকেরই ধারণা বৈদিক সাহিত্যে যে রকম বিশুদ্ধ আর্ষ-সাহিত্য বামাচারাদি তেমনিই বিশুদ্ধ অনার্য-ব্যাপার। তাই, এই সাহায্যে ওকে বোঝবার চেষ্টা একান্তই অসম্ভব।

আমরা কিন্তু বলতে চাই, তা নয়। শুধুই যে কিছুকিছু বেদমন্ত্রের সাহায্যে বেদনিন্দুকদের কথা বুঝতে পারা যায় তাই নয়, বেদনিন্দুকদের কিছুকিছু কথা বিচার করেও বৈদিক সাহিত্যকে বোঝবার অবকাশ রয়েছে। তার কারণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদেই আলোচনা করেছি: বৈদিক বা অ-বৈদিক যে-কোনো ধ্যানধারণাই হোক না কেন, প্রত্যেকটিরই উৎসে রয়েছে সমাজ-বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের কথা। এবং সমাজ-বিকাশের যে পর্যায়টির মধ্যে লোকায়তিক চেতনার উৎস বৈদিক মানুষেরাও এককালে সেই পর্যায়েই বাস করতেন, ফলে

তাঁদের রচনায় সেই পর্যায়ের স্মারক টিকে থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। তাই, উত্তরকালে বেদপন্থী ও বেদনিন্দুকদের মতাদর্শে যতোই প্রভেদ দেখা দিক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের স্মারকের সাহায্যেই ওই বেদনিন্দুকদের কিছুকিছু কথা বুঝতে পারার সম্ভাবনা সত্যিই রয়েছে। অবশ্যই এ-কথা বলতে গেলে বিদগ্ধ সমাজে যে-মতবাদ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে—অর্থাৎ আর্ষ-অনার্য বা আর্ষ-দ্রাবিড় মতবাদ—তার সংকীর্ণতা ঠিক কোথায় সে-প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা তোলা দরকার। কিন্তু শুরুতেই যদি এতো রকম সমস্যার জোটে জড়িয়ে পড়তে হয় তাহলে আর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই, আপাতত শুধু বামাচার বা কামাচারের কথাটা আরো একটু তলিয়ে দেখা যাক।

কথা হলো, কোনো এক যুগে,—কিংবা আরো সাবধানে বললে বলা উচিত মানব সমাজের ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে,—সন্তান উৎপাদন ও ধন-উৎপাদনকে মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি ক্রিয়া বলে চিনতে শেখে নি। সে-যুগটা যাই হোক না কেন, সে-পর্যায়টা যাই হোক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্যকে যদি আপনি গুরুত্ব দিতে রাজী হন তাহলে আপনাকে মানতেই হবে যে, বৈদিক মানুষেরাই এককালে ক্রমোন্নতির এ-রকম একটা পর্যায়ে বেঁচে ছিলো। তারই রাশি রাশি স্মারক রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। এ-কথা যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনাকে বলতে হবে মৈথুন নিয়ে অমন প্রচণ্ড উৎসাহটা বৈদিক ঋষিদের পক্ষে অতি কদর্য কামবিকারেরই পরিচয়। আমরা আপনার কথায় সায় দিতে পারবো না। কেননা, আমরা দেখছি বৈদিক রচনায় যেখানে কামাচারের কথা সেখানে রসালো অশ্লীলতা উপভোগ করবার কোনো রকম লক্ষণই নেই। বরং এই বামাচার যে তাঁদের কাছে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন একে যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করে, সামগানের সঙ্গে তুলনা করে। যজ্ঞ ও সামগানের সঙ্গে তুলনা করে। যজ্ঞ ও সামগান সম্বন্ধে আজকের

দিনে আমরা যতো হালকা কথাবার্তাই বলতে শিখি না কেন, তাঁদের কাছে এগুলিই ছিলো জীবনের সর্বস্ব।

বেদে লেখা আছে,—কথাটা তাই মানতেই হবে। মানতেই হবে, ক্রমোন্নতির কোনো এক পর্যায়ে মানুষ সত্যিই মনে করেছিলো, মিথুনের দরুন শুধু সন্তান উৎপাদনই নয়, ধন উৎপাদনও সম্ভবপর। তাই, সমস্যা হলো: এ-পর্যায় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে কোথা থেকে?

একবার উল্টো দিক থেকে চেষ্টা করা যাক। বেদনিন্দুকদের কথা বোঝবার আশায় বৈদিক সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া গিয়েছে। এবার দেখা যাক বৈদিক সাহিত্যে বামাচারে ওই স্মারকগুলি মানব চেতনার ঠিক কোন স্তরের পরিচায়ক সে-কথা বোঝবার ব্যাপারে বেদনিন্দুকদের দিক থেকে এগোলে কি কোনো সুবিধে হতে পারে?

গুণরত্নের কথা বলেছি। লোকায়ত-সংক্রান্ত তাঁর কিছুকিছু মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: লোকায়তিকেরা যোগী, তারা গায়ে ভস্ম মাখে, তারা বামাচারী, তারা কাপালিক। গুণরত্ন কিন্তু লোকায়তিকদের সম্বন্ধেই আরো কিছু কথা বলেছেন, মহামহোপাধ্যায় তার উল্লেখ করেন নি।

গুণরত্ন বলেছেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে লোকায়তিকেরা একত্র সমবেত হয়। তারা একত্রে মিলিত হয় এবং প্রমত্ত হয় নির্বিচার মৈথুনে।

বর্ষে বর্ষে কস্মিন যপি দিবসে সর্বে সংভূত যথানাম নির্গমম্ স্ত্রীতিঃ

অভিরম্যন্তে(২৭)...

বলাই বাহুল্য, লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এই সংবাদটি দেবার পিছনেও গুণরত্নের আসল উদ্দেশ্যটা হলো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা। কিন্তু তা হোক। তবুও গুণরত্ন লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এই যে খবরটি দিলেন এর জন্যে

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক ছাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। কেননা, এটুকু সংবাদে মধ্য শুধুই যে লোকায়তিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস সম্বন্ধে মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া গেলো তাই নয়, বামাচাঙ্গ ক্রিয়াকাণ্ডগুলি মানব সমাজের ঠিক কোন স্তরের পরিচায়ক সে-কথা অনুমান করবারও একটি সুযোগ পাওয়া গেলো।

গুণরত্নের দেওয়া এই তথ্যটি সম্বন্ধে ভালো করে ভেবে দেখুন। ব্যাপারটা কী? মানুষগুলো এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, একত্রে পানাহার করছে, প্রমত্ত হয়ে উঠছে অব্যবহিত মৈথুনে! একে কি কোন একরকম দলগত কামবিকার বলতে হবে নাকি? এখানেও সেই একই কথা। শুধুমাত্র একালের লাম্পট্য-ব্যবহারকে সম্বল করলে সেকালের আচরণকে বুঝতে পারা যাবে না।

তাহলে? বুঝতে পারবার আশায় কোন পথ ধরে এগোবো?

ভেবে দেখতে হবে, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজ যে-সব পেছিয়ে-পড়া মানুষের দল টিকে রয়েছে তাদের মধ্যে এ-ধরনের আচরণ সত্যিই দেখতে পাওয়া যায় কি না। যদি সত্যিই দেখতে পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন তুলতে হবে, ঠিক কী ভেবে তারা এ-ধরনের আচরণ করছে? তাদের চেতনাতোও কি এ-আচরণ শুধু লাম্পট্য, না, এরই সাহায্যে তারা কোনো রকম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করছে? হয়তো তাদের সে-চেষ্টাটা শুধুই কল্পনা, বাস্তব তথ্যের দিক থেকে হয়তো তার পুরোটাই ভুল। তবুও আসল প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হলো, তাদের ধারণাটা ঠিক কী? সে-ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণার মিল আছে কি?

প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির যে-সব কথার কোনো রকম মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এইদিক থেকে এগোলে হয়তো তার মানে পাওয়া যেতে পারে। তার কারণ, পুঁথিগুলি প্রাচীন বলেই সেগুলির মধ্যে ওই পিছিয়ে-পড়া সমাজের মানুষদের চেতনার রেশ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তাহলে প্রাচীন পুঁথির অর্থ অন্বেষণ করবার সময় শুধুমাত্র পুঁথির রাজ্যে আবদ্ধ থাকলেই চলবে না। পুঁথির রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে এই বাস্তব পৃথিবীতে—যে-পৃথিবীতে সব মানুষের সমান উন্নতি হয় নি, কেউ বা এগিয়ে গিয়েছে, উঠে এসেছে সভ্যতার হিমাদ্রিশিখরে, তাদের চেতনা থেকে অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়েছে নিজেদের অসভ্য অতীতের স্মৃতি; আর তাই, যারা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে তাদের দিকে নজর করলে—ভালো করে নজর করলে—সভ্য মানুষদের এই ভুলে যাওয়া অতীতকে খুঁজে পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না। আর এইদিক থেকে আলো পেয়েই আমরা হয়তো দেখতে পাবো আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষেরা ঠিক কী ভেবে, কোন ধারণায় বিশ্বাস করে ওই জাতীয় কথাবার্তা লিখে গিয়েছেন।

কথাটা বিশেষ করে তুললাম, বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের চিহ্নগুলি বোঝবার প্রসঙ্গে। কিন্তু, বৈদিক সাহিত্যে আদিম চিন্তার স্বাক্ষর বলতে শুধু ওই বামাচার নয়। আরো নানা রকম চিহ্ন আছে। সেগুলিকেও বুঝতে হবে। তাই, কোন পদ্ধতিতে বোঝা সম্ভব এ-বিষয়েও একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে। আপাতত বামাচারী চেতনার উৎস নিয়েই অনুসন্ধান চালানো যাক। এ-অনুসন্ধান যদি সফল হয় তাহলে নিশ্চয়ই আশা করা ভুল হবে না যে, যে-পদ্ধতির অনুসরণে তা সফল হলো তারই সাহায্যে বৈদিক সাহিত্যে টিকে থাকা আদিম ধ্যানধারণার অন্যান্য চিহ্নই বুঝতে পারা যাবে। শুধু তাই নয়, মানবজাতির ক্রমোন্নতি-পথের ঠিক কোন স্তরের চেতনায় লোকায়তিক-বামাচারের উৎস সে-কথা নির্ণয় করা যদি সম্ভব হয় তাহলে হয়তো তারই সাহায্যে অনুমান করা যাবে, বৈদিক সাহিত্যের বামাচারের স্মারকগুলিও ঠিক কোন ধরনের সমাজবিকাশের পরিচায়ক। অর্থাৎ কিনা, বামাচারের ওই স্মারকগুলিই হয়ে দাঁড়াতে পারে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংগঠনের সাক্ষ্য। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে, বৈদিক বামাচার ও লোকায়তিক বামাচার ছবছ একই রকমের। দু' -এর মধ্যে তফাত আছে: বৈদিক বামাচার মূলতই পুরুষপ্রধান—ঝোঁকটা শুধুই পুরুষের উপর, যা কিছু ভাবা

হচ্ছে বা বলা হচ্ছে তা পুরুষের তরফ থেকে। যেমন ধরুন, ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন: কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না। বৃহদারণ্যকের ঋষি আরো এক-পা এগিয়ে যাচ্ছেন; বলছেন, নারী যদি মৈথুনে রাজী না হয় তাহলে কিলঘুঁষি এমনকি লাঠি মেরে তাকে রাজী করাতে হবে। উপনিষদ থেকেই এই পুরুষ-প্রাধান্যের আরো অনেক নজির তোলা যায়। এর তুলনায়, লোকায়তিক বামাচার মূলতই স্ত্রী-প্রধান। স্ত্রীই শক্তি, শক্তিই সব। এই তফাতের কারণ কী?—সে বিষয়ে পরে দীর্ঘতর আলোচনা তুলতে হবে।

আপাতত, বামাচারী চেতনার উৎস-সন্ধানই অগ্রসর হওয়া যাক। অগ্রসর হবার একটা সূত্র পাওয়া গিয়েছে: গুণরত্ন-বর্ণিত লোকায়তিকদের রতি-উৎসব(২৮)।

সে-বর্ণনাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে, নিছক পুঁথিপত্রের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা চলবে না। তাহলে, পুঁথির গণ্ডি পিছনে ফেলে বাস্তব পৃথিবীতেই বেরিয়ে পড়া যাক। দেখা যাক, গুণরত্ন-বর্ণিত ওই লোকায়তিক আচরণের সঙ্গে হুবহু মিল আছে—এমন কোনো দৃশ্য সত্যিই চোখে পড়ে কি না।

পড়ে। আপনি যদি সত্যিই বেরিয়ে পড়তে রাজী হন তাহলে স্বচক্ষে দেখতে আসতে পারবেন। খুব বেশি দূরও যেতে হবে না। বাংলা দেশের সাঁওতাল-অঞ্চল পর্যন্ত গেলেই হবে। পৌষ মাসে যাবেন। ওই সময়টাতেই সাঁওতালদের ওই রকমের উৎসব। কিন্তু মজা হলো, উৎসবটার নামের সঙ্গে আষাঢ় মাসের যোগাযোগ রয়েছে। তার কারণ, উৎসবটা বুঝি আগেকার কালে আষাঢ় মাসেই হতো। সাঁওতালদের স্মৃতিতে আজো সে-কথা টিকে রয়েছে। এই সময়-বদলটা অবশ্যই অহেতুক নয়। আধুনিক গবেষক অনুমান করছেন, এর সঙ্গে চাষবাসের উন্নতির সম্পর্ক আছে(২৯)। অর্থাৎ কিনা, আগেকার কালে তাদের কাছে আউশই ছিলো একমাত্র ফসল। বর্ষার সেই ফলস উপলক্ষেই

তাদের উৎসবটা ছিলো বর্ষাকালে। তারপর, আমন বা হৈমন্তিক ফসল ফলাতে শেখবার পরে উৎসবের সময়টা বর্ষা বদলে হেমন্ত হলো।

ছোটোনাগপুরের(৩০) দিকেও যেতে পারেন। এ-ধরনের উৎসব শুধুমাত্র সাঁওতালদের মধ্যেই টিকে নেই। ছোটোনাগপুরের দিকে দেখবেন মুঞ্জা, হো প্রভৃতিদের মধ্যেও এ-উৎসব আজো কী ভাবে বর্তমান। তবে, ওদের উৎসবটা যদি দেখতে চান তাহলে আষাঢ় মাসে বরাবরই যেতে হবে। তার কারণ কি এই যে ওরা এখনো আমন-ফসলটাকে বড়ো ফসল মনে করতে শেখে নি?

আরো নানান দিকে যাওয়া যায়। জয়পুরের দিকে গেলে পাঞ্জাবের মধ্যে এই উৎসব দেখা যায়, নিলগিরির দিকে গেলে দেখা যায় কোটারদের মধ্যে(৩১)। বিদেশ যেতে যদি রাজী হন তাহলে মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া বা ওই রকম আরো নানা জায়গায় এই উৎসবটাই আপনার চোখে পড়বে(৩২)। কিন্তু স্বদেশেই দেখুন আর বিদেশেই দেখুন, একটা ব্যাপার দেখে অবাক হতেই হবে: নির্বিচার মৈথুনের এই যে উৎসব, এর সঙ্গে ফসলের সম্পর্কটা সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ।

সাঁওতালরাই সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে এ-উৎসব কী ভাবে টিকে আছে তাই দেখা যাক:

Five days are spent in dancing, drinking and debauching. It is significant that at the commencement the village-headman gives a talk to the village people, in which he says that they may act as they like sexually, only being careful not to touch certain women: otherwise they may amuse themselves. The village people reply that they are putting twelve balls of cotton in their ears and will not

pay any heed to, nor hear or see, anything. This festival is in many ways a disgrace to this people(৩৬).

অর্থাৎ নাচ, মদ্যপান ও ব্যাভিচারে কাটে পাঁচ দিন। লক্ষ্য করা দরকার যে, শুরুতে গ্রামের মোড়ল গ্রামের সবাইকে ডেকে একটি বক্তৃতায় বলে, মৈথুন ব্যাপারে যা খুসি তাই করতে পারো, কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি নারীকে স্পর্শ করা চলবে না, তাছাড়া মনের সুখে মজা করো। উত্তরে গ্রামের সবাই বলে যে, তারা কানের মধ্যে বারো গোলা তুলো পুরছে,- কোনো দিকে নজর দেবে না, কিছুই শুনবে না, কিছুই দেখবে না-কিছুই নয়। এ-উৎসব ওদের পক্ষে এক কলঙ্ক!

উদ্ভূতির শেষ কথাটি নজর করবেন: আধুনিক কালের লাম্পটা-ব্যবহারের কাছ থেকে আলো পেয়ে ওদের আচরণটাকে বুঝতে গেলে এ-ধরনের একটা মন্তব্য করা ছাড়া উপায় নেই। ওদের শুধোন, একেবারে অন্য জবাব পাবেন। ডাল্টন(৩৪) সাহেব অনেককাল আগেই সে-জবাব সংগ্রহ করে গিয়েছেন: ফসলের এই সময়টায় ওরা অনুভব করে নিজেদের মধ্যে বীজের ভার। ক্ষেত্রে বীজ ছড়ানো আর নারীর মধ্যে সন্তানের বীজ স্থাপন করা-ওদের চেতনায় দুটো কথা সম্বন্ধহীন নয়।

বাজসনেয়ী সংহিতার মন্ত্রগুলিতেও কি সেই ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উদ্গাতা বাবাতাকে অভিমেথন করবার সময় ওই বীজবপনের কথাটাই ভাবছে: যেমন কৃষক বায়ুতে ধান্য শূঙ্ক করিতে করিতে অকস্মাৎ গ্রহণ এবং বপন করে!

তাহলে সমাজ-বিকাশের প্রাচীন স্তরে আটকে পড়ে-থাকা মানুষদের দিকে চেয়ে দেখলে প্রাচীন সাহিত্যের বামাচারকে বোঝবার সূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

এ-বিষয়ে রাশি রাশি তথ্য সংগ্রহ করেছেন স্যর জেম্‌স্‌ ফ্রেসার এবং তারই ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন:

...the profligacy which notoriously attended these ceremonies was at one time not an accidental excess but an essential part of the rites, and that in the opinion of those who performed them the marriage of trees and plants could not be fertile without the real union of the human sexes. At the present day it might perhaps be vain to look in civilised Europe for customs of this sort observed for the explicit purpose of promoting the growth of vegetation. But ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still, or were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of a similar practice(৩৫).

মোদ্দা কথায়, পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কল্পনা অনুসারে প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করবার কৌশল হলো নরনারীর মৈথুন: মানুষ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে প্রকৃতিও তাকে অনুকরণ করতে বাধ্য হবে।

বলাই বাহুল্য, আমাদের আজকালকার জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের ওই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। আমরা আজ অনেক বেশি জেনেছি, অনেক

ভালো করে বুঝতে পেরেছি প্রকৃতিকে বাস্তবিকই ফলপ্রসূ করবার প্রকৃত কৌশল কী। কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়ে রয়েছে তাদের বেলায় একেবারে আলাদা কথা। আমাদের তুলনায় প্রকৃতির উপর তাদের দখলটা নেহাতই নগণ্য-বাস্তবভাবে তারা আর প্রকৃতিকে কতটুকুই বা জয় করতে শিখেছে? তাই বাস্তব জয়ের দিক থেকে প্রকাণ্ড অভাবটাকে একরকমের কাল্পনিক উপায়ে তারা মেটাতে চায়।

আকাশে বৃষ্টি চাইতে হলে তারা দলবেঁধে নাচতে নাচতে আকাশের দিকে জলের ছিটে ছোঁড়ে। কেন ছোঁড়ে? ওরা ভাবে, এইভাবে আকাশে বৃষ্টির একটা নকল তুললেই আসল বৃষ্টি ডেকে আনা যাবে।

আদিম মানুষের এ-জাতীয় বিশ্বাসকেই বলে ‘ম্যাজিক’ বা যাদুবিশ্বাস। মৈথুন সম্বন্ধে তার ধারণাটাও বুঝতে হবে এই যাদুবিশ্বাসের দিক থেকেই। স্যর জেম্‌স্‌ ফ্রেসার যেমন বলছেন: যে-পদ্ধতি অনুসারে মানুষ সন্তান উৎপাদন করে, আর, যে-পদ্ধতি অনুসারে গাছপালারাও ওই একই কাজ করে-আদিম মানুষ যেন এই দু’ রকম পদ্ধতিকে গুলিয়ে ফেলছে, আর ভাবছে প্রথমটিকে যে নিজে সম্পাদন করে দ্বিতীয়টিকেও সম্পাদিত হবার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে(৩৬)।

স্যর জেম্‌স্‌ ফ্রেসারকে অনুসরণ করেই(৩৭) কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক: মধ্য-আমেরিকার পিপিলে বলে আদিবাসীদের কথা: বীজ বোনবার আগের রাতটিতে কামনাকে প্রচণ্ড ভাবে চরিতার্থ করা যায়। এমনকি, যে-মুহূর্তে জমিতে প্রথম বীজ বোনা হবে সেই মুহূর্তে মৈথুন করবার জন্যে কয়েকজনকে বিশেষ করে নিযুক্ত রাখা হয়। পুরোহিতদের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকেই এই উপলক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য; এমনকি, উক্ত অনুশাসন না মেনে বীজ বুনতে যাওয়াটাকে আইন-গর্হিত মনে করা হয়।

জাভা-দ্বীপের কোনো কোনো গ্রামে ধান পাকবার সময়টিতে কৃষাণ-কৃষাণীরা রাত্রিবেলায় ক্ষেতে যায় ও ক্ষেতের উপরই সহবাস করে।

অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মাঝামাঝি দ্বীপপুঞ্জগুলিতে এই জাতীয় বিশ্বাসের সামান্য রকমফের দেখা যায়। ওখানের মানুষদের বিশ্বাস, সূর্য হলো পুরুষ, ধরিত্রী নারী। বছরে একবার করে, বর্ষার মুখে, সূর্য নাকি আকাশ থেকে নেমে আসে ধরণীকে গর্ভবতী করবার জন্যে। আর পুরো পৃথিবী জুড়ে উৎপাদনের যখন এ-রকম মহোৎসব তখন মানুষেরাও মেতে ওঠে ওই একই উৎসবে: নরনারীর মধ্যে অবাধ মিলন চলতে থাকে। ওদের ধারণায়, উৎসবটির উদ্দেশ্য হলো পিতামহ সূর্যের কাছ থেকে বহুল পরিমাণে বৃষ্টি, অন্ন, পশু ও প্রজা পাওয়া। ফেসার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই ধরনের অব্যবহিত যৌন-মিলনকে অসংযত যৌনক্ষুধার বিকাশমাত্র মনে করলে ভুল করা হবে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে পুরো উৎসবটিকে তারা সযত্নে ও রীতিমতো ভক্তিভরেই সম্পাদন করে, কেননা, তাদের ধারণায় এরই উপর নির্ভর করছে জমির উর্বরতা আর মানুষের মঙ্গল।

স্যার জেম্‌স্‌ ফেসার আরো অজস্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—জায়গায় কুলোবে না। উদ্ধৃত করতে পারলে দেখা যেতো এ-জাতীয় বিশ্বাস পৃথিবীর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি জায়গায় আবদ্ধ নয়; যেখানেই আজো মানুষ পিছিয়ে-পড়া দশায় আটকে রয়েছে সেখানেই টিকে আছে এই ধরনের বিশ্বাস। অর্থাৎ, আদিম মানুষের পক্ষে এ-বিশ্বাস সার্বভৌম: কিংবা, যা হয়তো একই কথা, মানুষের আদিম অবস্থার কোনো এক স্তরে এ-বিশ্বাস অনিবার্যও। কেন, তা পরের পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

আর যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও যখন সবেমাত্র ওই রকম কোনো অবস্থা পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন তখন তাঁদের ধ্যানধারণা থেকে এ-জাতীয় বিশ্বাসের চিহ্ন সম্পূর্ণ ভাবে মুছে যায় নি। আর যেহেতু তাঁরা নিজেদের ধ্যানধারণাগুলিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন পুঁথির পাতায় বা মন্দিরের ভাস্কর্যে সেইহেতুই আমরা আজো

সেগুলির স্পষ্ট স্বাক্ষর স্বচক্ষে দেখতে পাই। কেবল ভুলে যাই, তাঁদের উদ্দেশ্য আর আমাদের উদ্দেশ্য এক হবার কথা নয়।

তাই, বেদের মন্ত্র শুনলে পরের যুগে প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা ওঠে।

তাই, মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্য(৩৮) দেখতে গিয়ে আজ চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

একাল আর সেকালের তফাতটা তো সত্যিই বড়ো কম নয়! বলাই বাহুল্য, প্রাচীন বলেই সেকালের ধারণাকে নির্বিচারে শ্রদ্ধা করবার কথা উঠছে না। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে, একালের মনোভাব নিয়ে সেকালকে বিচার করলে প্রাচীনদের প্রতি অবিচার করা হবে।

বাজসনেয়ী সংহিতার বা উপনিষদের ঋষিরা যা বলেছেন তা ঠিক না ভুল সে-আলোচনা স্বতন্ত্র। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, তাঁরা যা ভাবেন নি, সে-ভাবনাটা তাঁদের রচনায় আরোপ করাটা ভুল।

তাঁরা অশ্লীল সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁরা লাম্পট্য বর্ণনা করেন নি। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান অনুসারে যা উদ্দেশ্যমূলক মনে করেছেন তাই লিখে গিয়েছেন। মৈথুন তাঁদের ধারণায় যজ্ঞের সমান, সামগানের সমান, একমাত্র ব্রতের সমান। কেননা, তাঁদের ধারণায় এরই উপর নির্ভর করছে শুধুমাত্র সন্তান পাবার সম্ভাবনা নয়, সব কিছুই: মিথুনাম্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্ত্যা...

২৭. এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের “লোকায়ত-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত” শিরোনামের পর্ব।

২৮. ঐ।

২৯. JAS (s) XIX-1953 No. 1, Page 7.

৩০. E. T. Dalton DEB 196.

৩১. E. Westermarck HHM 30.

৩২. Ibid cf. J. Frazer GB ch. Xi.

৩৩. JAS (s) XIX-1953 No. 1, Page 7.

৩৪. E. T. Dalton op. cit. 196.

৩৫. J. Frazer GB 135-6.

৩৬. Ibid. cb. Xi.

৩৭. Ibid.

৩৮. এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের “তন্ত্রের দেহতত্ত্ব” শিরোনামের

পর্ব।

লোকায়ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া

অবশ্যই, লোকায়ত নিয়ে সমস্যাটা শুধুমাত্র প্রাচীন ইতিহাসের সমস্যা নয়। কেননা, খুব পুরোনো কালের লেখায় লোকায়তিকদের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, লোকায়ত বলতে শুধুমাত্র প্রাচীন কালের কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বোঝা উচিত নয়।

এ-বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উল্লেখ করেছি। তিনি দেখাচ্ছেন, আজো ভারতবর্ষের নানান জায়গায় নানান রকম নামের আড়ালে ওই লোকায়ত আর কাপালিক মতবাদ টিকে রয়েছে। বিশেষ করে তিনি দুটি সম্প্রদায়ের কথা তুলছেন, বৈষ্ণব আর সহজিয়া। এই যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, এ-হলো নামেই বৈষ্ণব-কেননা, বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তার বদলে, এ-জাতীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে দেহতত্ত্বই হলো চরমতত্ত্ব, সাধনা বলতে সবটুকুই কামসাধনা।

অতএব, মহামহোপাধ্যায় বলছেন, এ-জাতীয় সম্প্রদায়গুলিকে লোকায়তিক আখ্যাই দিতে হবে।

কিন্তু যে-লোকায়ত চিন্তাধারা দেহতত্ত্বের গানে, সহজিয়া, তন্ত্র বা ওই ধরনের অজস্র নামের আড়ালে, দেশের পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলে এবং সামাজিক মর্যাদাহীন নিচু স্তরের মানুষদের মধ্যে আজো এ-ভাবে টিক রয়েছে তার সঙ্গে মাধবাচার্য বর্ণিত ওই ধারালো, মার্জিত দার্শনিক মতবাদটির সম্পর্ক ঠিক কী?

সম্পর্কের একটা নমুনা দেখুন:

এ ব্রাহ্মণ বুঝি নদীতে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তর্পণ করছিলো। তাই দেখে সহজিয়ারা গান(৩৯) গেয়ে বলছে: ওগো বামুন, এতো সহজেই যদি

সুদূর পরলোক পর্যন্ত জল পাঠাতে পারো তাহলে কাছে পিঠে ওই যে চাষের ক্ষেত সেখানে জল পৌঁছে দেবার জন্যে আর হাঙ্গামা করা কেন?

যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে লোকায়তিকদের যে-সব তীব্র বিদ্রূপের বর্ণনা মাধবাচার্য দিয়েছেন সহজিয়াদের এই গান প্রায় হুবহু সেই রকমের নয় কি? মাধবাচার্য(৪০) লিখেছেন, লোকায়তিকেরা বলে শ্রাদ্ধপিণ্ড যদি পরলোকে কারুর ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে পারে তাহলে গ্রামান্তরে যাবার সময় চিঁড়েমুড়ির পোঁটলাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার কি?

কিন্তু শুধু সহজিয়াই নয়। দেহবাদী নানান সম্প্রদায় আজো আমাদের দেশে বেঁচে রয়েছে। লোকায়ত-দর্শন বুঝতে হলে এগুলিকেও ঠিকমতো বুঝতে হবে।

৩৯. H. P. Shastri op. cit, 4.

৪০. সর্বদর্শনসংগ্রহ ৫।

পদ্ধতির পরিচয়

শুরুতেই বলেছি, লোকায়ত দর্শন নিয়ে যতো রকমের সমস্যা ওঠে তা সবই সমাধান করা আমাদের যোগ্যতায় নেই। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার বর্তমান অবস্থায় তা কতোখানি সম্ভব তাও হয়তো অনেকটাই সন্দেহের কথা।

সমস্যা যে ওঠে এবং সমস্যা যে বহু রকমের, ভারতীয় দর্শনের সাধারণ ইতিহাসে সে-কথার স্বীকৃতি নেই। মহামহোপাধ্যায়ের রচনা অনুসরণ করে দেখাবার চেষ্টা করলাম সমস্যাগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং সেগুলির সমাধান খোঁজ করা দরকার। এবং সমাধান খোঁজ করবার পদ্ধতিটি কী রকম হতে পারে তারও কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলো সমস্যাগুলির সূত্র ধরে এগোতে-এগোতে: পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষের ধ্যানধারণা থেকে প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনেক কথা এবং অনুল্লত মানুষদের অনেক ক্রিয়াকর্মকে বোঝবার সুযোগ হতে পারে।

এ-পদ্ধতি খুবই মূল্যবান।

এ-পদ্ধতি অনুসরণ শুধু যে লোকায়ত-দর্শন প্রসঙ্গেই প্রয়োজন তাই নয়, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনেক অন্ধকার গুহা, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অনেক জটিল সমস্যা, প্রাচীন পুঁথিপত্রে লেখা অনেক দুর্বোধ্য কথা-এ-পদ্ধতির সাহায্যে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শুরুতে তাই পদ্ধতির সম্যক পরিচয় প্রয়োজন।

কিন্তু পদ্ধতিটিকে বোঝবার ব্যাপার সুবিধে হবে এটির কোনো মূর্ত প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করলে। উপনিষদেরই একটি দুর্বোধ্য পরিচ্ছেদের উপর প্রয়োগ করে পদ্ধতিটির পরিচয় পাবার চেষ্টা করা যাক। লোকায়ত-দর্শনের দিক থেকেও উপনিষদের এই পরিচ্ছেদটি অবাস্তব হবে না। কেননা, তার মধ্যে যে-

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মান পাওয়া যাচ্ছে তাকে বস্তুবাদী বা লোকায়তিকই বলতে হবে।

অথ কুকুরস-সম্বন্ধী সামগান

ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে একটি অদ্ভুত, ও আপাতঃ- অর্থহীন, বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধারণায় এর অর্থনির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে নতুন প্রদ্ধতির প্রয়োজন। সে-পদ্ধতির পরিচয় হিসেবে উপনিষদের এই অংশটুকুর উপর পদ্ধতিটির প্রয়োগ করবার চেষ্টা করা যাক। ছান্দোগ্য লেখা আছে:

অতএব এখন কুকুর সম্বন্ধীয় সামগান (উদগীথ)। তখন বক দালত্য, ওরফে অতৃপ্ত (গ্লাব) মৈত্রেয়, স্বাধ্যায়ে (=বেদজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে) বেরিয়েছিলেন।।১।১২।১।।

তাঁর কাছে শ্বেতবর্ণ কুকুর আবির্ভূত হলেন। অন্য কুকুরেরা তাঁর (=সেই শ্বেতবর্ণ কুকুরের) কাছে গিয়ে বললো, “ভগবান, আমাদের অন্নের জন্য গান করুন। আমরা ভোজন করতে চাই।।১।১২।২।।

সেই সাদা কুকুর অন্য কুকুরদের বললেন, “তোর বেলায় এইখানে আমার কাছে সমাগত হয়ো।” বক দালভ্য, ওরফে অতৃপ্ত মৈত্রেয়, অপেক্ষা করে রইলেন।।১।১২।৩।।

বহিষ্পবমানের সাহায্যে স্তোষ্যমান অবস্থায় যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সর্পির্ল গতিতে নড়াচড়া করা হয় (সর্পিষ্ঠি), তারা (=সেই কুকুরেরা) তেমনি গতিতে ঘুরলো (আসস্পু)। তারপর তারা (=সেই কুকুরেরা) একত্রিত হলে ও হিং (হিংকার) করলো।।১।১২।৪।।

(তারা গান করতে লাগলো) “ওম, আমরা ভোজন করি। ওম্ আমরা পান করি। ওম্ দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এইখানে অন্ন আহরণ

করিতেছিলেন। হে অন্নপতি, এইখানে অন্ন আহরণ করো। ওম্।”
ইতি।।১।১২।৫।।

শব্দার্থের দিক থেকে কয়েকটা কথা গোড়ায় বলে নেওয়া দরকার।

সামগানের পাঁচ ভাগে বা পাঁচ স্তরে ভাগ করা হয়: হিংকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন। অধ্যাপক আর. ই. হিউমের(৪১) তর্জমা অনুসারে: হিংকার=preliminary vocalizing, প্রস্তাব=introductory praise, উদগীথ=loud chant, প্রতিহার=response, নিধন=conclusion।

বহিষ্পবমান স্তোত্র। প্রথমত, স্তোত্র: “যাহা গান করা যায় তাহার নাম স্তোত্র।” (৪২) দ্বিতীয়ত, বহিষ্পবমান: যজ্ঞবিশেষে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তটি গান করবার সময়, পাঁচজন ঋত্বিক (অধ্বষু, প্রস্তুতা, প্রতিহর্তা, উদগাতা ও ব্রহ্মা) ও তারপরে যজমান হাত ধরাধরি করে চত্তাল অভিমুখে প্রসর্পণ করেন, সকলে উপবেশন করলে পর হোতা তাঁদের অনুমত্তন করেন।

স্বাধ্যায়। এ-কথার চলতি মানে হলো প্রাথমিক বেদজ্ঞান। সু+আ=অধ্যায়ম্। কিন্তু অন্য ভাবেও এই শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে: স্ব+অধ্যায়ম্, অর্থাৎ, নিজে নিজে অধ্যয়ন।

বক দালভ্য, ওরফে, গ্লাব মৈত্রেয়। বক মানে বক, যদিও কিনা মানুষের নাম যে কি করে বক হতে পারে এ-নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা কিছুটা মুস্কিলে পড়েছেন। তাই, তর্জমা করবার সময় মক্ষমুলার(৪৩) করছেন Vaka, “বাক”। অধ্যাপক হিউম(৪৪) করছেন Baka। কিন্তু যাঁরা উপনিষদ লিখেছিলেন তাঁরা Vakaও লেখেন নি, Bakaও লেখেন নি; শুধু “বক” ই লিখেছেন। দালভ্য: এ-নামটার শব্দার্থ যাই হোক না কেন, মহৎ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। কেননা, ছান্দোগ্য-উপনিষদেই(৪৫) একটু আগে লেখা হয়েছে: মাত্র তিনজন উদগীথ-বিদ্যায় কুশল ছিলেন—শালাবত্য শিলক, দালভ্য চৈকিতায়ন এবং প্রবাহন

জৈবলি। অবশ্যই, দালব্য বক এবং দালব্য চৈকিতায়ন-দু’ -এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিলো কিনা সে-কথা উপনিষদে লেখা নেই। কিন্তু, তাহলেও, বক দালভ্যও খুব কম পণ্ডিত ছিলেন না। ছান্দোগ্য-উপনিষদের অন্যত্র সে-কথা লেখা আছে(৪৬)। গ্লাব মানে অতৃপ্ত-এই মানেটাই মনে রাখা ভালো। অতৃপ্ত বলেই তিনি স্বাধ্যায়ে বেরিয়েছিলেন।

এইবার শব্দার্থের কথা ছেড়ে পুরো বর্ণনাটুকুর তাৎপর্য সন্ধান করা যাক। মনে রাখবেন, এটি হলো ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড এবং উপনিষদে এই পরমাশ্চর্য দৃশ্যটির কথা যেমনি খাপছাড়া ভাবে অবতারণা করা হলো তেমনি খাপছাড়া ভাবেই তা শেষ হয়ে গেলো।

কুকুরদের কথা হঠাৎ উঠলো, হঠাৎ শেষ হলো-সারা উপনিষদটিতে তাদের আর কোথাও খুঁজে পাবেন না! ব্যাপারটা কী? উপনিষদের আধুনিক টীকাকারেরা বলছেন, পুরো ব্যাপারটাই হলো প্রকাণ্ড পরিহাস। কাদের সম্বন্ধে পরিহাস? যজ্ঞের পুরোহিতদের সম্বন্ধে। পরিহাস কেন? কেননা, এঁরা ধর্মের নামে পানাহারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত, আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে একটি প্রিয় মতবাদ হলো, বৈদিক যুগের পর দেশে যখন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি করছেন তখনই উপনিষদের ঋষিরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তোলেন(৪৭)। তাঁরা যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মের নিন্দা করে ব্রহ্মজ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করতে চাইলেন। ফলে, যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মকে বিদ্রুপ করাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আধুনিক কালে পণ্ডিত মহলে এই মতবাদটির জনপ্রিয়তা যতোই হোক না কেন, উপনিষদকে এই ভাবে বুঝতে যাওয়া সত্যিই চলে কিনা সে-বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন ওঠে(৪৮)। আপাতত আমাদের পক্ষে সে-সব প্রশ্নের আলোচনায়

প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তার বদলে উপনিষদের আলোচ্য অংশটিকেই খুঁচিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করা যাক।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতবাদের নমুনা হিসেবে এই অংশ উপলক্ষেই স্যর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ কী লিখেছেন দেখুন:

There are occasions when the sacrificial and priestly religion strikes them as superficial, and then they give vent to all their irony. They describe a procession of dogs to march like a procession of priests each holding the tail of the other in front and saying, "Om! Let us eat. Om, let us drink..."(8৯) etc.

অর্থাৎ, তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে যজ্ঞমূলক ব্রাহ্মণ্যধর্ম নেহাৎ বাহ্য ব্যাপার বলে মনে হয়েছে এবং তখন তাঁরা তাঁদের সবটুকু বিদ্রুপ উজোড় করে দিয়েছেন। পুরোহিতদের মিছিলকে তাঁরা একদল কুকুরের মিছিলের মতো বর্ণনা করেছেন,—ওই কুকুরদের প্রত্যেকেই সামনের কুকুরের লেজ কামড়ে ধরেছে আর বলছে: “ওম্ আমরা ভোজন করি। ওম্ আমরা পান করি” । ইত্যাদি

স্যর সর্বপল্লি ছাড়াও আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই(৫০) একবাক্যে বলছেন: ছান্দোগ্যের এ-অংশ পুরোহিত-শ্রেণীর ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে বিদ্রুপ না হয়ে যায় না!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, উপনিষদের মানে করবার সময় উপনিষদে যা লেখা আছে শুধুমাত্র তার উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে, না, অজস্র আধুনিক কল্পনাকে উপনিষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে? ওঁরা বলছেন, বিদ্রুপ। কিন্তু বিদ্রুপের

ছিটে-ফোঁটাও কি আপনি উপনিষদে যা লেখা আছে তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন? উদ্ধৃত অংশটিকে ভালো করে পরীক্ষা করুন; দেখবেন, বিদ্রুপ তো দূরের কথা লেখকের কাছে পুরো অংশটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। মনে রাখবেন, দালভ্য একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত লোক এবং তিনি অতৃপ্ত হয়ে জ্ঞানাস্বেষণে বেরিয়েছিলেন। আর তাঁকে বেদজ্ঞান দেবার প্রসঙ্গেই পুরো দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে।

বিদ্রুপ তো আর বললেই হলো না।

ওঁরা বলবেন, তা কেন? বিদ্রুপ না হলে যারা বহিষ্পবমান স্তোত্রের মতো করে গান গাইছে তাদের কুকুর বলে বর্ণনা করা হবে কী করে? উপনিষদে লেখা আছে: কুকুর। সে-বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই! আর, আমি-আপনি যদি কাউকে কুকুর বলি তাহলে নিশ্চয়ই খুব খাতির দেখাবার উদ্দেশ্যে বলি না!

৪১. R. E. Hume TPU 191

৪২. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ১৩৮।

৪৩. SBE. 1:21.

৪৪. R. E. Hume op. cit. 188.

৪৫. ছান্দোগ্য উপনিষদ: ১.৮.১।

৪৬. ঐ: ১.২.১৩।

৪৭. S. Radhakrishnan IP 1:149.

কুকুর মানে কী?

তাহলে, ওই হল আসল প্রশ্ন: উপনিষদের ওই কুকুর কথাটির মানে কী! কুকুর মানে কুকুর। আবার কী?—এই হলো আধুনিক পণ্ডিতদের বলবার কথা। আর, কুকুরই যদি হয় তাহলে তাদের লেজ থাকবে না কেন? অবশ্যই, উপনিষদের ঋষিরা লেজের কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। আধুনিক টীকাকারেরা যেন ভ্রম-সংশোধন হিসেবেই লেজের কথাটুকু জুড়ে দিচ্ছেন: পেছনের কুকুর তার সামনের কুকুরের লেজ কামড়ে ধরলো, ইত্যাদি।

লেজের উপাখ্যানটি ছোটো নয়; এ-লেজ শঙ্কর-ভাষ্য(৫১) থেকে গজাতে শুরু করে মঞ্চুলারের গ্রন্থাবলী হয়ে স্যর সর্বপল্লীর “ভারতীয় দর্শন” পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু আমাদের ওই একই মন্তব্য: উপনিষদের ব্যাখ্যা করা মানে উপনিষদ রচনা করা নয়। লেজের উল্লেখ যদি উপনিষদে না থাকে তাহলে তর্জমা করতে গিয়ে, কিংবা, টীকা করতে গিয়ে লেজ রচনা করার সুযোগ নেই। তার বদলে, উপনিষদে ঠিক কী লেখা আছে? লেখা আছে, কুকুরেরা এক সাদা কুকুরের কাছে গিয়ে বললো, আমরা ভোজন করতে চাই, আমাদের অন্নার্থে গান দিন। অন্নং নঃ ভগবান আগায়তু, আশনায়াম্ ইতি। আর শেষ পর্যন্ত সত্যিই তারা দল বেঁধে গান করতে শুরু করলো: আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি, ইত্যাদি।

এখন এতো ব্যাপার কি সত্যিই কুকুরের পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। পুরাকালেও নয়। সেকালের কুকুরেরা যে অন্ন চাইতো এবং অন্নের উদ্দেশ্যেই দল বেঁধে গান গাইতো—এমন কথা নিশ্চয়ই কেউই বিশ্বাস করবেন না।

আর একটা সম্ভাবনা আছে। উপনিষদের এই অংশে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে সত্যিকারের কুকুরই নয়। তার বদলে মানুষ।

এবং মানুষ হলেও তাদের কুকুর বলে উল্লেখ করবার পেছনে কোনো রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? মানুষকে নিছক জন্তু-জানোয়ার মনে করা হচ্ছে, অথচ তা স্বাভাবিক ভাবেই! তার মূলে কোনো রকম বিদ্রূপ-বিতৃষ্ণার লক্ষণ নেই?

আজকের দিনে অবশ্যই তা সম্ভব নয়। কিন্তু উপনিষদের এ-অংশ তো আজকের দিনের লেখা নয়। উপনিষদের এই অংশে যাদের উল্লেখ করা হচ্ছে তারাও কেউ আধুনিক কালের মানুষ নয়। অপরপক্ষে, বৈদিক সাহিত্যের দিকে ভালো করে নজর করুন। দেখবেন, জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে কতো স্বাভাবিক ভাবেই একান্ত মানবীয় ব্যাপারগুলির নামকরণ করবার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। তাই, আধুনিক মনোভাবটাকেই আপনি যদি একমাত্র মনোভাব মনে করেন তাহলে প্রাচীনদের ওই ব্যবহারটির কোনো অর্থ খুঁজে পাবেন না।

কয়েকটা নমুনা দেখা যাক।

সাদা খচ্চোর: আজকের দিন আমি-আপনি নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু সম্বন্ধে সমীহ দেখাবার মনোভাব নিয়ে এমনতরো নাম ব্যবহার করবো না। কিন্তু একটা বই-এর নাম যদি তাই দেওয়া হয়? তাহলে আজকের দিনে নিশ্চয়ই সরাসরি বলে দেওয়া যাবে, বইটার বিরুদ্ধে বিদ্রূপমূলক মনোভাবের বিকাশ হিসেবেই এ-রকম নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালের ব্যাপারই আলাদা। একটি উপনিষদের নাম সত্যিই সাদা খচ্চোর: শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। অথচ ঠাট্টা নয়, বিদ্রূপ নয়,-নামকরণের মধ্যে কোনো রকম বিদ্রূপ ভাবের প্রকাশই নেই।

আর শুধু খচ্চোরই বা কেন। প্রাণীজগতের আরো সব অদ্ভুত অদ্ভুত বাসিন্দাদের খুঁজে পাবেন বৈদিক-সাহিত্যের রকমারি নামের মধ্যে। অপর একটি উপনিষদের নাম গ্রহণ করা হয়েছে ব্যাঙ থেকে: মাণ্ডুক্য উপনিষদ। কিন্তু এই

নামের জন্যে উপনিষদ-সাহিত্যে তার মর্যাদা এতোটুকুও কম নয়। শঙ্করাচার্যের গুরু গৌড়পাদ এরই কারিকা রচনা করে অমর হয়েছেন।

উপনিষদ থেকে আরো এক-পা পিছু হটে যদি সংহিতার রাজ্যে প্রবেশ করেন তাহলে আপনার মনে হতে পারে নামজগতের এক অদ্ভুত চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করেছেন বুঝি! নমুনা দেখুন:

সংহিতাগুলির নানান শাখা-উপশাখার নাম পাওয়া যায়, যদিও অবশ্য অনেক শাখাই আজ বিপুষ্ট হয়েছে এবং যে-সব নাম টিকে রয়েছে তার মধ্যে অনেক নামেরই কোনো রকম মানে খুঁজে পাওয়া জা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই: এতো সব নামের মধ্যে যে-গুলির মানে ঠাঠর করা আজো সম্ভবপর সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটির পশুজগৎ বা উদ্ভিদ-জগৎ থেকে পাওয়া।

ঋগ্বেদের যে-একমাত্র শাখা আজো বিলুপ্ত হয় নি তার নাম হলো শাকল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে(৫২) লেখা আছে, শাকল হলো এক রকম সাপের সেকলে নাম। শৌনক প্রণীত প্রাতিশাখ্য(৫৩) অনুসারে, এ-ছাড়াও ঋগ্বেদের আরো চারটি শাখা ছিলো: বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাজ্জ্যায়ন ও মাণ্ডুক। এর মধ্যে মাণ্ডুক নামটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। বেদজ্ঞরা ভেবে দেখতে পারেন, দুটি শাখার নামের যে-মানে পাওয়া যায় তারই আলোয় বাকি তিনটির কোনো মানে উদ্ধার করা সম্ভব কিনা।

পুরাণে(৫৫) আছে, এককালে সামবেদের সহস্রাধিক শাখা ছিলো। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে সেই শাখাগুলি বিনষ্ট করেন। ইন্দ্রের এই অদ্ভুত আচরণের তাৎপর্য খোঁজা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তার বদলে দেখা যাক, ইন্দ্রের বজ্রাঘাত সত্ত্বেও যে-সাতটি শাখা টিকে থাকলো বলে বলা হয়েছে সেগুলির নাম কী রকম: কৌথুমী (বা কৌথুম), রাণ্যায়ণীয় (বা রাণ্যায়ণ), শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শাদুলীয়া। এই সপ্তম নামটি যে বাঘ থেকেই এসেছে তা বোঝবার জন্যে

স্বর মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধান ঘাঁটতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর ওই মহামূল্যবান অভিধানটিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও এক লাঙ্গলিক ছাড়া আর কোনো নামের শব্দার্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-নামটির যে-অর্থ পাওয়া যায় তা চিত্তাকর্ষক: লাঙ্গলিক মানে নাকি একরকম ভেষজ(৫৫)।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের একটি শাখার নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। এ-নাম যে তিত্তির পাখি থেকে এসেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুক্ল-যজুর্বেদের যে-শাখার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা তা বাজ বা তেজি ঘোড়া থেকে এসেছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অপর শাখার নাম মৈত্রায়ণী সংহিতা, তার কয়েকটি উপশাখার নাম খুবই চিত্তাকর্ষক: মানব, বরাহ, ছাগলেয়, হারদ্রবীয, দুন্দুভ, শ্যামায়ণীয়।

অথর্ষবেদের কয়েকটি শাখার নাম: পৈপ্পল, শৌনকীয়, তোত্তায়ন, ব্রহ্মপালাশ। এগুলির মধ্যে পৈপ্পল নামটি যে পিপুল গাছ থেকে এসেছে সে-বিষয়ে কোনো রকমই সন্দেহের অবকাশ নেই। বাকিগুলির কোনোটি কোনো জন্তু-জানোয়ারের বা কোনো গাছগাছড়ার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

আমরা বলতে চাই, পাঁচটা দৃষ্টান্তের মধ্যে যদি একটাকেও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় আর বাকি ক' টাকে বোঝা না যায় তাহলে যেটা বোঝা যাচ্ছে তারই সাহায্যে যে-ক' টাকে বোঝা না সেই ক' টাকে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। কিংবা, অন্তত এটুকু তো নিশ্চয়ই দাবী করা যায় যে, যা-অস্পষ্ট তার সাক্ষ্য যা-স্পষ্ট তার সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দিতে পারে না। সংহিতা-সাহিত্যের অন্তত কয়েকটি দৃষ্টান্তের বেলায় আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, নামগুলি সরাসরি জন্তু-জানোয়ার, কিংবা, গাছগাছড়া থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বাকিগুলির অর্থ যদি এমন বোঝা না-ও যায় তাহলেও কি সেগুলির পক্ষে একই রকম উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়?

আর, এই কথাটি মনে রেখে আধুনিক পণ্ডিতদের যুক্তিটাকে বিচার করে দেখুন : ছান্দোগ্যের ঋষি যে-হেতু আলোচ্য দৃশ্যটিকে কুকুর-সম্বন্ধীয় সামগান বলে বর্ণনা করছেন সেই হেতু উদ্দেশ্যটা ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া আর কী হতে পারে? এ-যুক্তি নেহাতই অচল এবং মূলে রয়েছে সেকালের রচনাতেও একালের মনোভাব কল্পনা করার চেষ্টা। কিন্তু সেকালের রচনায় একালের মনোভাব যে কল্পনা করা চলবে না তার প্রমাণ হলো, সেকালের ঋষিরা যে-গ্রন্থগুলিতে নিজেদের চূড়ান্ত জ্ঞান প্রকাশ করেছেন সেইগুলিরই নামকারণ করবার সময় সাপ, ব্যাঙ, বাঘ, ছাগল, তিতির, খচ্চোর ইত্যাদি নানান রকমের জানোয়ারেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এবং তার জন্যে যে তাঁদের কোনো রকম কুণ্ঠা ছিলো সে-কথা পুরোনো পুঁথির কোথাও লেখা নেই।

তাই, আধুনিক পণ্ডিতদের ওই যুক্তিটিকে যদি সত্যই গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে মানতেই হবে, বৈদিক ঋষিরা নিজেদের যে কীর্তিগুলিকে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন সেগুলি সম্বন্ধেই তাঁরা বিদ্রুপ-পরিহাসে মুখর হয়ে উঠেছিলেন!

তাহলে, ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই অংশটিতে কতকগুলি মানুষকে যে কুকুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ বিদ্রুপ বা পরিহাস নয়। আর বিদ্রুপ বা পরিহাস যদি নাই হয় তাহলে বর্ণনাটিকে সহজ ও স্বাভাবিক বলেই স্বীকার করতে হবে। তার মানে, স্বাধ্যায়ের আশায় বেরিয়ে গ্লাব মৈত্রেয়, ওরফে, বক দালভ্য নামের বিদ্বান ব্যক্তিটি যাদের সামগান শুনে এলেন তাদের সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় হলো: কুকুর।

কিন্তু সত্যিই কি কোনো মানবদলের সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় কুকুর হওয়া সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব, যদিও অবশ্যই আমাদের আধুনিক সমাজে নয়,-প্রাচীন সমাজে।

আমাদের এই ভারতবর্ষেই এমন অনেক মানবদলের খবর পাওয়া যায় যাদের নাম কুকুর এবং শুধুই কুকুর।

সেকালের লেখা পুঁথিপত্রে এ-জাতীয় খবর পাওয়া যায়। এমন কি একালেও যারা পিছিয়ে-পড়া বা সেকেলে অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের যদি স্বচক্ষে দেখেন তো দেখবেন তাদের মধ্যেও এই নামটি একেবারেই দুর্লভ নয়।

প্রথমে দেখা যাক প্রাচীন পুঁথিতে কী লেখা আছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে(৫৬) খুবই সোজাসুজি কুকুর নামের মানুষদের কথা বলা হয়েছে: কৌটিল্য বলছেন, ‘রাজশব্দোপজীবী’ সংঘগুলির মধ্যে একটির নাম কুকুর। হরিবংশের(৫৭) অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের নামই হলো কুকুরবংশবর্ণন। মহাভারতের সভাপর্বে লেখা আছে, যাবদগণের একটি শাখার নাম কুকুর: “এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্টিগণ ‘দুর্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্ধা করিবে না’ এই নীতিবাক্যের অনুসরণ ক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন” (৫৮)। ভীষ্মপর্বের নবন অধ্যায়ে(৫৯) ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষের নানারকম মানুষের বর্ণনা দিতে দিতে সঞ্জয় কুকুর নামের একদল মানুষের উল্লেখ করছেন। সভাপর্বে(৬০), যুধিষ্ঠিরের কাছে যারা উপহার বহন করে আনছে বলে বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে একদল মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই কুকুর বলা হয়েছে। তাহলে, প্রাচীন পুঁথিপত্রেই দেখা যায় মানবদলের নামও কুকুর হওয়া অসম্ভব নয়, এবং উল্লেখিত দৃষ্টান্তের কোথাও লোকগুলিকে হয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে ইচ্ছে করেই, গাল দিয়ে, কুকুর বলা হয়েছে—এমন নজির নিশ্চয়ই নেই। সর্বত্রই একদল মানুষের সহজ স্বাভাবিক পরিচয় হিসেবেই কুকুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু মানবদয়ের পরিচয় যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই কুকুর হওয়া সম্ভবপর এ-কথার প্রমাণ হিসেবে শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিপত্রের নজিরই আমাদের একমাত্র সম্বল নয়। আজো আমাদের দেশের নানা জায়গায় যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন স্তরে আটকা পড়ে রয়েছে তাদের দিকে দেখুন, দেখবেন কুকুর নামের কী রকম ছড়াছড়ি! এখানে মাত্র কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করলেই হবে।

রিসলী(৬১) বলছেন, ওরাওঁদের মধ্যে একদল মানুষের পরিচয় হলো খোয়েপা, খোয়েপা মানে বন্য কুকুর। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার(৬২) বলছেন, আজো মহীশূর অঞ্চলে একাধিক দলের মানুষের পরিচয় কুকুর নাম দিয়েই। থার্সটন(৬৩) দক্ষিণ ভারতের নানারকম মানুষের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলছেন, একদলের নাম হলো ভোলিয়া, ভোলিয়া মানে বন্য কুকুর।

আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। আজো ভারতবর্ষের কতো জায়গায় কতো রকমের মানুষ যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কুকুর হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় তার পূর্ণ তালিকা খুবই দীর্ঘ হবে।

এই ভাবে কুকুর বলে জীবন্ত মানুষগুলিকে দেখবার পর পুরোনো পুঁথির দিকে ফিরে যাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ওই যে যারা সামগান গাইলো ওরা কারা?

ওদের সত্যিকারের কুকুর মনে করে এবং সত্যিকারের কুকুরের ন্যায্য মর্যাদা দেবার জন্যে শঙ্করাচার্যের মতো লেজ সৃষ্টি করে উপনিষদের পিছনে জুড়ে দেবার দরকার নেই।

কিংবা, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ আধুনিক বিদ্বানদের মতো এ-কথা কল্পনা করবারও কোনো দরকার নেই যে, উপনিষদের ঋষিরা যজ্ঞীয় ঋত্বিকদের বিদ্রুপ করে বা ঘৃণাভরে ওই রকম সাজিয়েছিলেন।

তার বদলে, এখানে একদল সত্যিকারের মানুষেরই বর্ণনা। সেই মানুষগুলির সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় হলো: কুকুর। যেমন সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বেদের শাখাগুলিকে সাপ, ব্যাঙ, ছাগল ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিলো, কিংবা উপনিষদের কোনোটির নাম নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ থেকে, কোনোটির খচ্চার থেকে!

-
৫১. ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।
 ৫২. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ২৩৫।
 ৫৩. দুর্গাদাস লাহিড়ী: ঋগ্বেদ সংহিতা ২৯।
 ৫৪. ঐ ৩১।
 ৫৫. M. Monier-Williams SED.
 ৫৬. অর্থশাস্ত্র (রাধাগোবিন্দ বসাক) ২:২০৯।
 ৫৭. হরিবংশ ৩৮ অধ্যায়।
 ৫৮. মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ) ২১৫।
 ৫৯. ঐ ৭৫৬।
 ৬০. ঐ ২৩৮।
 ৬১. H. H. Risley PI 793.
 ৬২. A. K. Iyer MTC 1:248.
 ৬৩. E. Thurston and Rangacari CTSI 1:'Bholia'

জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানুষের নাম

উপনিষদের ওই সামগায়কগুলিকে সম্যকভাবে চিনতে হলে দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির ওপর ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে।

পুরানো পুঁথিপত্রগুলিতে দেখবেন, পশুপাখি বা গাছগাছড়ার নামে মানুষের আত্মপরিচয় দেবার উদাহরণ কী রকম প্রচুর! মূল বইগুলি উল্টে দেখবারও দরকার নেই, কেননা আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্বে ওই পুঁথিপত্রগুলি থেকে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তের দীর্ঘ তালিকা তৈরী করেছেন। অন্তত, ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের ‘জাতিভেদ’ বলে বইটি উল্টে দেখুন, দেখবেন, তাঁর তৈরি তালিকাটি প্রায় দশ পাতা জুড়ে রয়েছে।

ঋগ্বেদে একদল মানুষের(৬৫) উল্লেখ রয়েছে যাদের পরিচয় হলো অজ। অজ মানে ছাগল। আর একদল(৬৬) মানুষের খবর পাওয়া যাচ্ছে যাদের নাম হলো শিগ্র বা সজনে। আবার একদলের(৬৭) নাম হলো মৎস্য। এ-হেন মাছ-নামধারী মানুষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের নানান জায়গায় এবং নানান যুগে বাস করতো। কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে(৬৮) তাদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দেখতে পাওয়া যায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণে(৬৯), গোপথ ব্রাহ্মণে(৭০), মহাভারতে(৭১) ও নানা পুরাণে(৭২)। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে(৭৩) পারাবত (পায়রা) জাতির কথা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে(৭৫) ব্রহ্মপ্রজাপতির কূর্মরূপের কথা আছে। ওই কাছিমই আবার কশ্যপ নামে ঋগ্বেদ(৭৫), অথর্ষবেদ(৭৬) থেকে শুরু করে পুরোনো যুগের নানান পুঁথিপত্র(৭৭) আলো করেছে।

হনুমান বা জাম্বুবানের সত্যিই লেজ ছিলো কিনা জানা নেই। কিন্তু ক্ষিত্তিমোহন সেন(৭৮) মহাশয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন “কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দর যা সুদামাপুরীর রাজারা হনুমানের বংশ।” তাছাড়া ম ব্যাস-বাল্মিকীর রচনা পড়লে মনে হয় হেন জন্তু-জানোয়ার বা গাছগাছড়ার নাম বুঝি আমাদের

জানা নেই যার পরিচয়ে সেকালের কোনো না কোনো দল নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেছে। ক্ষিতিমোহন সেন(৭৯) মশায়ের বই পড়লে দেখবেন কতো রকমারি মানুষদের নাম তিনি মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন। নমুনা হিসেবে মাত্র দু' চারটির উল্লেখ করা যাক: প্যাঁচা, বিছে, কাক, আখ, বেল, শেয়াল, গাধা, গোসাপ, মুরগি, হাতি, ভেড়া, শূয়োর, বাঘ, পঙ্গপাল, হাঁস, মাগুরমাছ, খরগোস, ঘোড়া, তাল, শাল, বাঁশ, জাহ্নান-আরো কতো!

এতোসব দেখবার পর এ-কথা শুনে নিশ্চয়ই আর মন খারাপ হবে না যে বহুদিন ধরে আমাদের হিন্দুসমাজে যে-নামগুলিকে পরম পবিত্র মনে করা হয়েছিলো তার মধ্যে অনেক নামই খোদ জন্তু-জানোয়ার থেকে পাওয়া। ম্যাকডোন্যাল-এর(৮০) 'বেদিক মাইথোলজি' থেকেই কয়েকটা নমুনা দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঋষি-নাম হলো: কৌশিক, মাণ্ডুক্যেয়, গৌতম, বৎস, শুনক, ইত্যাদি। কৌশিক মানে প্যাঁচা, মাণ্ডুক্যেয় মানে ব্যাঙের বাচ্চা (ব্যাঙাচি?), গৌতম মানে যাঁড়, বৎস মানে বাছুর।

আর শুনক?

ঋষি-নাম হিসেবে 'শুনক' দেখে সত্যিই আর অবাক হবার অবকাশ নেই। কেননা, ছান্দোগ্য-উপনিষদে আপনি এই নামেরই মানুষদের সামগান গাইতে দেখেছেন। শুনক মানে কুকুর। শুনক ঋষির লেক ছিলো এ-কথা কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা নেই, যদিও অবশ্য কুকুরের লেজ থেকে ঋষির নামকরণ হয়েছিলো এ-কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। শুনঃশেপ ঋষির কাহিনী আমরা পরে বড়ো করে আলোচনা করবো। ঋগ্বেদে তাঁর রচনা পাওয়া যায়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁর সুদীর্ঘ কাহিনী পাওয়া যায়। শুনঃশেপ মানে কুকুরের লেজ। কুকুরের লেজ থেকে যদি কোনো ঋষির নামকরণ সম্ভবপর হয় তাহলে কুকুরদের সামগান শুনে তাদের লেজ কল্পনা করবার দরকার কি?

৬৪. ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ৯৮-১০৭।

৬৫. ঋগ্বেদ: ৭.১৮.১৯।

৬৬. ঐ।

৬৭. ঋগ্বেদ: ৭.১৮.৬।

৬৮. শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.৯।

৬৯. কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ৪.১।

৭০. ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ৯৮।

৭১. ঐ।

৭২. ঐ।

৭৩. ঐ ৯৯।

৭৪. ঐ।

৭৫. ঋগ্বেদ: ৯.১১৪.২।

৭৬. A. A. Macdonnel VM 153.

৭৭. Ibid.

৭৮. ক্ষিতিমোহন সেন: জাতিভেদ ৯৯।

৭৯. ঐ ৯৯-১০১।

৮০. A. A. Macdonnel op. cit. 153.

টোটম বিশ্বাস

জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানবদলের নামকরণ করবার এই প্রথাটি আমাদের দেশে টিকে রয়েছে শুধুমাত্র প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির মধ্যে নয়, দেশের পিছিয়ে-পড়ে অঞ্চলের বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও। আপনি যদি থাস্টন, রিসলী, রাসেল, কুক, আয়ার ইত্যাদির বই থেকে এ-বিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে রাজী হন তাহলে হয়তো দেখবেন কোনো রকম পরিচিত পোকামাকড়, গাছগাছড়া বা জন্তু-জানোয়ারের নামই বাদ পড়ছে না!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা কী? এই ভাবে পোকামাকড়, গাছগাছড়া আর জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানবদলের নামকরণ করবার ব্যবস্থা কেন? এ কি শুধুই আমাদের দেশের মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য নাকি? আসল তা নয়। এ হলো মানবজাতিরই সমাজ-সংগঠনের এক আদিম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। মর্গান(৮১) লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে সর্বত্র প্রথা হলো জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে গোষ্ঠীর নামকরণ করা। কিন্তু এই প্রথাটিকে যদি আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় দেখতে চান তাহলে আপনাকে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে। কেননা, সে-দেশের আদিবাসীদের মধ্যেই কোনো কোনো দল আজো খুবই আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকে এই প্রথার একেবারে আদিম রূপটি আজো লুপ্ত হয়নি।

ওজিবওয়া নামের একদল আমেরিকান আদিবাসীদের ভাষা-ব্যবহার থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রথাটির নাম গ্রহণ করেছেন। নামটা হলো টোটম-বিশ্বাস(৮২)।

কী রকমের বিশ্বাস? পুরো একদল মানুষ মনে করছে কোনো এক জন্তু বা কোনো এক গাছ থেকে তাদের সকলের জন্ম: তারা সকলেই ওই জন্তুর বা গাছের বংশধর। আর তাই জন্যেই, তাদের কাঙারু-দলের সকলে ভাবে, কাঙারু

থেকেই তাদের দলের সবাইকার জন্ম, তাই তারা সবাই-ই কাঙারু। সূর্যমুখী-
দলের সবাই ভাবে, সূর্যমুখী থেকেই তাদের দলের সবাইকার জন্ম, তাই তারা
সবাই সূর্যমুখী। ওজিবওয়াদের ভাষায়, কাঙারুদলের কাছে কাঙারুই হলো দলের
টোট্টেম, সূর্যমুখী দলের কাছে সূর্যমুখীই হলো দলের টোট্টেম। আধুনিক
বৈজ্ঞানিকরা তাই পুরো ব্যাপারটারই নাম দিচ্ছেন টোট্টেম-বিশ্বাস।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই সামগানরত কুকুরগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে
এখানে বিশেষ করে দুটি প্রশ্ন আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত, ভারতীয় প্রাচীন পুঁথিপত্রে সত্যিই এই টোট্টেম-বিশ্বাসের চিহ্ন
পড়ে রয়েছে কিনা?

দ্বিতীয়ত, টোট্টেম-বিশ্বাসের চিহ্ন থেকে ঠিক কোন ধরনের সমাজ-
সংগঠন অনুমান করা দরকার।

৮১. H. L. Morgan AS 86.

৮২. Ibid 170.

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিতে টোটেম-বিশ্বাসের চিহ্ন

বেদাদি প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রে টোটেম-বিশ্বাসের চিহ্ন যে স্পষ্টভাবেই টিকে রয়েছে এ-কথা বোধ হয় হপকিন্স ছাড়া আর কোনো আধুনিক পণ্ডিত খুব জোর গলায় অস্বীকার করেন না। তাই, বিশেষ করে হপকিন্স-এর যুক্তিটাই এখানে বিচার করা দরকার। ওল্ডেনবার্গ-এর গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন(৮৩):

Our learned author, who is perhaps too well read in modern anthropology, seems to gibe the absolute dictum that animal names of persons and clans imply totemism. This is no longer a new theory. On the contrary, taken in so universal an application it is a theory already on the wane, and it seems to us injudicious to apply it at random to the Rigveda, As a means of explanation it requires great circumspection, as is evinced by the practice of American Indians, among whom it is a well known fact that animal names not of totemic origin are given, although many of the tribes do have totem-names. For example, in the Rigveda, Cucumber and Tortoise certainly appear to indicate totemism. But when we hear that Mr. Cucumber was so called because of his numerous family we must remain in doubt whether this was not the real reason. Such family events are apt to

receive the mocking admiration of contemporaries. Again, Mr. Tortoise is the son of Gritsamada, a name smacking strongly of the sacrifice, a thoroughly priestly name, and it is not his ancestor but his son who is called Tortoise, very likely because he was slow. The descendents of his son will be called "sons of the tortoise", but there is no proof of totemism; on the contrary, there is here direct evidence that totemistic appearance may be found without totemism. We can scarcely believe that Gritsamada's ritualistic educated son ever worshipped the tortoise.

Clearly enough, it is in the later literature that one is brought into closest rapport with the anthropological data of the other peoples. This is due to the fact that the more the Hindus penetrated into India the more they absorbed the cult of the un-Aryan nations, and it is from this rather than the refined priestliness of the Rigvedic Aryans that one may get parallels to the conceptions of Cis-Indic Barbarism.

পুরো উদ্ধৃতিটির তর্জমা করবার দরকার নেই, উদ্ধৃতির প্রতিটি যুক্তি খুঁটিয়ে বিচার করবারও নয়। তার বদলে বিশেষ করে নজর করা যাক, বৈদিক

সাহিত্যে টোটম-বিশ্বাসের চিহ্ন অস্বীকার করবার আশায় হপকিন্স কোন ধরনের পাল্টা মতবাদ দাঁড় করবার চেষ্টা করছেন।

উদ্ধৃতির মধ্যেই দু' রকম চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এক: বৈদিক সাহিত্যের যেখানে যেখানে জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকে মানুষের নামকরণ করবার ব্যবস্থা দেখা যায় সেখানেই আসল উদ্দেশ্যটা হলো ঠাট্টা-তামাসা। জন্তুটার কোনো একটা লক্ষণের সঙ্গে মানুষটির কোনো লক্ষণ মিলে গেলে মানুষটিকে সেই জন্তুর নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ধরুন, আজকালকার দিনে কেউ খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটলে তাকে ঠাট্টা করে আমি-আপনি হয়তো বক বলবো, কিংবা প্রচণ্ড গলায় চিৎকার করবার স্বভাব থাকলে বলবো ষাঁড়! তেমনই, হপকিন্স বলছেন, গৃৎসমদের পুত্রটি নিশ্চয়ই গুটিগুটি নড়তেন, আর সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে কাছিম বলা হয়েছে।

কিন্তু, এই মতবাদ মানা সত্যিই মুস্কিল। বৈদিক ঋষিদের রসিকতার উৎসাহটা হপকিন্স-এর মতো প্রবল ছিলো কি না সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলেও হপকিন্স-এর মত অনুসারে অন্তত এটুকু মানতেই হবে যে রসিকতার উদ্দেশ্যে তাঁরা একেবারেই পাত্রাপাত্রজ্ঞানহীন হয়ে পড়তেন এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা রসিকতা করতেন জানোয়ারটির সঙ্গে কোনো রকম আপাত-সাদৃশ্যের পরোয়া না করেই। গোতম ঋষির সঙ্গে গোরুর মিল কোথায়, বৎস-র সঙ্গে বাছুরের মিল কোথায়, শুনক ঋষির সঙ্গে কুকুরের মিল কোথায়, মাণ্ডক্যেয় ও কৌশিকের সঙ্গে বাঙাটি আর প্যাঁচার মিল কতটুকু-এ-সব প্রশঙ্গ অবশ্যই প্রাচীন পুঁথিপত্রের কোথাও আলোচনাই হয় নি। না হয় ধরেই নিলাম, উক্ত ঋষিদের সঙ্গে উক্ত জন্তু-জানোয়ারের লক্ষণগত সাদৃশ্য ছিলো এবং তারই প্রচ্ছন্ন উল্লেখ ঋষিদের সম্বন্ধে ওই রকম বিদ্রূপমূলক নামের আড়ালে। কিন্তু তাহলেও ঠিক কোন ধরনের পরিহাস-প্রিয়তায় মেতে সেকালের ঋষিরা বৈদিক শাখাগুলিকে সাপ, ব্যাঙ নাম দিয়েছিলেন, তা বোঝবার মতো কল্পনার দৌড় আমাদের সত্যিই নেই।

দুই: হপকিন্স যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছেন পরবর্তী যুগের পুঁথিপরে পৌঁছে। কেননা, এখানে টোটম-বিশ্বাসের চিহ্ন পাওয়া গেলেও তার কলঙ্ক থেকে বৈদিক আর্ষদের বাঁচবার একটা সহজ উপায়ও তিনি পাচ্ছেন: বৈদিক আর্ষরা যতোই ভারতবর্ষের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততোই স্থানীয় অনার্যদের অনেক রকম স্থূল ও প্রাকৃত বিশ্বাস তাদের সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেছিলো। অর্থাৎ কিনা, টোটম-বিশ্বাসটির জন্যে দায়ি করে দেওয়া গেলো শুধু ওই ছাই-ফেলতে-ভাঙা-কুলো স্থানীয় অনার্য জাতিগুলোকে।

আর ঠিক এইটেই হলো আর্ষ-অনার্য মতবাদের আসল ফাঁদ। ঐতিহাসিক ভাবে এ-মতবাদ যে শেষ পর্যন্ত কতোখানি দাঁড়াবে সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু এই মতবাদই যে বৈদিক মানুষগুলির ইতিহাসকে বুঝতে দারুণ বাধার সৃষ্টি করে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, বৈদিক সাহিত্যে এই বৈদিক মানুষগুলিকে সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়েই দেখা যাক না কেন, বৈজ্ঞানিক ভাবে এ-কথা মনে করা অসম্ভব যে তাদের কোনো অতীত ছিলো না-বুঝি শুরু থেকেই তারা সমাজ-বিকাশের ওই পর্যায়ের জীবনযাপন করতো। কেননা, মানবজাতির যে-কোনো শাখার কথাই ভাবা যাক না কেন, পশুর রাজ্য পিছনে ফেলে সভ্যতার পর্যায়ে উঠে আসবার পথে প্রত্যেককেই সমাজ-বিকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ পার হতে হয়েছে। কিন্তু আর্ষ-অনার্য মতবাদ অনেক সময় বৈদিক মানুষদের ওই পিছনে-পড়ে-থাকা পর্যায়গুলিকে অস্বীকার করবার আয়োজন করে। কেননা, বৈদিক সাহিত্যে সে-পর্যায়ের কোনো চিহ্ন দেখলে উক্ত মতবাদের প্রভাবে এগুলিকে অনার্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করা বিশ্বাস বলে ব্যাখ্যা করবার প্রলোভন হয়। বৈদিকসাহিত্যে টোটম-বিশ্বাসের চিহ্নগুলিকে ব্যাখ্যা করবার আশায় হপকিন্স যা বলেছেন তা এই প্রলোভনেরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। যদিও, বৈদিক সাহিত্যের তুলনায় উত্তর

যুগের সাহিত্যে টোটেম-বিশ্বাসের পরিচয় সত্যিই বেশি প্রকট, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়—হপকিন্স-এর প্রতিজ্ঞাটিও খুব সম্ভব ভ্রান্ত।

কিন্তু হপকিন্স-এর সবচেয়ে হাস্যকর যুক্তি হলো: ঋষি গৃৎসমদের যাগযজ্ঞবিদ পুত্রটি কোনোদিন সত্যিই কাছিম পূজো করেছেন কিনা তা খুবই সন্দেহের কথা। বৈদিক সাহিত্যে টোটেম-বিশ্বাসের চিহ্ন অপ্রমাণ করবার আশায় হপকিন্স এটিকেও একটি মূল্যবান যুক্তি মনে করছেন! অথচ এ-কথা সত্যিই হাস্যকর; কেননা, টোটেম-বিশ্বাসকে ভুল বোঝবার—বা একেবারেই না-বোঝবার—এ হল প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এবং দুঃখের বিষয় যে-সব বিদ্বানেরা বৈদিক সাহিত্যে টোটেম-বিশ্বাসের চিহ্ন স্বীকার করেন তাঁরাও(৮৪) এ-বিশ্বাসের স্বরূপ সম্বন্ধে, এবং বৈদিক সাহিত্যে এ-বিশ্বাসের চিহ্ন খুঁজে পাবার তাৎপর্য সম্বন্ধে, খুব সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাবার চেষ্টা করেন নি।

৮৩. E. W. Hopkins in PAOS-1894. CLIV.

৮৪. Oldenberg ইত্যাদি। A. B. Keith RPVU 46, 47, 49, 54, 74
ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

টোটম বিশ্বাস ও আদিম সাম্যসমাজ

ভারতবর্ষের প্রাচীন পুঁথিপত্রে টোটম-বিশ্বাসের চিহ্ন যে রয়েছে এ-কথা বলায় নিশ্চয়ই আজকের দিনে আর তেমন কোন অভিনবত্ব নেই। কেননা, বহু গবেষকই আজ এ-কথা স্বীকার করছেন। কিন্তু এ-জাতীয় চিহ্নের প্রকৃত তাৎপর্য কী? এই প্রশ্ন নিয়ে এখনো খুব স্পষ্ট আলোচনা হয় নি। তার কারণ, টোটম-বিশ্বাস বলতে প্রায়ই একরকম আদিম ধর্মবিশ্বাস মনে করা হয়; অথচ টোটম-চিহ্ন থেকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয় তা এক রকমের সমাজ-সংগঠন।

Unfortunately, many writers have used the term totemism very loosely for any beliefs and practices dependent upon some supposed connection between animals and persons. The term should be restriction between animals and persons. The term should be restricted to those cases where a systematic association of groups of persons with species of animals (occasionally plants or inanimate objects) is connected with a certain element of social organizations.(৮৫)

দুঃখের বিষয় অনেক লেখকই টোটম-বিশ্বাস বলে নামটি অসাবধান ভাবে ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণায় জন্তু-জাওয়ারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-সূচক যে-কোনো বিশ্বাস বা ক্রিয়াকর্মকেই এ-নাম দেওয়া যায়। শব্দটি শুধুমাত্র সেই সব দৃষ্টান্তের মধ্যে আবদ্ধ রাখা দরকার যেখানে মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জানোয়ারের সুপরিবন্ধিত সম্পর্কের কথা একরকম সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত।

ওই সমাজ-সংগঠনের কথাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। টোটেম-বিশ্বাস থেকে সেই সমাজ-সংগঠনকে অনুমান করা দরকার।

কোনো ধরনের সমাজ-সংগঠন? একমাত্র উত্তর হলো: আদিম সাম্য-সমাজ, যে-সমাজে ছোটো-বড়োয়তফাত দেখা দেয় নি-সামাজিক শক্তির দিক থেকে নয়, ঐশ্বর্যের দিক থেকেও নয়। সবাই সমান, সবাই স্বাধীন, মানুষে মানুষে সত্যিই ভাই-ভাব ভাব। মনে রাখতে হবে, এই আদিম সাম্য-সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। অন্তত প্রাচীন মিশরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির এই অভ্যুত্থান-ইতিহাস স্পষ্ট ভাবে উদ্ধার করেছেন মরেট আর ডেভি(৮৬)। ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরদের সামগানটুকু বোঝবার জন্যে অবশ্যই ওই টোটেম-সমাজের ধ্বংসকাহিনী বা রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান-কাহিনী নিয়ে আলোচনা তোলবার দরকার নেই। দরকার হলো, টোটেম-সমাজের স্বরূপটিকে চেনবার। এ-বিষয়ে মরেট এবং ডেভির সিদ্ধান্তই উদ্ধৃত করা যাক:

The true totemic society, remarks M. Moret, knows neither kings nor subjects. It is democratic or communistic; all the members of the clan live in it on a footing of equality with respect to their totem.(87)

অর্থাৎ, এম. মরেট বলছেন, প্রকৃত টোটেম-সমাজে না আছে রাজা না প্রজা। এ-সমাজ গনতান্ত্রিক, বা সাম্যবাদী; গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষই টোটেমটির সম্পর্কে সমানে সমান।

কিংবা

The active and passive subjects of obligation are collective in the regime of the totemic clan. Power, like responsibility, still has therein in undivided character. We are in the presence of a communal and equalitarian society in the bosom of which participation in the same totem which constitutes the essence of each and the cohesion of all, places all members of the clan on the same footing.(b b)

অর্থাৎ, টোটেম-গোষ্ঠীর পর্যায়ে কর্তব্যের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দুটো দিকই সমষ্টিগত। দায়িত্বের মতোই শক্তিরও তখন পর্যন্ত অবিভক্ত অবস্থা। আমরা এক সাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজের সম্মুখীন হই যার মধ্যে একই টোটোমে অংশগ্রহণ করবার দরুন সকলেরই সমান অবস্থা। এবং এই টোটোমের উভয়ই নির্ভর করছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্তা এবং পরস্পরের মধ্যে অঙ্গঙ্গি সম্পর্ক।

এই আদিম সাম্যসমাজের বর্ণনায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে ফেরা যাবে। কিন্তু এখানে একটি সমস্যার অবতারণা করে রাখা যায়: টোটোম-সমাজ যদি সত্যিই এরকম অবিভক্ত সাম্যসমাজ হয় তাহলে তারই আওতায় কোনো রকম ধর্মচেতনা সত্যিই কি সম্ভবপর? মনে রাখা দরকার, ধর্মচেতনার মূল কথা হলো উপাস্য-উপাসকে প্রভেদ। যাঁরা ভুল করে টোটোম-বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস মনে করছেন তাঁদের ধারণায় সমাজ-বিকাশের ওই আদিম পর্যায়ে এক এক দল মানুষ এক একটি জন্তু-জানোয়ার বা গাছপালাকেই ভগবানের সামিল মনে করেছিলো: দলের সকলের কাছে দলের টোটোমটিই উপাস্যের স্থান দখল করেছিলো। কিন্তু টোটোম-বিশ্বাসকে ভাল করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, এ মতবাদ ঠীক নয়। যে-

দলের টোটেম হলো সূর্যমুখী ফুল সে-দলের প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্যমুখী ফুল মনে করছে। উপাস্য-উপাসকের তফাতটা কোথায়? আর যদি তাই হয়, তাহলে টোটেম-বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাসেরই কোনো আদিম পর্যায় মনে করবার সত্যিই অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, টোটেম-সমাজ ভেঙে যখন রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে,—যখন আদিম সাম্যের বদলে সমাজের সবটুকু শক্তি ও ঐশ্বর্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছে শাসকের হাতে,—তখনই প্রকৃত অর্থে ধর্মবিশ্বাসের জন্ম। অবশ্যই, সমাজ-বিকাশের ওই নবপর্যায়ে আদিমকালের টোটেমটি যে বিলুপ্ত হতে বাধ্য এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অন্তত তার জাতবদল হতে বাধ্য। তাই নতুন পর্যায়েও প্রায়ই সেই পুরোনো জানোয়ারটিকে খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু তখন আর সে আদিম টোটেম নয়, তার বদলে এক নবজাত দেবতা। তফাতটা কম নয়: টোটেম-সমাজে যে-জানোয়ারটির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত একাত্মবোধ ছিলো রাষ্ট্রের উৎপত্তির পর দেখা গেলো তারই সামনে মানুষেরা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা-উপাসনা শুরু করেছে!

প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে উদ্ধার করবার প্রচেষ্টায় এই টোটেম-চিহ্নের গুরুত্ব মরেট এবং ডেভির গবেষণায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির উৎপত্তি এবং ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি নিয়ে আমরা যখন আলোচনা তুলবো তখন স্পষ্টই দেখা যাবে এঁদের গবেষণা আমাদের পক্ষে কতোখানি সহায়ক। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে যা স্পষ্ট ভাবে জানা গিয়েছে, তারই সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আজো যা অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে তা বোঝবার পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপাতত আমাদের চেষ্টা হলো, ছান্দোগ্যের ওই সামগানরত “কুকুরগুলি” কে সনাক্ত করা। আশা করি টোটেম-বিশ্বাস নিয়ে যেটুকু আলোচনা তোলা হয়েছে তার সাহায্যে ওই কুকুরগুলিকে চিনতে আর কোনো অসুবিধা হবে না।

সামগান আর অন্তর্আহরণ

কুকুর মানে তাহলে সত্যিই কুকুর নয়। মানুষ। তবে আমার-আপনার মতো এ-কালের মানুষ নয়। টোটম-সমাজের মানুষ। সে-সমাজের প্রধান লক্ষণ হলো, একান্ত দলগত বা গোষ্ঠীগত জীবন। ছোটোয়-বড়োয় তফাত নেই,-শক্তির দিক থেকে নয়, ঐশ্বর্যের দিক থেকেও নয়। তাই এই সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্য-সমাজ। শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগেকার পর্যায়ের এই সমাজে পরান্নজীবী হিসেবে কারুরই স্থান নেই-দলের কাজে সবাইকেই যোগ দিতে হয়। অর্থাৎ, শ্রমের দায়িত্ব গ্রহণের দিক থেকেও সবাই সমান।

উপনিষদের মধ্যে এ-হেন একটা টোটম-সমাজের স্পষ্ট ছবি কেমন ভাবে টিকে থেকেছে তা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে! কেননা, উপনিষদে মোটের উপর যে-সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় তা আর যাই হোক সাম্যসমাজ নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজই। অথচ মানতেই হবে, যেমন করেই হোক নতুন পর্যায়ের সাহিত্যেও পুরোনো পর্যায়ের স্মারক থেকে গিয়েছে। ঠিক কী করে টিকে থাকলো তার স্পষ্ট জবাব দিতে না পারলেও ওই সমাজের ছবি যে টিকে রয়েছে এ-কথা কোনো মতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সমাজ-বিকাশের ওই পুরোনো পর্যায়টির কথা মনে না রাখলে ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরগুলির বাকি আচরণটুকুও বোঝা যাবে না। অপর পক্ষে ওই সামাজিক পটভূমিটিতে বিচার করতে পারলে উপনিষদের এই অংশটির বাকি প্রায় প্রতিটি কথারই স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

একে একে বাকি কথাগুলির আলোচনা তোলা যাক।

স্বাধ্যায়-অশ্বেষী বক দালভ্য, ওরফে গ্লাব মৈত্র্যেয়, কী দেখলেন? প্রথমত একটি সাদা কুকুর: সাদা বিশেষণটি বয়স-ব্যঞ্জক কিনা তা বোঝবার উপায় নেই। হতেও পারে, না হতেও পারে। যদি প্রাচীনত্বসূচকই হয় তাহলে তাকে ওই

কুকুরদলের মধ্যে প্রাচীন বলতে বাধা হবে না। তার প্রতি অন্য কুকুরদের আচরণটাও দলপতি-সূচক। তাই সাদা বলতে ‘সাদা চুল’ –এমন অর্থ খুব বেশি অসম্ভব নাও হতে পারে।

কিন্তু তা হোক আর নাই হোক, তার প্রতি অন্য কুকুরদের অনুরোধটা আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব আর আজগুবি মনে হয়: তাদের ক্ষিদে পেয়েছে, তারা অন্ন চায়—এ-পর্যন্ত বুঝতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু অন্নলাভের উপায় হিসেবে অপর কুকুরগুলি যা বললো তার কোনো রকম তাৎপর্য যে থাকতে পারে তা আমাদের পক্ষে ভাবাই কঠিন। সাদা কুকুরটিকে ঘিরে অন্য কুকুরেরা বললো: ক্ষিদে পেয়েছে, অন্ন চাই, অতএব একটা গান গাও।

অন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম্

কুকুরদের ছোটো মুখে এ-হেন একটা বড়ো কথা শুনে আধুনিক যুগের অনেক নন্দনতত্ত্ববিদ নিশ্চয়ই বিলক্ষণবিরক্ত হবেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে আজ অনেকেই খুব জোর-গলায় ঘোষণা করছেন: Art for Art’s sake—শিল্প নিছক শিল্পের খাতিরেই। অনাশক্ত ও নির্লিপ্ত রসসম্ভোগ ছাড়াও শিল্পের যে আর কোনো রকম উপযোগিতা থাকতে পারে এ-কথা আজকের যুগে নানাভাবে অস্বীকার করা হয়।

অবশ্যই, নন্দনতত্ত্বের এ-জাতীয় মতবাদ হলো ভাববাদী মতবাদ—অভিনব গুপ্ত থেকে ক্রোচে পর্যন্ত যে-মতবাদের প্রচারক। কিন্তু ছান্দোগ্যের ওই কুকুরগুলি ভাববাদ কাকে বলে তা জানে না! তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আগাগোড়াই বস্তুবাদী।

নন্দনতত্ত্বের মতাদর্শের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গেও কুকুরদের ওই কথাগুলির যেন আকাশ-পাতাল

তফাত। আমরা আজ এমন একটা যুগে বাস করছি যেখানে সংগীতের সঙ্গে অন্ন আহরণের কোনো রকম কার্যকারণ সম্পর্ক একেবারে অসম্ভব ও আজগুবি কল্পনা বলেই মনে হবার কথা।

তবু, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, উপনিষদের ঋষিদের কাছে সম্পর্কটার সম্ভাবনা অতো অসম্ভব বা আজগুবি ছিলো না। এবং এর কারণটাও রহস্যজনক নয়: আমরা বাস করি আধুনিক সমাজে, এবং আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাই আমাদের ধ্যানধারণার উৎস। উপনিষদের ঋষিরা বাস করতেন প্রাচীন সমাজে, এবং সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাই তাঁদের ধ্যানধারণার উৎস ছিলো। তাঁদের ওই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আমাদের আধুনিক সমাজের অনেক তফাত, তাঁদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণারও অনেক তফাত। তাই, তাঁদের ধ্যানধারণার সঙ্গে আমাদের ধ্যানধারণারও অনেক তফাত। তাই, তাঁদের স্মৃতি থেকে সংগীতের সঙ্গে অন্ন-আহরণের সম্পর্কটা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, যে-রকম বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের মন থেকে।

উপনিষদ-সাহিত্যে যদি শুধুমাত্র কুকুরদের ওই সামগানের দৃশ্যটিই সংগীতের সঙ্গে অন্নআহরণের কার্যকারণ-সম্পর্ক-সূচক হতো তাহলেও কথাটাকে উড়িয়ে দেবার উপায় থাকতো না। কিন্তু উপনিষদের সাক্ষীর জোর অনেক বেশি, কেননা, দেখা যায় ওই সম্পর্কের কথা বারবার ঋষিদের চিন্তায় উঁকি দিচ্ছে। এখানে দু' -একটা নমুনা উদ্ধৃত করা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লেখা আছে:

অথাত্বনেহ্নাদ্যমাগায়দ্যদ্বি কিংচান্নমদ্যতেহনেনৈব তদদ্যত ইহ
প্রতিতিষ্ঠতি।।১।৩।১৭।।

অর্থাৎ, অনন্তর নিজের জন্য অন্নাদিকে গান করিয়া লাভ করিয়াছিলেন।
কেননা, যে-কিছু অন্ন ভুক্ত হয় তা ইহার দ্বারাই ভুক্ত হয়, ইহাতে (অন্নতে)
প্রতিষ্ঠিত থাকে।

গানের সাহায্যেই যে অন্ন লাভ করা গিয়েছে এ-কথা উপনিষদের ঋষিদের মনগড়া কথা নয়। তাঁরা লিখছেন, স্বয়ং দেবতারাও এই কথাটি স্বীকার করে গিয়েছেন। বৃহদারণ্যকে তাই বলা হয়েছে:

তে দেবা অক্রবন্নেতাবদ্ধা ইদং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোহস্মিন্নন্ন
আভজস্বেতি...।।১।৩।১৮।।

অর্থাৎ, সেই দেবগণ বলিলেন, এ-পর্যন্ত এই যে অন্ন সেই অন্নকে নিজের
জন্য গান করিয়া লাভ করিয়াছ। এখন (পশ্চাৎ) আমাদের সেই অন্নে
অংশী করো...

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপনিষদের যুগ পর্যন্ত খোদ দেবতারাও মানতেন
যে অন্নলাভার্থে গানের কার্যকারিতা আছে। গান শুধুমাত্র অবসর-বিনোদন নয়,
উৎপাদন-পদ্ধতির অঙ্গও।

অন্নলাভের সঙ্গে গানের কোনো যোগ থাকা সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে
আজকের দিনে আমার-আপনার একটা মত থাকতে পারে, আছেও নিশ্চয়ই।
কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা মোটেই তা নিয়ে নয়। আমরা শুধু দেখতে
চাইছি, প্রাচীনদের ধারণা অনুসারে এ-রকম কোনো যোগাযোগ মানা দরকার
কিনা।

প্রাচীনদের ধারণায় গানের সঙ্গে অন্নের যোগটা যে কতো ঘনিষ্ঠ তার
অন্যান্য পরিচয় উপনিষদেই দেখতে পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষিরা উদগীথ
শব্দটিকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করতে চান তাই দেখুন। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা
হয়েছে, তাই উদগীথের অক্ষরগুলিকে সম্যকভাবে বুঝতে হবে (উপাসীত):

खलुदनीथाक्फराण्युपासीतोदनीथ इति प्राण एवोऽं प्राणेन ह्यङ्गिर्घृति वाग्
गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्फतेहन्नं थमन्ने हीदं सर्वं स्थितम् ।।१।३।७।।
अर्थाऽ, अनन्तर उदनीथेर अक्फरसमूहके उपासीत । उदनीथ एहः प्राणह
हहल उऽ अक्फर, केनना, प्राणेर दारहइ उङ्गिर्घृ हय । वाक्-इ हहल गी
अक्फर, (केनना) वाक्केह गी बला हय । अन्नह हहल थम् एह अक्फर,
(केनना) एह समुदय अन्नैरह अवस्थित ।

तहले, सामगानेर ओह उदनीथ बले नामटिके भेङ्गे देखलेह देखते
पाबेन, तार मध्ये अन्नैर अभाव नेह! एवऽ ए-कथा एकालेर कोनो
चिन्ताशीलेर कल्लना नय-स्वयं ऋषिदेर दस्तुखऽ करा दलिल ।

सामगानेर सङ्गे अन्नैर सम्पर्क नये उपनिषदे आरु कथा लेखा आछे ।
सामगानेर चतुर्थ पर्यायटिके बले प्रतिहार-आधुनिक पङ्गितदेर तर्ज्माय
response । छान्दोग्य-उपनिषदेह प्रश्न उठेछे, एह प्रतिहारेर अनुगमनकारी
देवताटिर स्वरूप नये । उषन्ति चाक्रायनके प्रश्न करा हयेछिलो, के सेह
देवता? प्रश्नेर शर्तटा अवशहइ खुब कठिनः एह देवताके ना जेने उषन्ति
चाक्रायन यदि प्रतिहार-कर्म करने तहले तार माथा काटा याबे । उन्तरे उषन्ति
चाक्रायन या बलेछिलेन ता सतियेह विस्मयकरः

अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति
सैषा देवता प्रतिहारमन्वायन्ता तां चेदविद्वान् प्रत्यहरिष्ये मुर्धा ते
व्यपतिष्यन्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ।।१।१।१९।।

अर्थाऽ, तिनि बलिलेन, अन्नह सेह देवता । एह समुदय भूतह अन्न
आनयन करिया (प्रतिहरमाणानि=प्रति+ह्+शानच्=आनयन करिया) जीवनधारण

করে। সেই দেবতাই প্রতিহারের অনুগমন করেন। তাকে না জানিয়াই আপনি যদি প্রতিহার-কর্ম করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনারই শির নিপতিত হইবে।

ঊষস্তি চাক্রায়ণের শির নিপতিত হয়েছিলো—এমনতরো কোনো কথা উপনিষদে লেখা নেই। বরং, ঊষস্তি চাক্রায়ণের সংবাদ ওইখানেই শেষ হলো। তার থেকেই বোঝা যায়, উপনিষদের ওই অংশে তাঁর এই কথাগুলিই উপনিষদের ঋষিদের কাছে এ-বিষয়ে চরম প্রতিপাদ্য ছিলো।

তাহলে, উপনিষদের ওই কুকুরগুলি গানের সঙ্গে—সামগানের সঙ্গে—অন্ন-আহরণের সম্পর্ক উল্লেখ করে এমন কোনো কথা বলছে না যা কিনা সাধারণভাবে উপনিষদের ঋষিদের মতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং, উপনিষদের ঋষিদের চেতনায় এই সম্পর্কের কথাটা যেন এই স্থির বিশ্বাসের মতো—বারবার তা ঘুরে আসছে দেখা যাক।

গান আর কাজ

কিন্তু ব্যাপারটা কী? আমাদের আধুনিককালের ধারণার সঙ্গে এই কথাগুলির সঙ্গতি নেই। আর তা যদি না থাকে তাহলে এগুলিকে বোঝবার একমাত্র উপায় হতে পারে আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবেশটিকে ছেড়ে প্রাচীন সমাজের দিকে চেয়ে দেখা, সন্ধান করা যে এমন কোনো সমাজব্যবস্থা সত্যিই সম্ভব কিনা যেখানে গান আর খাদ্য-উৎপাদন সত্যিই অঙ্গাদি সম্পর্কে সংযুক্ত।

সত্যিই কি ওই রকম কোনো সমাজের খবর জানা আছে? আছে। সে-সমাজ অবশ্যই খুব পিছিয়ে-পড়া সমাজ—তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ নিশ্চয়ই আদিম সাম্যসমাজ, যদিও আদিম সাম্যসমাজ ভেঙে যাবার পরও মানুষের চিন্তায় কাজের সঙ্গে গানের যোগাযোগটির রেশ বহুদিন ধরেই থেকে গিয়েছে।

বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সুবিধে হবে অধ্যাপক জর্জ টমসনের(৮৯) রচনা অনুসরণ করলে।

অধ্যাপক টমসন শুরু করছেন একেবারে গোড়ার কথা থেকে। গান বা সংগীতের জন্ম হলো কী করে? এ-কথা বুঝতে হলে ভাষার জন্মবৃত্তান্তও মনে রাখা দরকার। কেননা, বাক বা ভাষা ছাড়া গান হয় না—অন্তত আধুনিক যুগের বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতের বেলায় যাই হোক না কেন, পুরোনো আমলে ভাষা বাদ দিয়ে গানের কথা ভাবা যায় না। উদগীথের শব্দার্থ-বিশ্লেষণে ঋষিরাও বলছেন, বাক-ই গী(৯০)! কিন্তু ভাষার জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করতে হলে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত নিয়েও আলোচনা তুলতে হয়, কেননা, মানুষের পক্ষে পশুজগৎ ছেড়ে আসবার পরিচয় প্রধানত দু' দিক থেকে: হাতিয়ার আবিষ্কার ও ভাষা আবিষ্কার। জানোয়ারেরা হাতিয়ার বানাতে পারে না, কথা কইতে পারে না—পৃথিবীতে শুধুমাত্র মানুষই তা পারে।

মানুষের পক্ষে হাতিয়ার আবিষ্কার এবং ভাষা আবিষ্কার—দুটো খুব স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ উৎপাদন-কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারলো। কিন্তু গোড়ার দিকে কারুর পক্ষেই এই উৎপাদন-কাজ একাএকা সম্পাদন করা সম্ভব নয়—দশহাত এক হয়ে একসঙ্গে কাজ করেছে। আর এরই দরুন পরস্পরের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলো—সেই তাগিদেই মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোজিত হতে লাগলো অর্থ: মানুষ আর জানোয়ারদের মতো চিৎকার করে না, রীতিমতো কথা বলে। পুরো দলের ওই একান্ত দলগত কাজটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার তাগিদেই মানুষের ভাষা উন্নত হতে লাগলো। তাই গোড়ার দিকে হাতের কাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অঙ্গভঙ্গি(৯১)।

শিশুরা কথা বলবার সময় খু বেশি অঙ্গভঙ্গি করে যদি মানবজাতিরও শৈশবকে পরীক্ষা করা যায় তাহলে চোখে পড়ে কথা বলার সঙ্গে হাত নাড়ানোর যোগাযোগটা কতো ঘনিষ্ঠ। আমরাও হয়তো মুখের কথাকে ভালো করে বোঝাবার জন্যে অল্পবিস্তর হাত নাড়াই—অঙ্গভঙ্গি করি। কিন্তু অসভ্য মানুষদের বেলায় ঠিক তা নয়—অন্যেরা যাতে কথাটাকে আরো ভালো করে বুঝতে পারে এইজন্যে তারা হাত নাড়ায় না। কেননা, বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, ওরা যখন আপন মনে কথা বলে তখনো প্রচুর অঙ্গভঙ্গি করে(৯২)। আমাদের কাছে কথাটাই মূখ্য, অঙ্গভঙ্গিটুকু গৌণ। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তা নয়। কেননা, হাতের কাজের সংগেই তাদের মুখের ভাষা ফুটেছিল। আদিম মানুষদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করেছেন তাঁরাই বলছেন, ওদের বেলায় মুখের ভাষাটা অনেকাংশেই হাতের অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক টমসন নিজের দিচ্ছেন থ্রে, স্মাইথ, রটে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের(৯৩)। অর্ধশতাব্দী আগেই এই সব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বৃশের(৯৪) প্রমাণ করতে ছিলেন, হাতিয়ার-ব্যবহারের দরুন পেশীগুলিতে যে-জোর পড়ে তারই প্রতিবর্তী-ক্রিয়া হিসেবে স্বরতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের গলায় ভাষা ফুটে উঠেছিলো। তারপর, হাতের

কাজের যতো উন্নতি হয়েছে ততোই উন্নত হয়েছে স্বরতন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের চেতনাও উন্নত হতে হতে একটা পর্যায়ে পৌঁছে দেখা গেলো এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটিকেই তারা সচেতনভাবে ভাবের আদান-প্রদান কাজে নিযুক্ত করতে পারছে।

শ্রমের সঙ্গে ভাষার এই সংযোগটিকে আজো খুঁজে পাওয়া যায় শ্রম-সঙ্গীত বা ‘কাজের গান’ -এর মধ্যে। যে-সব দেশে কলকারখানার শব্দে শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর একেবারে চাপা পড়ে যায় নি সেই সব দেশে কলকারখানার শব্দে শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর একেবারে চাপা পড়ে যায় নি। সেই সব দেশে ওই শ্রম-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া একটুও কঠিন নয়(৯৫)। নৌকো বাওয়ার গান, ধান কাটার গান থেকে শুরু করে ছাদ পেটাবার গান বা শ্রমিকদের পক্ষে প্রকাণ্ড ভারি কিছু টানবার সময়কার গানগুলোকে একটুখানি নজর করলেই বোঝা যাবে, এ-সব ক্ষেত্রে কাজ শুধুমাত্র হাতের উপর নির্ভর করছে না, ভাষার উপরও নির্ভর করছে, অবশ্যই সে-ভাষার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সুর। তারই নাম গান। এ-গান মোটেই অবসর-বিনোদন নয়-কাজের অঙ্গ। বিশজন শ্রমিক মিলে যখন একটা ভারি কাজ করছে তখন সর্দার দাঁড়িয়ে গানের দায়িত্ব নিয়েছে এবং সে নিজে কাজে হাত লাগাচ্ছে না বলে বাকি শ্রমিকদের মনে কোনো বিক্ষোভ নেই। কেননা, তার ওই গানের দরুনই বাকি বিশজনের পক্ষে অমন শ্রমসাধ্য কাজটাও সহজসাধ্য হয়। গান এখানে শ্রমকে সাহায্য করছে-সবাইকেই একসঙ্গে একতালে একটি কাজ করার অবস্থায় এনে প্রত্যেকেরই শ্রমলাঘব করছে।

অসভ্য মানুষদের মধ্যে এই শ্রম-সঙ্গীদের তাৎপর্য আরো অনেক স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। যখনই তারা কোনোরকম শ্রমসাধ্য কাজে লিপ্ত হয় তখনই যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের ম্যখে গান জেগে ওঠে। মেয়েরা দৈনন্দিন কাজ ছাড়া করতে পারে কিনা সন্দেহ(৯৬)!

বূশের প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কাজের তাল থেকেই মানুষের ভাষায়
ছন্দের জন্ম হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী
কালের গবেষণায়।

৮৯. G. Thomson SAGS ch. Xiv.

৯০. ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.৩.৬।

৯১. G. Thomson FP ch. I.

৯২. G. Thomson SAGS 445.

৯৩. Ibid 446.

৯৪. Ibid

৯৫. Ibid

৯৬. Ibid

গান-কাজ-নাচ

কিন্তু শ্রমসঙ্গীদের তাৎপর্য-গানের সঙ্গে কাজের আদিম যোগাযোগটির রহস্য-স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে আরো কয়েকটি দিকে নজর রাখা দরকার।

প্রথমত, অসভ্য মানুষদের মধ্যে-এবং পিছিয়ে-পড়ে-থাকা সভ্য মানুষদের মধ্যেও-কাজের সঙ্গে শুধুমাত্র গানেরই যোগাযোগ নয়। তাছাড়াও নাচের যোগাযোগ। বস্তুত, আদিতে নাচ ছাড়া গান সম্ভবই নয়। কিংবা, ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, আদিম মানুষদের মধ্যে নাচ-কাজ-গান-সবসুদ্ধ একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে(৯৭)। তার মধ্যে কতোটা ঠিক নাচ, কতোটুকু নিছক কাজ এবং কতোটুকু শুধুমাত্র সংগীত-এ-ধরনের তফাত করবার চেষ্টাই কৃত্রিম।

দ্বিতীয়ত, এই যে নাচ-কাজ-গান-এর তাৎপর্যটুকু বিচার করতে দেখতে পাওয়া যায় মানুষের পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় উৎপাদন-কাজের পক্ষে নাচগান বাহুল্য তো নয়ই, বরং অনিবার্যভাবেই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রয়োজনীয়(৯৮)।

এই দ্বিতীয় কথাটিকে মনে না রাখলে ছান্দোগ্য-বর্ণিত কুকুরদের সামগান কিছুতেই বোঝা যাবে না। তাই এ বিষয়টিকেই বিশ্লেষণ করে এগোবার চেষ্টা করা যাক।

উৎপাদন-কৌশলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে দশজন মিলে একসঙ্গে একই কাজে হাত না লাগালে কাজটাই অসম্ভব। তার কারণ কাজের হাতিয়ার তখন এমনই স্থূল যে কারুর পক্ষেই একা একটি পুরো কাজ করবার উপায় নেই। তাই সে-অবস্থায় নিজে নিজে কোনো কাজ করবার কথা ওঠে না, কাজ যা তা ওই পুরো দলটিরই।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই মানুষের হাতিয়ার ধারালো হয়েছে, উন্নত হয়েছে তার উৎপাদন কৌশল।

উন্নতির একটি পর্যায়ে পৌঁছে দেখা গেলো একজন মানুষ নিজে একটা গোটা কাজ করতে শিখেছে। ওই একটি কাজের জন্যে দশজনে আর একসঙ্গে হাত লাগাতে বাধ্য নয়। প্রত্যেকেই যে-যার কাজ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে যৌথ-প্রেরণার প্রয়োজন যে মিটলো তা নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করতে, কিন্তু সকলে মিলে দল হিসেবে কাজ করবে। বরং যে-যার নিজের কাজের দায়িত্ব নিতে পারবার দরুনই যৌথ-প্রেরণার প্রয়োজনটা বাড়বার কথা: এখন আর দশ-হাত প্রত্যক্ষভাবে এক জায়গায় মিলছে না, তাই মনের দিক থেকে প্রত্যেকের কাছেই সাহসের আর বিশ্বাসের চাহিদাটা বেশি হয়েছে।

কিসের সাহস? কোন ধরনের বিশ্বাস?

যদিও একজনের নিজের উপর গোটা কাজটার দায়িত্ব পড়েছে তবুও আসলে সে একা নয়—দলের সবাই তার সঙ্গেই রয়েছে। তারই সাহস।

কোন বিশ্বাস থেকে এ-ধরনের সাহস পাওয়া সম্ভব? যাদু বিশ্বাস।

কাজে বেরুবার আগে সবাই মিলে এক হয়ে একই কামনা করবে।

শুধু তাই নয়, সবাই মিলে এক হয়ে একসঙ্গে দেখবে ওই কামনাটি সফল হবার ছবি।

কাজ শুরু হবার আগেই কামনা সফল হবার এই ছবিটি কেমন করে দেখতে পাওয়া সম্ভব? বাস্তবে নয় নিশ্চয়ই। কল্পনায়। আর কল্পনার ছবিটি দেখবার জন্যেই আদিম মানুষের পক্ষে নাচ-গানের আয়োজন: পুরো দলকে ডাক দিয়ে তারা একসঙ্গে মিলা নাচবে আর গান করবে—নাচটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ, গানটার আগাগোড়াই হলো কামনা সফল হবার অনুকরণ। এইভাবে কামনা সফল হবার ছবিটি দেখতে দেখতে পুরো দল মেতে উঠবে, মেতে উঠে কাজে বেরুবে। দলের মাতন—সে তো আর যেমন-তেমন নয়। সেই সাহসে বুক বেঁধে বেরুতে পারলে কেউই আর নিরুপায় নয়, দুর্বল নয়। অর্থাৎ কিনা, ওই নিরুপায়-বোধ বা দুর্বলতা-বোধটি মন থেকে কেটে যায়।

আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানুষের দল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় টিকে রয়েছে তাদের চেতনায় কাজের সঙ্গে নাচ-গানের সম্পর্কটা কী রকম তাই দেখা যাক।

শ্রীমতি জেন হ্যারিশন বলছেন:

When a savage wants sun or wind or rain, he does not go to church and prostrate himself before a false god; he summons his tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt and catch a bear, he does not pray to his god for strength to outwit and outmatch the bear, he rehearses his hunt in a bear dance.(৯৯)

আদিম মানুষ যখন রোদ, হাওয়া বা বৃষ্টি চায় তখন সে দেবালয়ে গিয়ে কোনো অলীক দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না। সে ডাক দেয় নিজের গোষ্ঠীকে এবং রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচতে শুরু করে। ভালুক শিকার করবার আগে ভালুকটিকে হারিয়ে দেবার জন্যে সে তার দেবতার কাছে শক্তি ভিক্ষে করে না; ভালুক নাচ নেচে শিকারের মহড়া দিয়ে নেয়।

শ্রীমতি জেন হ্যারিশন(১০০) দেখিয়ে চলেছেন, মেক্সিকোর তারাহুমাতে নামের মানুষদের মধ্যে ‘নাচা’ আর ‘কাজ-করা’ –দুটি বিষয় বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র শব্দ নেই। একই শব্দের ওই রকম দুটো মানে। দলের নাচে যোগ না দিয়ে যদি কোনো ছোকরা বসে থাকে তাহলে বুড়োরা তাকে ধমক দিয়ে বলবে, কুঁড়ের মতো বসে না থেকে কাজে লাগছো না কেন? বয়েস বাড়ি বোঝাবার

জন্যে ওরা বলে, নাচের সংখ্যা বাড়া। দলের নাচে যোগ না দিতে পারলে মানুষ কপাল চাপড়ে বলে, এ-রকম অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

নাচ-গানের সঙ্গে কাজের এই যে যোগাযোগ এর মূলে রয়েছে আদিম মানুষদের একটি অদ্ভুত বিশ্বাস। তার নামে যাদুবিশ্বাস-ইংরেজীতে বলে ম্যাজিক। কী রকমের বিশ্বাস? কল্পনায় প্রকৃতিকে জয় করতে পারলে বাস্তব ভাবে প্রকৃতিকে জয় করাও সত্যিই সম্ভবপর হবে। কল্পনায় জয় করা মানে কী? জয়ের একটা নকল তোলা,—কামনা সফল হয়েছে তারই যেন অভিনয় করা। আকাশে বৃষ্টি চাইলে ওরা দলের সবাইকে ডাক দিয়ে শুরু করবে বৃষ্টির নাচ: আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির নকল তুলবে, বাজনা বাজিয়ে নকল করবে মেঘের ডাক, আর ওরা ভাববে এইভাবে কামনা সফল হওয়ার নকল করে সত্যিই বুঝি কামনাকে সফল করা সম্ভব হবে।

ওদের কাছে, আসল কাজের সঙ্গে যাদুবিশ্বাসের তফাতটা তেমন স্পষ্ট নয়। যাদুবিশ্বাস ছাড়া ওদের পক্ষে বাঁচাই কঠিন-কেননা, ওদের হাতিয়ারের অবস্থা এমনই করুণ যে, মন থেকে অন্তত দুর্বলতা-বোধটুকুকে দূর করবার চেষ্টা দরকার। দুর্বলতা-বোধকে দূর করবার কৌশল ওই যাদুবিশ্বাস। আর এই যাদুবিশ্বাসই হলো ওদের নাচ-গানের ষোলো আনা।

মাওরিদের(১০১) মধ্যে এক রকমের নাচ আছে। তাকে বলে আলুর নাচ। ফসলের জন্যে পুব-হাওয়ার দরকার। তাই ওদের দলের তরুণী মেয়েরা ক্ষেতে গিয়ে নাচতে শুরু করে। নাচের আগাগোড়াই হলো ঝড় আর বৃষ্টি আর ফুলফোটা আর ফসল-ফলার অনুকরণ। নাচতে নাচতে তারা গান গাইতে শুরু করে, গানের মধ্যে কামনার প্রকাশ: চারাগুলি যেন তাদেরই অনুকরণ করে। অর্থাৎ, ওই মেয়েরা বাস্তবে যা চায় তাই কল্পনায় ফুটিয়ে তোলে নাচের দোলায়, গানের কথায়। দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে অধ্যাপক জর্জ টমসনের মন্তব্যটুকু ভালো করে দেখা দরকার। তিনি বলছেন, আলুর উপর ওই নাচের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয়ই

সম্ভব নয়, কিন্তু যে-মেয়েরা নাচছে তাদের নিজেদের উপর নাচটির যথেষ্ট প্রভাব পড়তে বাধ্য। নাচতে নাচতে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে এরই দরুন চারাগাছগুলি রক্ষা পাবে। তারপর ওই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তারা যখন গাছগুলির পরিচর্যা করতে লাগলো তখন তাদের আত্মবিশ্বাস আর শক্তিসামর্থ্যের বেড়ে গিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ফসলের উপরও নাচটার প্রভাব পড়ে বই কি। এই নাচেরই দরুন বহির্বাস্তবের প্রতি মেয়েদের মনের ভাবটা বদলায়, ফলে পরোক্ষভাবে এই নাচই বহির্বাস্তবকেও বদল করে(১০২)।

ঠিক একই বিষয় চোখে পড়ে বাংলা দেশের ব্রতগুলির মধ্যে—অবশ্যই, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেগুলিকে বলছেন খাঁটি মেয়েলি ব্রত, এবং যেগুলি কিনা, তাঁর ধারণায়, “পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধ হয়” (১০৩)। অবনীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা দেখুন:

এমনি শস্পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ শস্যের কামনা করছে; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্যে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়হাতে ‘দাও দাও’ করছে তা নয়; সে যে-ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফলস ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানা ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্রমাসের মন্তনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্তনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ। অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং হুঁদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত

হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর শস্য প্রচুর হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন দেওয়া আলপনা; কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তারপর সাত-আট থেকে কুঁড়ি-পাঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদীর চারদিক ঘিরে নাচগান শুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে:

ভাঁজো লো কনকলানী, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পঞ্চফুলের মালা।...

এরপর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখেমুখে ছড়াকাটাকাটি করে।...সমস্ত রাত দুই দলের নাচগান ছড়াকাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি।...

এরপর রাত্রিশেষ, মেয়েরা আপন-আপন শস্পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিংবা নদীতে বিসর্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদগমের কামনা সরাতে শস্যবপন ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হলো এবং অনুষ্ঠান শেষ হলো উৎসবের নৃত্যগীতে...(১০৪)

৯৭. G. Thomson ch. xiv.

৯৮. Ibid.

৯৯. J. E. Harrison AAR 30.

১০০. Ibid 30f.

১০১. G. Thomson SAGS 440.

১০২. Ibid

১০৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার ব্রত ৩।

১০৪. ঐ ৫৩-৩।

ব্রত-প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পুনর্গঠন করবার মালমসলা হিসেবে বাংলার এই ব্রতগুলি সত্যিই অমূল্য। এমনকি, এই একান্ত লোকায়তিক অনুষ্ঠানগুলির সাহায্যেই বৈদিক সাহিত্যের নানান দুর্বোধ্য তথ্য বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ-বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ করে মনে রাখা দরকার:

খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্য়জাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছি দেখি। এ-দু' -এরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দু' -এর মধ্যে এইজন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে(১০৫)।

অবনীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন, বৈদিক সূক্তে উষাকে, নদীসকলকে উদ্দেশ্য করে যে-রকম কবিতা রচনা হয়েছিলো খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে প্রায় তারই পুনরুক্তি পাওয়া যায়(১০৬)। এবং এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার আর্য়-অনার্য মতবাদ সাধারণত আমাদের পণ্ডিতমহলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত:

আর্য় এবং আর্য়পূর্ব দু' জনেরই সম্পর্ক যে-পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দু' জনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস; দু' জনে

ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন-ইন্দ্র আমাদের সহান হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শক্ররা দূরে পলায়ন করুক, ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে- ‘রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতি হব’ । এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি-

বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।

এই যে পৃথিবীর যা-কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এবং ‘গোক’ লে গোকূলে বাস, গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন হয় স্বর্গে বাস’ -এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয়, ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথায় বিহঙ্গম বিহঙ্গম দুটির তুলনা করা যেতে পারে। দু’ জনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, উদার পৃথিবীর গান; আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার কাকলি-কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা(১০৭)।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, ব্রতের সঙ্গে বেদের সাদৃশ্য সত্ত্বেও একটি মৌলিক অমিল রয়েছে: বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের। বামাচার-প্রসঙ্গেও আমরা এই রকমই একটি প্রভেদ লক্ষ্য করেছি: বৈদিক সাহিত্যে বামাচারের স্মারকগুলি পুরুষপ্রধান, লোকায়তিক বামাচার স্ত্রীপ্রধান।

এই প্রভেদের কারণ ঠিক কী-সে প্রশ্নের আলোচনায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত, সাদৃশ্যের দিকটিতেই মনোযোগ দেওয়া যাক। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা, দু’ -এর মূলেই কামনা হলো এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্যে স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস। দার্শনিক পরিভাষায়, দুই-ই প্রাক-অধ্যাত্তবাদ, প্রাক-ভাববাদ। আমাদের যুক্তি অনুসারে তার কারণ অস্পষ্ট নয়: দু’ -এর উৎসেই রয়েছে প্রাগ-বিভক্ত সমাজ-জীবন। যে-চেতনায় প্রাগ-বিভক্ত সমাজ-জীবন প্রতিফলিত তার মধ্যে অধ্যাত্তবাদের বিকাশ হবার অবকাশ নেই।

ব্রতের মধ্যে সমাজ-জীবনের কোন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবি, সে-প্রশ্ন অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তোলেন নি। কিন্তু তবুও তাঁরই নানা মন্তব্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় ব্রতের সঙ্গে প্রাগ-বিভক্ত সমাজের যোগাযোগ অন্বেষণ করবার দিকে। প্রথমত, তিনি বলছেন, এই আদি অকৃত্রিম ব্রতগুলি অতি প্রাচীন-আর্যরা এ-দেশে আসবার আগে থাকতেই এ-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিলো(১০৮)। ব্রতগুলি যদি সত্যিই অতো পুরোনোকালের হয় তাহলে তার মধ্যে সমাজ-বিকাশের অতি প্রাচীন পর্যায়ের প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পাওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, বাংলা দেশের এই ব্রতগুলিকে বোঝবার কৌশল হিসেবে তিনি যে-পদ্ধতির কথা বলছেন তারও ঙ্গিতটা একই রকম: পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজো যে-সব মানুষ সমাজ-বিকাশের অনেক আদিম পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের আচরণ থেকে এগুলিকে বোঝবার সূত্র পাওয়া যাবে। বস্তুত, বাংলা দেশের লক্ষ্মীব্রতটি বোঝবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্যদের(১০৯) আচরণ থেকেই আলো সংগ্রহ করছেন। বাংলার ব্রতের সঙ্গে এ-জাতীয় আদিবাসীদের ক্রিয়াকর্মের যদি মিল থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করবার সুযোগ থাকে যে, দু’ -এর মূলেই অনুরূপ সমাজ-

বাস্তব। তৃতীয়ত, ব্রতের সঙ্গে প্রাগ-বিভক্ত সমাজের সম্পর্কের ইঙ্গিত
অবনীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখা যায়:

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে
ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া,
কিন্তু ব্রত তখন যখন দশে মিলে এককাজ এক-উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের
মোটামুটি আদর্শ এই হলো—এদের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে
একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন যে মিলছে,
কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে, সেটা দেখবার বিষয় হলেও
আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নের এখন যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ
অলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার
উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুই-ই ক্রিয়া—
কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বন্ধ এবং
উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার
সফলতাই তার শেষ—এই তফাত(১১০)।

একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন মিলছে—অবনীন্দ্রনাথ সেই জটিল প্রশ্নে
গেলেন না; কিন্তু এ-সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্রতের সমস্যা জটিল হয়েই
থাকবে। তিনিই যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন সেই পথে অগ্রসর হলে আমরা
হয়তো এই প্রশ্নেরও উত্তর পেয়ে যাবো। তাই আমরা এখানে আর একটি প্রশ্ন
তুলতে চাই: পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব আদিম মানুষের দল বেঁচে
রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণতভাবে এমন কোনো কথা জানা আছে কিনা যার
সাহায্যে ওই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, বোঝা যাবে একের সঙ্গে অন্য দশজনে
কেন মিলছে।

এ-বিষয়ে শ্রীমতি জেন হ্যারিশনের(১১১) গবেষণা থেকে মূলবান তথ্য পাওয়া যায়:

One element in the rite we have already observed, and that is that it be done collectively, by a number of persons feeling the same emotion. A meal digested alone is certainly no rite; a meal eaten in common under the influence of a common emotion, may, and often does tend to become a rite.

Collectivity and emotional tension, two elements that tend to turn the simple reaction into a rite, are—specially among primitive peoples—closely associated, indeed scarcely separable. The individual among savages has but a thin and meagre personality; high emotional tension is to him only caused and maintained by a thing felt socially; it is what the tribe feels that is sacred, that is matter for ritual. He may make by himself excited movements, he may leap for joy, for fear; but unless these movements are made by the tribe together they will not become rhythmical; they will probably lack intensity, and certainly permanence.

আদিম অনুষ্ঠানের (rite) একটি অঙ্গ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি; সেটি হলো তার সম্পাদন যৌথভাবে করা দরকার,—একাধিক মানুষ একই আবেগ অনুভব করবে। একা একা খেতে বসলে তা কখনো অনুষ্ঠান

হবে না; একই আবেগের বশে একসঙ্গে খেতে বসলে তা অনুষ্ঠান হতে পারে এবং প্রায়ই দেখা যায় তা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।

বিশেষত, আদিম মানুষদের মধ্যে দেখা যায় যে-দুটি উপাদান সাধারণ ক্রিয়াকে অনুষ্ঠানে পরিণত করতে চায়,—অর্থাৎ, যৌথভাব আর আবেগের চাপ-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত ও এমনকি অবিচ্ছেদ্য। আদিম মানুষদের মধ্যে ব্যাপ্তির ব্যক্তিত্ব নেহাতই ক্ষীণ...। সে হয়তো একাএকা উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে আনন্দে, ভয়ে; কিন্তু পুরো গোষ্ঠী যতোক্ষণ না এই ক্রিয়ায় মেতে ওঠে ততোক্ষণ তা ছন্দোময় হবে না; তার মধ্যে সম্ভবত তীব্রতা থাকবে না, স্থায়িত্ব তো নয়ই।

তাহলে ব্রতের ওই বৈশিষ্ট্যটিকে—একের সঙ্গে অন্য দশজনে কেন মিলছে তা—বুঝতে পারবার মূলসূত্র পাওয়া যাবে আদিম মানুষদের আচরণ থেকেই। আদিম সমাজে একের কোনো সত্তা নেই, একার পরিচয়টা নেহাতই ক্ষীণ। তার দশে মিলে একসঙ্গে এক হয়ে যখন কিছু করে তখনই কাজটি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যায় আদিম সমাজ-জীবনে যাদুবিশ্বাসের উপযোগিতাটুকুও। মনে রাখতে হবে দশজন মিলে একই সঙ্গে একই কথা ভাবছে, একই কাজ করছে। তাদের চোখের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি। একার সামনে নয়। একের সামনে নয়। দশজনে এক হয়েছে। একই কথা ভাবছে। একই ছবি দেখছে। দেখতে দেখতে মেতে উঠছে পুরো দশটা। দলের মাতন—সে তো আর যেমন-তেমন নয়। কামনা সফল হবার ছবিটা অবশ্যই কাল্পনিক, কিন্তু পুরো দলটির পক্ষে ওই ভাবে মেতে ওঠাটা নিশ্চয়ই কাল্পনিক নয়। আর তারই সাহায্যে কামনাকে বাস্তবভাবে সফল করবার চেষ্টাও অনেকখানি সফল হতে পারে বই কি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতের যে-সব দিকগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার জন্যে আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যে-দিকগুলির আলোচনা তিনি তোলেন নি সেগুলি সম্বন্ধেও আমাদের পক্ষে উদাসীন থাকবার উপায় নেই। এই দিকগুলির মধ্যে প্রধানতই, ওই যাদুবিশ্বাসের এবং জীবনধারণের পক্ষে সে-বিশ্বাসের উপযোগিতার দিকটি। ব্রতের প্রাণ-বস্তু হলো যাদুবিশ্বাস-মানুষ যা কামনা করে ব্রত করছে ব্রতের মধ্যে সেই কাজটিই সফল হবার একটা নকল করা হচ্ছে, এবং নকল যে করা হচ্ছে তা প্রধানত এই বিশ্বাস থেকেই যে, মানুষ যা করবে প্রকৃতিতে বাস্তবিকই তাই ঘটবে। “তাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা” –মেয়েরা এই গান করছে মনের আনন্দকে প্রকাশ করবার তাগিদে নয়, তাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ওই ভাবেই ভাঁজো সত্যিই কলকলিয়ে উঠবে, ফলবে প্রচুর শস্য। কিংবা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই যেমন বলছেন, “মেস্কিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজায় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছাগোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়” (১১২)। কিন্তু শুধু কামনাই নয়, কামনা সফল হওয়ায় বিশ্বাসও। সেই বিশ্বাস হলো যাদুবিশ্বাস।

প্রাচীন-সমাজে তাই নাচগান অবসর-বিনোদন নয়, সৌন্দর্য উপভোগ নয়। এগুলির উৎসে রয়েছে যাদুবিশ্বাস। এবং এই যাদুবিশ্বাসকে উদ্দেশ্যহীন অন্ধ সংস্কার মনে করাও ভুল হবে। কেননা, যতোদিন পর্যন্ত মানুষের উৎপাদন-কৌশল অনুন্নত ততোদিন কাজের জন্যেই যাদুবিশ্বাসের অতো প্রয়োজন। এই কারণেই আদিম যুগে গান আর অন্ন-আহরণ সত্যিই আলাদা হয় নি।

সমাজ-বিকাশের সেই রকমই এক প্রাচীন পর্যায়ের ছবি টিকে রয়েছে ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশটিতে। ছবিটা যে প্রাচীন সমাজেরই তার প্রমাণ হলো মানুষগুলির ওই রকম অদ্ভুত বর্ণনা: কুকুর।

যে-মানবদলকে অমন সরাসরি কুকুর বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তাদের কাছে গান অবসর-বিনোদন নয়; ক্ষুন্নিবৃত্তির-অতএব, অন্নপ্রাপ্তির-উপায়ই।

অন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়ম

কার কোনো দেশের আর কোনো প্রাচীন পুঁথির মধ্যে সংগীতের আদি-তাৎপর্য-সংক্রান্ত এমন স্পষ্ট ও অদ্রান্ত দলিল পাওয়া যায় কিনা খুবই সন্দেহের কথা(১১৩)। কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশের তাৎপর্য শুধু এইটুকুই নয়। তাছাড়াও আরো কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা দরকার।

১০৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার ব্রত ২।

১০৬. ঐ ২-৩।

১০৭. ঐ ৪-৫।

১০৮. ঐ ৭।

১০৯. ঐ ২১ ইত্যাদি।

১১০. ঐ ৮।

১১১. J.E. Harrison AAR 37.

১১২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলার ব্রত ২১।

১১৩. প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্যাবলি অধ্যাপক জর্জ টমসনের রচনায় দ্রষ্টব্য।

কামনা ও যাদুবিশ্বাস

যাদুবিশ্বাস থেকেই সংগীতের জন্ম। যাদুবিশ্বাসের মূল কথা হলো, কোনো এক কামনা। এই কামনাকে কল্পনায় সফল করে প্রাচীন মানুষ মনে করেছে যে বাস্তবিকই তা বুঝি সফল হতে চললো।

উপনিষদের ঋষিদের স্মৃতি থেকেও এই আদিম সত্যের উপলব্ধি সত্যিই মুছে যায়নি। ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হচ্ছে:

তস্মাদু হৈবৎবিদুদগাতা ক্রযাত্ ॥১৭৮॥

*কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্ঠে য এবং বিদ্বান্গাম গায়তি
সাম গায়তি ॥১৭৮॥*

*অর্থাৎ,...সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদগাতা বলিবেন: 'তোমার
কোন কাম্যবস্তুকে গান করিব' ? কেননা, যিনি এই প্রকার জানিয়া
সামগান করেন তিনি কামগানকে শাসন করেন। হিউম্-এর তর্জমা
অনুসারে: For truly he is the lord of the winning of desires
by singing...(১১৪)*

মূলে রয়েছে, 'কামগানস্য'। শব্দটার মানে কী? মূলে রয়েছে, 'কামম্
আগায়ানি'। কথাগুলির মানে কী? যদি গান সম্বন্ধে আধুনিক যুগের
ধ্যানধারণাকেই একমাত্র সম্বল করে উপনিষদের এই ধরনের উক্তিগুলি বোঝবার
চেষ্টা করা হয় তাহলে সে-চেষ্টা সফল হবার সম্ভবনা নেই। অপরপক্ষে, আজো
পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ে
আটকে পড়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জানতে-পারা তথ্যকে অবলম্বন
করে যদি এ-জাতীয় উক্তি বোঝবার চেষ্টা করা যায় তাহলে তার তাৎপর্য উদ্ধার

করা এতোটুকুও কঠিন হবে না। কেননা, সমাজ-বিকাশের ওই প্রাচীন পর্যায়ে পড়ে-থাকা মানুষগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গানের উৎসে যাদুবিশ্বাস। এবং এই যাদুবিশ্বাসের প্রাণ হলো তীব্র কামনার আবেগ।

গানের সঙ্গে যাদুবিশ্বাসের যোগ যে কতো নিবিড় তার স্মৃতি উপনিষদের ঋষিদের মন থেকে মোটেই মুছে যায় নি। ছান্দোগ্য থেকেই অনেক দৃষ্টান্ত আহরণ করা যায়:

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স
প্রস্তাবো বর্ষতি স উদনীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ উদগৃহ্নাতি
তন্নিধনং ॥২।৩।১।।

বর্ষতি হ্যস্মৈ বর্ষযতি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং
সামোপাস্তেন ॥২।৩।২।।

অর্থাৎ, বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে: বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু উখিত হয় তাহাই হিঙ্কার, মেঘ উৎপন্ন হয় তাহাই প্রস্তাব, বৃষ্টি পতিত হয় তাহাই উদনীথ, বিদ্যুৎ চমকায় ও গর্জন করে তাহাই প্রতিহার, বৃষ্টিপাত শেষ হয় তাহাই নিধন। যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চপ্রকাশ সামের উপাসন করেন তাঁহার জন্য মেঘ বর্ষণ করে এবং বর্ষণ করাইতে পারেন।

‘উপাসীত’ কথাটার আদি অর্থ কী তা নিয়ে নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ আলোচনা তোলবার অবকাশ আছে(১১৫)। কিন্তু সে-আলোচনা বাদ দিলেও অন্তত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে উপনিষদের এখানে প্রাচীন সমাজে ভূয়ঃ-প্রচলিত বৃষ্টিযাদুরই স্বাক্ষর। সামগানের উৎসে যে যাদুবিশ্বাস তার প্রমাণ এর চেয়ে আর কতো স্পষ্ট হবে?

উপনিষদের ঋষিদের ধারণায় অন্ন প্রভৃতি একান্ত পার্থিব বস্তু লাভের সঙ্গে গানের-সামগানের-সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ তার আরো কয়েকটি নমুনা ছান্দোগ্য থেকেই উদ্ধৃত করা যাক। এই নমুনাগুলি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, কুকুরদের মুখে ‘অন্নং নঃ ভগবান আহায়তু’ কথাটি খাপছাড়া তো নয়ই, ঋষিদের চিন্তাধারার সঙ্গে এর সঙ্গতি খুবই স্পষ্ট:

...অন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদগীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত...
।।১।৩।৭।।

অর্থাৎ, যিনি এই প্রকার জানিয়া উদগীথের অক্ষরসমূহকে উপাসনা করেন তিনি অন্নবান ও অন্নভোজ্ঞা হন।

কিংবা,

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্তোবাচ যাবত্ত এনং
প্রজাযামুদগীথং বেদিস্যন্তে পরোবরীযো হৈভ্যস্তাবদস্মিঞ্জোকে জীবনং
ভবিষ্যতি।।১।৯।৩।।

অর্থাৎ, শৌনক অতিধন্বা উদগীথবিষয়ে উপদেশ দিয়া উদরশাণ্ডিল্যাকে বলিয়াছিলেন, যে-পর্যন্ত তোমার সন্তানদের মধ্যে এই উদগীথবিষয় জানা থাকিবে সেই-পর্যন্ত তাহাদিগের জীবন এই পৃথিবীতে এই সমুদয় লোকের অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠবস্তু-সম্পন্ন হইবে।

কিংবা,

পশুসু পঞ্চবিধং সামোপাসীত...।।২।।৬।।১।।

ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুসু পঞ্চবিধং
সামোপাস্তে।।২।।৬।।২।।

অর্থাৎ, পশুসমূহে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবে।...যিনি ইহাকে এই
প্রকার জানিয়া পশুসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসন করেন, পশুসমূহ
তাঁহার ভোগ্যবস্তু হয় এবং তিনি পশুমান (পশুশালী) হন।

কিংবা,

দুক্ষেহস্মৈ বাগ্দ্দাহং যো বাচো দোহোহন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং
বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে।।২।।৮।।৩।।

অর্থাৎ, যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া বাক্যে সপ্তবিধ সামের উপাসনা
করেন, তিনি অন্নবান ও অন্নভোজা হন। বাক্যের যাহা দুষ্ক বাক্য স্বয়ং
তাহা তাঁহার জন্য দোহন করে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

উপনিষদের ঋষিরা আর যাই হোন, Art for Art's sake-এর থিয়োরি
শেখেন নি। তাঁদের স্মৃতিতে সংগীতের আদি-উদ্দেশ্যের কথা রীতিমতো
স্পষ্টভাবেই টেকে ছিলো। অবশ্যই, অনেক সময় ওই আদি-উদ্দেশ্যের সঙ্গে
রকমারি পরবর্তী-সমাজের ধারণাকে মিশেল হতে দেখা যায়। কিন্তু সেইটেই
বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো, তাঁদের চেতনা থেকে সংগীতের ওই আদি-
উদ্দেশ্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো,
উপনিষদের স্থান-বিশেষে,—যেখানে যেখানে সমাজ-বিকাশের অতি-প্রাচীন
পর্যায়ের স্পষ্টতর স্মারক পাওয়া যায়, সেখানে-সেখানে,—সংগীতের ওই আদি-
উদ্দেশ্যের স্মৃতিটুকুকেও স্পষ্টতরভাবেই টিকে থাকতে দেখা যায়। যেমন,

সামগানরত ওই টোট্টে-গোষ্ঠীটির বেলায়। তারা গান চাইলো,—মনের আনন্দ মেটাবার জন্যে নয়, পেটের জ্বালা মেটাবার কামনায়, অতএব অন্নের কামনাতেই।

১১৪. R. E. Hume TPU 184.

১১৫. আধুনিক আধ্যাত্মিক অর্থে উপাসনা নয়। এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গান আর নাচ

সমাজের পুরোনো পর্যায়ে গান কিন্তু শুধু গান নয়। আর সঙ্গে নাচেরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ: কামনা সফল হবার ছবিটা মানুষ শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। মাওরি মেয়েদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি: গান ছাড়াও ওরা নাচের মধ্যেই পূব-হাওয়ার আর ফুল ফোটার আর ফসল ফলার অনুকরণ করছে, আর ভাবছে এরই দরুন পাওয়া যাবে ফসল। শস্পাতার ব্রতের বেলাতেও একই কথা: ভাঁজকে কলকলিয়ে তোলবার কামনায় মেয়েদের গান, কিন্তু শুধু গানই নয়—ইন্দ্রদ্বাদশীতে তোলবার কামনায় মেয়েদের গান, কিন্তু শুধু গানই নয়—ইন্দ্রদ্বাদশীতে রাতভোর চাঁচের আলোয় তাদের নাচও। বস্তুত, আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে নিছক গান বলে কিছুই চোখে পড়ে না। তার বদলে দেখা যায় গানে-নাচে মেশা এক অনুষ্ঠান, যার প্রেরণা যাদুবিশ্বাসে, যার উদ্দেশ্য কাজ। নাচের সঙ্গে গানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে সমাজ-বিকাশের অনেক পরের পর্যায়ে, আরো পরের পর্যায়ে গানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সুর-তখন থেকেই আজকালকার অর্থে কবিতার জন্ম। এ-বিষয়ে অধ্যাপক জর্জ টমসনের সিদ্ধান্তগুলি(১১৬) নিদিধ্যাসিতব্য। মনে রাখা দরকার, ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতেই তাঁর ওই সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ছান্দোগ্যের সামগান-রত কুকুরগুলির বেলায় কী রকম? সমাজ-বিকাশের যে-পর্যায়ের মানুষ বলে ওদের সনাক্ত করতে হলো সে-পর্যায়ে গান নিছক গান হবার কথা নয়। নিছক গান অবশ্য নয়; তার সঙ্গে কামনার যোগ রয়েছে, কাজের যোগ রয়েছে। কিন্তু নাচের যোগ? সে-বিষয়ে উপনিষদের লেখায় কি কোনো রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

উপনিষদে লেখা আছে, গান শুরু করবার ঠিক আগেই ওরা বহিষ্পবমানের অনুকরণে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সর্পির্ল গতিতে ঘুরেছিলো: তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরন্ধাঃ সর্পিষ্ঠীত্যেবম্‌আসস্পুস্তে । এর মধ্যে ওই সংরন্ধা শব্দটিকে আশ্রয় করেই আধুনিক টীকাকারেরা খোদ মানুষগুলিকে কেমনভাবে একেবারে কুকুর বানিয়ে দেবার উপক্রম করেছিলেন সে-কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবং অর্থবিপর্যয়ের এই আশঙ্কা দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, আধুনিক ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থ নির্ণয় করতে অগ্রসর হবো না।

সে-অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখলে কিন্তু ‘যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ’ শব্দগুলির অর্থবিচার করবার সময়েও আধুনিক কালের ধারণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে যাওয়া ভুল হবে। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ বলতে কী বুঝিয়েছে তা জানা থাকলেই ছান্দোগ্যের আলোচ্য অংশে শব্দগুলি কী বোঝাচ্ছে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহে কোনো কথা বলবার জোর থাকবে না। কেননা, এমন তো হতেই পারে যে, আদিকালের অর্থটা অন্যরকম ছিলো এবং আলোচ্য চিত্রটিতে আদিকালের পরিস্থিতিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

অবশ্যই, এ-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা তোলবার অবকাশ আমরা এখানে পাবো না। কেননা, তাহলে বৈদিক সাহিত্যে যজ্ঞ, ছন্দ ইত্যাদি কথাগুলির আদি তাৎপর্য অনুসন্ধানের অগ্রসর হতে হয়। ‘দ্বিজ’ নামের পরিচ্ছেদে সে-চেষ্টা করবার আগ্রহ রইলো। এখানে সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, পরের যুগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের মানে যাই দাঁড়াক না কেন, আদিযুগে তা পার্থিব সম্পদের কামনার গান ছাড়া আর কিছুই নয়। “যাহা গান করা যায়, তাহার নাম স্তোত্র” । বহিষ্পবমান স্তোত্র কোন গান? সামগায়ী

ঋত্বিকেরা ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্ত গান করেন; ওই সূক্তটি যখন গীত হয় তখন তার নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। এখন ঋগ্বেদের ওই সূক্তটি যখন গীত হয় তখন তার নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। এখন ঋগ্বেদের ওই সূক্তটি যদি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন তার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের ছিটেফোঁটাও নেই। এই সূক্তে নয়টি মন্ত্র রয়েছে, এবং নবম মন্ত্রটিতেই সূক্তের চরম কামনা প্রকাশ করে বলা হচ্ছে:

*হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর
বীৰ্যযুক্ত ধন দান কর।*

সূক্তটির আগাগোড়াই এই রকম পার্থিব কামনা।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, এ-গান তো আর শুধু গলা ছেড়ে গাইবার গান নয়; সোমযজ্ঞের এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গাইবার গান এবং যজ্ঞ মানেই পরলোকতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ। কিন্তু, মুশকিল হচ্ছে, প্রাচীরেরাই এ-ধরনের কথা জোর গলায় বলতে বারণ করে গিয়েছে। কেননা, যদিও উত্তরযুগে যজ্ঞ বলতে স্বর্গাদির কামনামূলক ক্রিয়াকাণ্ডকেই বুঝিয়েছে তবুও যজ্ঞের আদি-অর্থ নিশ্চয়ই তা ছিলো না। একটি প্রমাণ উদ্ধৃতি করা যাক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে,—এবং এক-আধবার নয়, বারবার বলা হয়েছে,—

*যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, আমি তোমাদের অন্ন হইব না, ইহা বলিয়া
চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন,—না, তুমি আমাদের অন্নই
হইবে। দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন... (১১৭)*

কিংবা,—

একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অনুসরণ করিব। তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে অন্বেষণ করিব? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা (অন্বেষণ) করিব।...

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই দেখা যায় কী ভাবে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র পলায়মান যজ্ঞের অনুসরণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণ-ই?) যজ্ঞকে ধরে ফেলেন।(১১৮)

এই উপাখ্যান এবং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের এই জাতীয় উক্তিগুলির তাৎপর্য অবশ্যই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। কেননা, এই ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের যুগ থেকেই আদিম প্রাগ-বিভক্ত সমাজ বদলে শ্রেণীসমাজ ফুটে অঠবার লক্ষণ স্পষ্ট হতে দেখা যায়-এ-যুগে অনাহারের তাড়নায় মানুষ নিজের ছেলে বেচতে শুরু করেছে(১১৯)। আমরা এ-আলোচনায় পরে ফিরবো। আপাতত দেখা যাক উদ্ধৃত অংশগুলিতে কী কী কথা বলা হয়েছে:

এক: প্রাচীনেরাই লিখছেন, ব্রাহ্মণের পরবর্তী যুগে যজ্ঞ বলতে যা বুঝিয়েছে তা যজ্ঞের আদি-অর্থ নয়। পরবর্তী যুগের যজ্ঞ হলো আদি-যজ্ঞের নবাবিষ্কৃত সংস্করণ এবং এ-আবিষ্কার ব্রাহ্মণ-বর্ণের কীর্তি।

দুই: প্রাচীনেরাই লিখছেন, যজ্ঞের আদি-তাৎপর্য ছিলো দেবগণের পক্ষে অন্নের যোগান দেওয়া। তাই যজ্ঞের সঙ্গে পরলোকাদির যে-সংশ্রব তা নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগের অবদান। আদি-যুগে যজ্ঞের তাৎপর্যটুকু নেহাতই পার্থিব। কেননা, ব্রাহ্মণগ্রন্থটিতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, দেবতাদের কাছে যজ্ঞই ছিলো ভক্ষ্য অন্ন লাভের উপায়। 'ভক্ষ্য অন্নে' র অর্থ নিশ্চয়ই অস্পষ্ট নয়; প্রশ্ন হলো: যজ্ঞের

আদি-অর্থ কী? যার সাহায্যে ভক্ষ্য অন্ন পাওয়া যায়, যা চলে গেলে ভক্ষ্য অন্নও চলে যায়, যাকে ফিরে পাবার চেষ্টার মধ্যেই ভক্ষ্য অন্নকেও ফিরে পাবার আশা, তারই নাম যজ্ঞ হয় তাহলে এই যজ্ঞকে অন্ন-উৎপাদনের বা অন্ন-আহরণের কৌশল ছাড়া আর কী হলা যেতে পারে? তাই, পরের যুগে যজ্ঞ শব্দের অর্থ যাই দাঁড়াক না কেন অন্তত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়, কোনো এককালে যজ্ঞ বলতে উৎপাদন-পদ্ধতিই বোঝাতো। যজ্ঞ শব্দের এই আদি-তাৎপর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন এস. এ. দাঙ্গৈ: ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণীবিভাগ ও রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত আর্য়দের আদিম অবস্থায় যে যৌথ উৎপাদন-পদ্ধতি তারই নাম ছিলো যজ্ঞ(১২০)।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্যান্য প্রমাণের আলোচনায় পরে ফেরা যাবে। আপাতত আমাদের যুক্তির পক্ষে যেটুকু কথা প্রাসঙ্গিক শুধু সেইটুকুই প্রতিই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। আমরা বলতে চাই, বহিষ্পবমান স্তোত্র সংযোগে আসর্পণ-ক্রিয়া যজ্ঞে-বিশেষের অঙ্গ,—শুধুমাত্র এই বিষয়ের নজির দেখালেই প্রমাণ হবে না ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য দৃশ্যে সামগাননিরত কুকুরগুলি অন্ন-উৎপাদন বা অন্ন-আহরণ ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে লিপ্ত ছিলো। বরং, আদিম পর্যায়ের এই দৃশ্যটিতে যজ্ঞ-ক্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের উল্লেখ থেকেই আরো অবধারিতভাবেই প্রমাণ হয় যে, এখানে আদিম সমাজের উৎপাদন-প্রক্রিয়ারই— বা আরো নিখুঁতভাবে বললে বলা উচিত, অন্ন-আহরণ-ক্রিয়ারই—বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, যজ্ঞের আদি-অর্থ উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যঞ্জনক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশ থেকে আরো কিছুকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবতারা বললেন, যজ্ঞকে অনুসরণ করেই ভক্ষ্য অন্নেরও অন্বেষণ করতে হবে। কিন্তু কী ভাবে তা করা যায়? ব্রাহ্মণদ্বারা ছন্দোদ্বারা। এই বলে তাঁরা ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করেছিলেন।

এখানে, ব্রাহ্মণ শব্দের আদি-অর্থ সন্ধানে এগোবার অবকাশ নেই।

কিন্তু যজ্ঞের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্কমূলক ইঙ্গিতকেও অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কেননা, আধুনিক নৃত্ত্ববিদেরা বলছেন, সমাজ-বিকাশের আদিম পর্যায়ে,— যৌথজীবনের আবহাওয়ায়,—ছন্দ ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি সম্ভবই নয়(১২১)।

চলতি বাংলাতেই তার স্মৃতি নানান ভাবে থেকে গিয়েছে। ছন্দছাড়া বা ছন্দ-ছাড়া কথাটি কোথা থেকে এলো তা ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভেবে দেখবেন। তাছাড়াও আমরা বলি: কাজের ছিরি-ছাঁদ। ছিরি হলো শ্রী, সৌন্দর্য। ছাঁদ হলো ছন্দ। তাই, সৌন্দর্য ও ছন্দ কী ভাবে ‘কাজ’ -এর বিশেষণ হতে পারে তাও ভেবে দেখা দরকার: “ছিরি-ছাঁদ জিনিসটা আকাশ থেকে পড়েনি। এখানে সমাজের দরকারে। মানুষই তৈরী করেছে এই ছিরি-ছাঁদ। শ্রীর মধ্যে আছে সুন্দর আর মঙ্গল, বাহার আর ব্যবহার। ছন্দের দরুনই এসেছে শ্রী। ছন্দ হলো কাজ। কাজ থেকেই এসেছে সৌন্দর্য আর মঙ্গল” (১২২)।

এখানেও, লোকায়ত-ব্যবহারের সাহায্যে বৈদিক ঐতিহ্যকে বোঝবার সম্ভাবনা থেকে গিয়েছে: “বৈদিক সাতটি ছন্দে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ছন্দের নাম থেকেই বাঁচবার আয়োজন আর সেই সঙ্গে সকলে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে বাঁচবার ভাবটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। বৈদিক ছন্দ আছে সাতটি: গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী, উষ্ণিক, পঙতি, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ। এই নামগুলোর পিছনে উৎপাদন-সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষের বাঁচা-সংক্রান্ত কোনো-না-কোনো কাজ না থেকে পারে না!... ‘উষ্ণিক’ কি উড়কিধান না রবিফসল? ‘ত্রিষ্টুপ’ কি ধানকাটা? ‘জগতী’ মানে তো গোরু। ‘গায়ত্রী’ তো বাঁচাবার উপায়। ‘অনুষ্টুপ’ এসেছে সকলের পরে” ... (১২৩)

এই প্রসঙ্গেই আরো মনে রাখা দরকার, বৈদিক ছন্দ শুধুই কাজের ঢঙ নয়, নাচের তালও। মর্কান্ট তাঁর “চিন্তা ও ভাষার উৎপত্তি” নামের গ্রন্থে(১২৪) এ-বিষয়ে অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। তার আলোচনায় পরে ফিরতে হবে।

আপাতত আমাদের যুক্তি হলো, ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচ্য অংশে “যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোম্যমাণাঃ সংরদ্ধাঃ সর্পস্তীত্যেবম্ আসস্পুন্তে” –প্রাচীন-সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্যের আলোয় এই বর্ণনাটুকু অনুসরণ করে কোনো দক্ষ সংস্কৃতজ্ঞ যদি বৈদিক সাহিত্যের আদি-তাৎপর্য সন্ধানে অগ্রসর হন তাহলে তাঁর পক্ষে এর মূলে কোনো নাচের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হতেও পারে। কেননা, আধুনিক নৃত্বের বহুল তথ্য পর্যালোচনা করে অধ্যাপক জর্জ টমসন(১২৫) নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যাকে মানব সংস্কৃতির আদি-পর্যায় সংক্রান্ত এক সাধারণ সত্য বলা যায়।

The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour.

অর্থাৎ, নাচ গান আর কবিতা—এই তিন রকম চারণশিল্পই শুরুতে এক ছিলো। এ গুলির উৎসে ছিলো যৌথশ্রমে নিযুক্ত মানবদেহের ছন্দ-যুক্ত ক্রিয়া।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক জর্জ টমসন প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নানান দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। দক্ষ ভারততত্ত্ববিদেরা যেদিন সে-কাজে হাত দেবেন সেদিন ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে যুগান্তর আসবে। পদ্ধতিটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আশাতেই আমরা একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এ-পদ্ধতির উপযোগিতা দেখাবার চেষ্টা করেছি: দেখা যাচ্ছে ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই আপাত-অর্থহীন অংশটির অনেকখানিই স্পষ্টভাবে বোঝাবার পথ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আরো দুটি

বিষয়ের আলোচনা তোলা দরকার: এক, কামগানের তাৎপর্য। দুই, বৈদিক দেবতাদের আদি-রূপ।

১১৬. G. Thomas SAGS ch. 14.

১১৭. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ৫৬।

১১৮. ঐ ২৩৮-৪০ এবং ৪৫০-৫১।

১১৯. ঐ শুনঃশেপের উপাখ্যান। এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২০. S. A. Dange IPCS ch. 2.

১২১. G. Thomas SAGS ch. 14

১২২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়: জানবার কথা ৮:৫৮

১২৩. ঐ: ৮:৬৩-৬৪।

১২৪. Moncalm OTS.

১২৫. G. Thomas SAGS 451.

কামগান মানে কী?

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন... ‘সেইজন্য এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্যোগী বলবেন, তোমার কোন কাম্যবস্তু লাভের জন্য গান করবো? যিনি এই প্রকার জেনে সামগান করেন তিনি গানের দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ করতে সমর্থ হন।’

প্রাচীন পুঁথিতে লেখা রয়েছে, কামম্ আগায়ানি।

প্রাচীন পুঁথিতে লেখা রয়েছে, কামগানস্য।

প্রাচীন সমাজের কোন লক্ষণ থেকে এই কথাগুলির তাৎপর্য উদ্ধার করা সম্ভব? এই জাতীয় উক্তি সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ের কোন ধরনের স্মৃতি বহন করছে?

আজো পৃথিবীর নানা জায়গায় যে-সব মানুষের দল সমাজ-বিকাশের প্রাচীন পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে। এবং তাদের দৃষ্টান্ত আলোচনা করে আধুনিক গবেষক বলছেন, প্রাচীন সমাজে নাচগানের মূলে ছিলো যাদুবিশ্বাস: মানুষ যে-কামনাকে সফল করতে চেয়েছে নাচের মধ্যে গানের ভাষায় তারই সফলতার ছবি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। মাওরি মেয়েদের আলু-নাচের সময় তাই পুবহাওয়ার আর ফুলফোটার আর ফসলফলার অনুকরণ; ফসল যাতে এলোচুলের মতো গোছাগোছা হয় সেই আশায় মেক্সিকোর মেয়েরা কোজাগর পূর্ণিমায় তাই এলোকেশী হয়। এই যাদুবিশ্বাসটির বর্ণনা হিসেবে অধ্যাপক জর্জ টমসন(১২৬) বলছেন:

The desired reality is described as though already present.

অর্থাৎ, এক কথায়, কামনা সফল হবার ছবিটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা।

প্রাচীন মানুষদের এই যাদুবিশ্বাসকেই মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করে প্রাচীন সাহিত্যের ‘কামগান’ কথাটিকে বুঝতে হবে: প্রাচীন সমাজে কামনা ছাড়া গান হয় না, কেননা, ওই কামনাকে সফল করে তোলবার কল্পনাই হলো প্রাচীন সংগীতের প্রাণবস্তু।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে কুকুরদের সামগান এই বিষয়টিরই মূর্ত উদাহরণ। তাদের ক্ষিদে পেয়েছিলো, তারা তাই অল্পের আশায় গান চেয়েছিলো। তাই, তাদের গানটিও হলো: ওম্ অদাম, ওম্ পিবাম...। আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি...।

আজকালকার গানের মতো এ-গান একজনে গাইবে আর দশজনে শুনবে—তা নয়। দশজনে এক হয়ে একসঙ্গে গাইবে। কেননা, বাংলার প্রাচীন ব্রতগুলির মতোই এ-গানেরও মূল কথা হলো একটি কামনা এবং ‘একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে’ ওঠা।

আর্যদের আদিপর্ব

ছান্দোগ্যের ওই কুকুরগুলি সত্যিই বড়ো আশ্চর্য মানুষ! সমাজ-বিকাশের আদি-পর্যায় সম্বন্ধে ওরা আমাদের নানান তথ্য দিলো। শুধু তাই নয়। ওরাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বৈদিক মানুষদেরও একটা আরো অতীত ইতিহাস আছে। সেই আদি-পর্যায়ের সঙ্গে উত্তর-পর্যায়ের আকাশ-পাতাল তফাত। কেননা, অন্নলাভার্থে তারা যে-গান জুড়ে দিলো তারই মধ্যে অতীতকালের স্মৃতিকে উদ্ধৃত্ত করবার আয়োজন রয়েছে আর সে আয়োজনের সাহায্যের আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে অতীতকালটা কতোই না অন্যরকম!

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কান পেতে শুনুন:

দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ ইহ আহরৎ

-দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এইখানে অন্ন আহরণ করেছিলেন (বা, বৈদিক প্রয়োগ অনুসারে, আহরৎ=আহরতু, আহরণ করুন)।

উত্তরযুগে সংহিতায় প্রসিদ্ধ এই দেবতাগুলির মাহাত্ম্য যেভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে তার সঙ্গে এই দৃশ্যের কোনো মিল নেই। কেননা, বেদের দেবতাগুলিকে এখানে দেখছি অন্ন-আহরণে নিযুক্ত; অথচ উত্তরকালে এঁদের সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রচারিত হয়েছে তার সঙ্গে আর যাই হোক অন্ন-আহরণ প্রচেষ্টার কোনো সংশ্রব নেই! কিন্তু কুকুরদের গান থেকেই প্রমাণ হয় যে, এককালে তা ছিলো। মানবশ্রম দিয়ে সৃষ্ট অন্নের অংশ গ্রহণ করবার বদলে দেবতারাই অন্ন-আহরণ কাজে অংশ গ্রহণ করতেন! তার মানে, উত্তরকালে শুধুই যজ্ঞ ছন্দ আর সামগানের অর্থই বদলায়নি, বদলে গিয়েছে শ্রমের প্রতি মনোভাব আর তারই অঙ্গ হিসেবে দেবতা নামের তাৎপর্যও। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনার

অবকাশ পাবো, এবং তখনই আমরা দেখবো উক্ত পরিবর্তন অকারণ নয়।
কেননা, এর মূলে রয়েছে মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগের বিকাশ।

কিন্তু শ্রেণীবিভাগের আগে, কোনো এক আদিম যুগে, বৈদিক মানুষেরাই যে প্রাগ-বিভক্ত সমাজে জীবন-যাপন করতো তার স্মৃতি বৈদিক সাহিত্যের অনেক তথ্যই অর্থহীন হয়ে থাকবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি অংশের উল্লেখ করলাম। আধুনিক কালের ধ্যানধারণাকে যদি একমাত্র সম্বল মনে করা যায় তাহলে এই অংশটির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়, কিংবা, বড় জোর এর উপর একটি কাল্পনিক অর্থ আরোপ করে পাণ্ডিত্যের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা করা যায়। অথচ, সমাজ বিকাশের আদিম পর্যায়ের কথা মনে রেখে এবং সে-পর্যায়ের মানুষদের জীবন ধারণ প্রণালী ও ধ্যানধারণা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা জানা গিয়েছে তার উপর নির্ভর করে এই অংশটির অর্থ অনুসন্ধান করলে এর পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই, আমরা এই পরিচ্ছেদে সামগাননিরত কুকুরগুলির কথা দীর্ঘভাবে আলোচনা করলাম এবং দেখাবার চেষ্টা করলাম এমন এক পদ্ধতি সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে যার সাহায্যে প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনেক আপাত-অর্থহীন অংশেরও অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। এবং এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয়েই আমরা মানতে বাধ্য হলাম, উত্তরকালে বেদপন্থী ও বেদনিন্দুকদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রভেদ যতো প্রকটই হোক না কেন বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্মারকের সাহায্যে লোকায়তিক ধ্যানধারণা বুঝতে পারা অসম্ভব নয়। কেননা, বৈদিকই হোক আর লোকায়তিকই হোক, কোনো ধ্যানধারণাই মানবনিরপেক্ষ নয়-মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর উপরই ধ্যানধারণাগুলি নির্ভর করে। এবং বৈদিকই হোক, আর অবৈদিকই হোক, মানবজাতির সমস্ত শাখাই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হবে পথে একের পর এক কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় পেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই পর্যায়গুলির মধ্যে কোনো এক পিছিয়ে-পড়া পর্যায়েই হলো লোকায়তিক

ধ্যানধারণার উৎস-বৈদিক ঐতিহ্যের বাহকেরা উত্তরযুগে সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণাকে যতোই ঘৃণা করতে শিখুন না কেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা এককালে সেই পর্যায়েই জীবনধারণ করতেন আর তাই তাঁদের পরবর্তী কালের রচনাতেও সে-পর্যায়ের ধ্যানধারণার কিছুকিছু স্মারক থেকে গিয়েছে।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের আলোচিত অংশটির কথাই ভেবে দেখুন। এর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাবেন না। পরম পুরুষার্থ হিসেবে এখানে যেটুকুর উল্লেখ তা ভক্ষ্য অন্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, এখানের ধ্যানধারণাটা লোকায়তিক। কিংবা, চর্বণ বা খাওয়াদাওয়ার উৎসাহ থেকেই যদি চার্বাক নাম এসে থাকে(১২৭) তাহলে যারা ‘ওম্ অদাম, ওম্ পিবাম’ বলে গান জুড়ে দিলো তাদেরও চার্বাক ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যায়? এবং আরো বিস্ময়কর কথা হলো, এরা শুধু নিজেরাই চার্বাক নয়-সংহিতায় প্রসিদ্ধ দেবতাদেরও নিজেদের দলে টানছে। বরুণ। প্রজাপতি। সবিতা। তার মানে, এককালে ওই দেবতাগুলিও লোকায়তিক ছিলেন নাকি? কিংবা, ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, সমাজ-বিকাশের এমন কোনো পর্যায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো যে-পর্যায়ে অধ্যাত্মবাদের উৎপত্তি হয়নি। এই সূত্রেই মনে রাখা দরকার, বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে প্রাগ্-অধ্যাত্মবাদী বা লোকায়তিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক দেখে আজকের দিনে আমরা যতোই বিস্মিত হই না কেন, প্রাচীনদের কাছে ঘটনাটি সত্যিই তেমন বিস্ময়কর নয়। কেননা, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই হলেন লোকায়ত-দর্শনের আদিগুরু।

১২৭. চার্বাক নামের গুণরত্ন প্রদত্ত ব্যাখ্যায় এই গ্রন্থের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মার্কসবাদ ও দৃষ্টিদান

এতোক্ষণে আমরা অধ্যাপক জর্জ টমসনের পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় পেলাম।

অধ্যাপক জর্জ টমসন মার্কসবাদী। অধ্যাপক-জীবনের প্রথমার্ধে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হবার গৌরব পেলেও তিনি কেমনভাবে অধ্যাপক-জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীক সাহিত্য বোধবার প্রকৃত পথ খুঁজে পেলেন সে-অভিজ্ঞতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই পথই হলো মার্কসবাদের পথ। গ্রীক সাহিত্য বিচারে তিনি যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন সে-পদ্ধতি হলো প্রাচীন দলিলগুলির উপর মার্কসীয় মূলসূত্রের প্রয়োগ। অবশ্যই, অধ্যাপক জর্জ টমসন আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ হেনরি লুইস মর্গানের গবেষণার উপরও নির্ভরশীল। এবং মর্গানকে নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-এর অনুগামী বলা চলে না, কেননা, সমসাময়িক হলেও মার্কস-এর রচনাবলীর সঙ্গে মর্গানের পরিচয় ছিলো না(১২৮)। তবুও মর্গান তাঁর নিজের পথে অগ্রসর হয়েও, এবং তাঁর নিজের গবেষণার সংকীর্ণ ক্ষেত্রটিতে স্বতন্ত্রভাবে, যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার সঙ্গে মার্কস-এর সিদ্ধান্তের বিরোধ তো নেই-ই, এমনকি আশ্চর্য মিল থেকে গিয়েছে! তাই এঙ্গেল্‌স্(১২৯) বলছেন:

Morgan rediscovered in America, in his own way, the materialist conception of history that had been discovered by Marx forty years ago, and in his comparison of barbarism and civilization was led by this conception to the same conclusions, in the main points, as Marx had arrived at.

অর্থাৎ, চল্লিশ বছর আগে মার্ক্স ইতিহাসের যে-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেন, মর্গানও তাঁর নিজের পথে আমেরিকায় তার পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। এবং বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার তুলনা করার সময় এই ধারণার সাহায্যে তিনি যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি মূলত মার্ক্স-এর সিদ্ধান্তও।

অবশ্যই, মার্ক্সবাদেরই একটি মূল কথা হলো, চরম সত্য বা শেষ সত্য বলে কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভবপর নয়,(১৩০) কেননা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিনের পর দিন নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে সত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ফলে, অধ্যাপক জর্জ টমসনের পক্ষে মর্গানের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করাও যে-রকম তাঁর মার্ক্সবাদেরই পরিচয় তেমনিই মর্গানের কোনো কোনো সিদ্ধান্তকে পরবর্তী যুগের গবেষণা-লব্ধ তথ্য সমৃদ্ধ ও সংশোধিত(১৩১) করার চেষ্টাতেও মার্ক্সবাদ-বিরোধের কোনো পরিচয় নেই।

তাই, অধ্যাপক জর্জ টমসনের পদ্ধতি বলতে প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির উপর মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই বোঝা উচিত নয়। এইভাবে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের উপর মার্ক্সবাদের মূল সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ করে অধ্যাপক জর্জ টমসন মার্ক্সীয় বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করেছেন। কেননা, মূর্ত প্রয়োগের সাহায্যেই মার্ক্সীয় মূল সিদ্ধান্তগুলির সমৃদ্ধি সম্ভবপর। মার্ক্সবাদ অনুসারে প্রয়োগ-নিরপেক্ষ জ্ঞান অর্থহীন ও অবান্তর।

অধ্যাপক টমসনের গবেষণা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও যে ভারতীয় দর্শনের একটি সমস্যার আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তার কারণ আমাদের ধারণাতেও মার্ক্সবাদের সাহায্য ছাড়া প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলির সাক্ষ্য সম্যকভাবে বুঝতে পারবার আর কোনো উপায় নেই। কেননা, পুরোনো পুঁথির তাৎপর্য স্পষ্ট

হলেও অনেক সময় তা আমাদের চোখে পড়ে না। তার কারণ, আমাদেরই এক রকম অন্ধতা। একমাত্র মার্কসবাদের সাহায্যেই সে-অন্ধতা দূর করা সম্ভব।

এই কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি প্রায়ই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। সে-দুর্বোধ্যতার নানা কারণ আছে। তার মধ্যে ভাষাগত কারণ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ভাষাগত কারণ ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে, কেননা, প্রাচীন-পুঁথিগুলি শুধুই যে প্রাচীন ভাষায় লেখা তাই নয়, এগুলির অন্তর্গত ধ্যানধারণাও প্রাচীন। এবং এইজাতীয় প্রাচীন ধারণার সঙ্গে আমাদের আধুনিক ধারণার অনেক সময় মৌলিক তফাত। ফলে, ভাষাগত সমস্যার সমাধান হবার পরও, ওই প্রাচীনকালের ধারণাকে সামনে পেয়ে আধুনিক বিদ্বানের পক্ষে তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার সমস্যাটা বাকি থেকে যেতে পারে। এই কারণেই, প্রাচীন পুঁথি বোঝবার ব্যাপারে ভাষাতত্ত্বগত-ব্যুৎপত্তিই পর্যাপ্ত নয়।

এই রকমেরই একটা যুক্তি দেখিয়ে সেকালে অধিকার-ভেদের(১৩২) কথা বলা হতো। আর আমাদের বলবার কথাটিও শুরু ঠিক এইখান থেকেই। এবং ওই কথাটি পাড়বার আশাতেই আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি আপাত-অর্থহীন অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। সে-অংশের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু শব্দার্থ পাবার পরও অংশটি অনেকাংশে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য থেকে যায়।

কেননা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীনদের এই রচনাটি বোঝবার কোনো উপায় নেই। বুঝতে হলে প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গিটা গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, আধুনিক ধ্যানধারণায় লালিত হয়েছি—তার প্রভাব মুক্ত হয়ে প্রাচীনদের দৃষ্টিকোণটা গ্রহণ করবো কেমনে করে?

এই সমস্যারও সমাধান আছে। সমাধানটা বোঝবার জন্যে প্রধানত দুটি কথা মনে রাখা দরকার।

এক: মানুষের ধ্যানধারণা আকাশ থেকে জন্মায় না; সেগুলির উৎসে রয়েছে মানুষের বাস্তব সমাজ-জীবন। তাই প্রাচীনদের দৃষ্টিকোণটা বোঝবার ব্যাপার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশ পাওয়া যাবে প্রাচীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থেকেই।

দুই: কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রাচীনকালের ঐ সমাজ-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে কেমন করে? বহু শতাব্দী আগেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। তাই, তাঁরা ঠিক কী ভাবে বাঁচতেন তা তো আর আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভবপর নয়। এ-বিষয়ে বড়ো জোর কিছুকিছু পরোক্ষজ্ঞান পাওয়া যায়। বহু শতাব্দীর সঞ্চিত ধুলো সরিয়ে তাঁদের কীর্তির কিছুকিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং এই চিহ্নগুলি থেকে তাঁদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কিছু কথা অনুমান করতে পারা অসম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রাচীনেরা যে-সব সাহিত্যাদি রচনা করে গিয়েছেন সেগুলি থেকেও তাঁদের সমাজ-জীবনের কিছুটা চিত্র খুঁজে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্বমূলক উপাদানই হোক আর সাহিত্যিক উপাদানই হোক—শেষ পর্যন্ত তা পরোক্ষ। তাই, প্রত্যক্ষভাবে প্রাচীন সমাজকে চেনবার যদি কোনো পথ থাকতো তাহলে এই পরোক্ষ উপাদানগুলিকে তারই আলোয় আরো স্পষ্টভাবে, আরো নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করবার উপায় পাওয়া যেতো।

এবং ঠিক এইখানেই হেনরি লুইস মর্গানের গবেষণা সত্যিই যুগান্তকারী। মর্গানের আবিষ্কারের একটা কথা হলো, আমাদের পক্ষে আজো ওই প্রাচীন সমাজকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব। অনেক শতাব্দী আগেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক কী ভাবে জীবন-যাপন করতেন তা আজকের দিনেও আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে জানবার একটা উপায় রয়েছে। আর, মর্গানের এই দাবি যদি

সত্যি হয়, তাহলে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই প্রত্নতত্ত্বমূলক বা সাহিত্যমূলক ওই পরোক্ষ দলিলগুলিকে আরো নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাই, মর্গানের মূল দাবিটিকে ভালো করে বোঝা দরকার।

সারা পৃথিবীর বুক জুড়ে সমস্ত মানুষের উন্নতিই সমান তালে হয়নি। কোথাও বা মানুষ এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে, কোথাও বা মানুষ পড়ে রয়েছে অনেকখানি পিছনে। এবং মর্গান দাবি করলেন, ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের বাস্তব অবস্থাকে পরীক্ষা করলে এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীত ইতিহাসটিকেও দেখতে পাওয়া যাবে। তার কারণ, মানুষের পক্ষে এগিয়ে চলবার পথে একের পর এক যে-সব পর্যায় সেগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ও অনিবার্য পারস্পর্য রয়েছে। মর্গানের ভাষায়, *natural as well as necessary sequence of progress*(১৩৩)। যেন একের পর এক কয়েকটি নির্দিষ্ট ও অনিবার্য ধাপ বেয়ে এগোবার চেষ্টা—যেখানেই মানুষ এগিয়েছে সেখানেই এই ধাপগুলি ভেঙে এগোতে হয়েছে, যেখানে এগোতে পারে নি সেখানে ওই ধাপগুলির কোনো-না-কোনো একটি ধাপে আটকে রয়েছে আর সেই জন্যেই যারা এগোতে পারে নি তাদের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় যারা এগিয়ে গিয়েছে তারা ঠিক কোন কোন ধাপ ভেঙে এগিয়েছে।

এই ধাপগুলি ঠিক কী কী? কোন পথে এগিয়ে, ঠিক কোন কোন পর্যায় পার হয়ে, মানুষ শেষ পর্যন্ত সভ্যতার স্তরে উঠে এলো? মর্গানের পরিভাষা অনুসারে সভ্যতার স্তরে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত মানুষের অবস্থাকে মোটের উপর দুটি অংশে ভাগ করা যায়: বন্য-দশা (*savagery*) ও বর্বর-দশা (*barbarism*)। এই দুটি দশারই আবার স্তরবিভাগ রয়েছে: নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ। অর্থাৎ মানুষ শুরু করেছে নিম্ন-বন্য-দশা থেকে, তারপর এগিয়ে এসেছে মধ্য-বন্য-দশায়, তারপর উচ্চ-বন্য-দশায়। তারপর মানুষ বন্য-দশা ছেড়ে বর্বর-দশায় উঠে এসেছে:

প্রথমে নিম্ন-বর্বর-দশা, তারপর মধ্য-বর্বর-দশা, তারপর উচ্চ-বর্বর-দশা। আর, তারপর মানুষ বর্বর-দশা ছেড়ে সভ্যতার আওতায় এসে পৌঁছেছে।

এই সব বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয় কী কী রকম সে-আলোচনায় পরে ফিরতে হবে। আপাতত মর্গানের মূল যুক্তিটির অনুসরণ করা যাক। মর্গান বলছেন, আজকের পৃথিবীতে এমন কোনো মানবদলের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় না যারা একেবারে নিম্ন-বন্য-দশায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু মধ্য-বন্য-দশায় নানা দলকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আবিষ্কৃত হবার সময় পলিনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা ছিলো মধ্য-বন্য-দশায়।

আমেরিকার ‘হাডসন-বে টেরিটরি’ ও ‘কলম্বিয়া উপত্যকা’ র নানান উপজাতিরা ছিলো উচ্চ-বন্য-দশায়।

মিসিসিপি নদীর পূর্ব-কিনারায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা ছিলো নিম্ন-বর্বর-দশায়।

নিউ মেক্সিকো, মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরুর নানা উপজাতিদের দেখা গেলো মধ্য-বর্বর-দশায়(১৩৪)।

এরপর উচ্চ-বর্বর-দশার কথা। মর্গান বলছেন, সে-দশার পরিচয় পাওয়া যায় হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যে, রোম স্থাপিত হবে মুখোমুখি সময়কার লাতিন জাতিগুলির মধ্যে এবং সিজারের সময়কার জার্মানদের মধ্যে। এই উচ্চ-বর্বর-দশার আওতা পেরিয়েই সভ্যতার শুরু। অতএব মর্গান সিদ্ধান্ত করছেন:

Commencing, then, with Australians and Polynesians following with the American Indian tribes, and concluding with the Roman and Grecian, who afford the highest exemplifications respectively of the six great stages of human progress, the sum of their united

experiences may be supposed fairly to represent that of the human family from the Middle Status of savagery to the end of ancient civilization. Consequently, the Aryan nations will find the type of the condition of their remote ancestors, when in the Lower Status of barbarism, in that of the partially village Indians of America; and when in the Middle Status, in that of the Village Indians with which their own experience in the Upper Status directly connects. So essentially identical are the arts, institutions and mode of life in the same status, upon all the continents, that the archaic form of the principal domestic institutions of the Greeks and Romans must even now be sought in the corresponding institutions of the American aborigines,.....

In studying the condition of tribes and nations in these several ethnical periods we dealing, substantially, with the ancient history and condition of our own remote ancestors.(১৩৫)

অর্থাৎ, মানুষের অগ্রগতির ছ' টি প্রধান স্তরের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়াদের থেকে শুরু করে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের অনুসরণ করে রোমান ও গ্রীকদের কথায় শেষ করলে; এদের মিলিত অভিজ্ঞতাকে মধ্য-বন্য-দশা থেকে শুরু করে প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলা যায়। অতএব আর্থজাতিগুলি তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের বন্য-দশার অবস্থাটা

দেখতে পাবে আমেরিকার আংশিকভাবে গ্রামবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে; মধ্য-বর্বর-দশার অবস্থাটা দেখতে পাবে গ্রামবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে—এদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আৰ্যজাতিগুলির উচ্চ-বর্বর-দশার অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সমপর্যায়ের মানুষদের মধ্যে শিল্প, সমাজ-সংগঠন ও জীবন-যাপন পদ্ধতি সমস্ত মহাদেশের বেলাতেই এমন মৌলিকভাবে অভিন্ন যে, গ্রীক ও রোমানদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থার আদিম রূপটিকে এখনো খুঁজতে হবে আমেরিকার আদিবাসীদের অনুরূপ ব্যবস্থার মধ্যে...

নৃতত্ত্বমূলক এই বিভিন্ন পর্যায়গুলিতে যে-সব বিভিন্ন জাতি-উপজাতি রয়েছে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ইতিহাস এবং অবস্থার কথাও পর্যালোচনা করবো।

তাই, আদিবাসী-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের কাজে নিজের প্রায় পুরো জীবনটিকে উৎসর্গ করে হেনরি লুইস মর্গান প্রাচীন সাহিত্যের তোরণদ্বার খোলবার চাবিকাঠি আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন।

মর্গানের এই মূল সিদ্ধান্তগুলি মরে রেখে প্রাচীন যুগের ইতিহাস-রচনা সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যার আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

পিছিয়ে-পড়া মানুষদের দিকে এইভাবে চেয়ে দেখলে যদি সত্যিই এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীত ইতিহাসটাকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারা সম্ভবপর হয় তাহলে প্রাচীন ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্বমূলক ও সাহিত্যমূলক পরোক্ষ উপাদানগুলিকে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোয় যাচাই করে নিলে নিশ্চয়ই আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।

অধ্যাপক জর্জ টমসন(১৩৬) তাই বলছেন, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের এই দুটি শাখার মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। নৃতত্ত্বের সাহায্য পুরাতত্ত্বের

আবিষ্কারকে কী ভাবে বুঝতে পারা সহজসাধ্য হয় তিনি তার একটি নমুনা দিচ্ছেন। পুরাতত্ত্ববিদেরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ড্যানিউব-সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি তথ্য আবিষ্কার করলেন: দেখা গেলো সে-সংস্কৃতির মানুষেরা অনেকখানি এলাকা জুড়ে একের পর এক বাসস্থান গড়ে তুলেছিলো, কিন্তু কোনো বাসস্থানেই তারা বেশিদিন ধরে একটানা বাস করে নি। ঘটনাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আফ্রিকার নানা জায়গায় আজো যে-সব আদিবাসীরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে। তারা আবাদী জমির পাশে বাসস্থান গড়ে এবং যতোদিন পর্যন্ত না জমির উর্বরতা একেবারে উজোড় হয়ে যায় ততোদিন তারা সেইখানেই চাষবাস করে। তারপর তারা সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়; অন্যত্র নতুন বাসস্থান গড়ে তোলে।

অবশ্যই, গর্ডন চাইল্ড(১৩৭) প্রমুখ কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে নৃতত্ত্বের সমন্বয় ঘটানো প্রাচীন মানুষদের সমাজ-জীবন ও ধ্যানধারণার কথা অনুমান করবার চেষ্টা সঙ্গত নয়। সমস্যাটা কী, এবং এঁদের আপত্তিটা ঠিক কেন প্রথমে তাই দেখা যাক। ধরুন, পুরাতত্ত্বের গাঁইতি এক জায়গায় দশ হাজার বছর আগেকার কোনো একদল মানুষ সম্বন্ধে এমন চিহ্ন আবিষ্কার করলো যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাদের জীবন-যাপন নির্ভর করতো শিকারের উপর। এদিক, নৃতত্ত্ববিদ সংবাদ দিলেন শিকারজীবী মানুষের দল আজো পৃথিবীর এখানে-ওখানে টিকে রয়েছে এবং তাদের সমাজ-সংগঠন ও ধ্যানধারণা সংক্রান্ত তথ্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে কি এ-কথা দাবি করা সঙ্গত হবে যে, ওই দশ হাজার বছর আগেকার মানুষদের সমাজ-জীবন ও ধ্যানধারণা আজকের এই মানুষদের অনুরূপই ছিলো? গর্ডন চাইল্ড বলেছিলেন, এ-জাতীয় অনুমান সঙ্গত নয়। কেননা, আজকের ওই শিকারজীবীরা যদিও উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে অতোখানি পেছিয়ে পড়ে রয়েছে তবুও তাই বলে এ-কথা নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না যে, তাদের মানসিক

বিকাশও ওই দশ হাজার বছর আগেকার মানুষদের মনোবিকাশের পর্যায়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়েছে।

উত্তরে অধ্যাপক জর্জ টমসন(১৩৮) বলেছেন, তা নিশ্চয়ই হয়ে যায়নি। যে-সব মানুষেরা আজো উৎপাদন-পদ্ধতির দিক থেকে ওই রকমের পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে আটকে রয়েছে তাদের মানসিক পরিবর্তনও নিশ্চয়ই ঘটে চলেছে। কিন্তু এ-পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘটেছে এবং সে-গণ্ডি নির্ভর করছে ঐ উৎপাদন-পদ্ধতির উপরই।

……the social institutions of these modern tribes have not remained stationary. They have continued to develop, but only the directions determined by the prevailing mode of production. This is the key to the problem. If, for example, we examine the Australian forms of tokenism, exogamy and initiation the Australian forms of totemism, exogamy, and initiation, and compare them with similar institutions elsewhere, we find that they are extraordinarily elaborate, pointing to a long period of development. But these are all institutions characteristic of a simple hunting economy. In other words, just as the economic development of these tribes is stunted, so their culture is ingrown. And consequently, while we cannot expect to find such institutions in Paleolithic Europe in the same form, we are likely to find them there in some form.

অর্থাৎ, এই সব আধুনিক উপজাতিগুলির সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেমে থাকে নি। সেগুলির বিকাশ ঘটে চলেছে, কিন্তু তা একান্তভাবেই প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভিমুখেই। এই হলো সমস্যাটিকে বোঝবার মূল কথা। যেমন ধরুন, আমরা যদি টোটম-বিশ্বাস, বহির্বিবাহ ও দীক্ষার অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত রূপগুলিকে বিশ্লেষণ করি এবং তার সঙ্গে অন্যত্র প্রচলিত অনুরূপ অনুষ্ঠানের তুলনা করি তাহলে দেখবো অস্ট্রেলিয়ার অনুষ্ঠানগুলি অসাধারণ রকমের ফাঁপানো-ফোলানো-তার থেকেই দীর্ঘ যুগ ধরে বিকাশের নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিনা, এই উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি যে-রকম খর্ব সেই রকমই তাদের সংস্কৃতির বিকাশও অন্তর্মুখি। তাই, পুরোনো-পাথর যুগের ইয়োরোপে যদিও আমরা এই অনুষ্ঠানগুলিকে এই রূপেই আশা করতে পারি না তবুও সেগুলিকে কোনো-একরূপে খুঁজে পাবার আশা করতে পারি।

তাই, অধ্যাপক জর্জ টমসনের কাছে প্রাচীন ইতিহাস রচনার কাজে আদিবাসী সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা,—বিশেষ করে মর্গানের গবেষণা—এতো মূল্যবান হয়েছে। লোকায়ত-দর্শনের আলোচনায় আমাদের প্রধান সমস্যা অবশ্যই পুরাতত্ত্বমূলক আবিষ্কারকে নৃতত্ত্বে আলায় বোঝবার সমস্যা নয়, তার বদলে প্রাচীন সাহিত্যের কিছুকিছু আপাত-দুর্বোধ্য নিদর্শনের তাৎপর্য নির্ণয় করবার সমস্যা। তবু, এই নিদর্শনগুলিও যেহেতু বহু পুরোনো যুগের স্মারক সেইহেতুই অধ্যাপক জর্জ টমসনের পদ্ধতি আমাদের প্রচেষ্টার পক্ষেও অমূল্য। অবশ্যই, আজকের দিনে পণ্ডিতমহলে নৃতত্ত্ব নিয়ে উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু বিদগ্ধ মহলের একজন দিকপাল হয়েও অধ্যাপক জর্জ টমসনের পক্ষে এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটি হলো, তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যার একটি পরিচয় হলো মর্গানের গবেষণাকে গ্রহণ করা। কেননা,

সোভিএট ইউনিয়ন ও নয়া-গণতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরে মার্কস-এর আবিষ্কারের মতোই মর্গানের আবিষ্কারও নিষিদ্ধ করা হয়ে রয়েছে(১৩৯)। মর্গানের বিরুদ্ধে এই প্রতিবন্ধের পরিচয় শুধু আজকের দিনেই নয়, তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই তাঁর আবিষ্কারগুলি চেপে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে(১৪০)। অধ্যাপক জর্জ টমসন দেখাচ্ছেন সমস্যা বিশেষের আলোচনায় মর্গানের আবিষ্কার অগ্রাহ্য করাই দরুনই রিভারস, মেনিলাউস্কি প্রমুখের রচনায় নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান কী ভাবে প্রায় অজ্ঞানের কোঠায় পৌঁছেছে(১৪১)।

মর্গানের বিরুদ্ধে এই প্রতিবন্ধের কারণ ভালো করে বিশ্লেষণ করা দরকার। কোনো একজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে যদি তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। তাহলে আধুনিক বিদগ্ধ-সমাজ তাঁর প্রতি বিরূপ হবে কেন?

অবশ্যই, আদিবাসী-সংক্রান্ত তাঁর ওই গবেষণা শুধুমাত্র অসভ্য মানুষ সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান দেয়নি, আমাদের নিজেদের অতীতটাকেও আমাদের চিনতে শিখিয়েছে। এবং আসল হ্যাঙ্গামাটা ঠিক এইখানেই: অতীতের উপর থেকে পর্দা সরালে শুধুমাত্র অতীতটুকুও চোখে পড়ে না—পাওয়া যায় এক ভবিষ্যতের নির্দেশও(১৪২)। কী ভাবে তাই দেখা যাক।

মর্গান আবিষ্কার করলেন, আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্ক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থা—মানবজাতির পক্ষে এগুলির কোনোটাই অপরিহার্য নয়। কেননা, প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একটা যুগ গিয়েছে যখন তাদের মধ্যে এ-সব কিছুই পরিচয় ছিলো না। বস্তুত, আজকের দিনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব যতো প্রচণ্ডই মনে হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে মানবজাতির পুরো জীবনটার তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যুগটা চোখের পলকের মতো। তার প্রমাণ, মধ্য-বন্য-দশা থেকে শুরু করে মধ্য-বর্বর-দশা পর্যন্ত সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যে-সব মানবদল এখনো টিকে রয়েছে তাদের জীবনে

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হতে পারে না। অতীতে যদি তার প্রভাব ছাড়াও জীবনধারণ সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব-মুক্ত হওয়া অসম্ভব কথা নয়। আর, ঠিক এই কথাটিই হলো মর্গানের গবেষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তিনি দেখলেন, বর্তমান যুগে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবে মানুষের জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন প্রাচীন পর্যায় আলোচনা করে তাঁর মনে এ-বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিলো যে মানুষ এগিয়ে চলবে-মানুষ চিরকাল এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলার ক্ষমতাই তাকে পশুর রাজ্য থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে এতো আশ্চর্য সম্ভ্যতার আওতায়। তাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আজ তার জীবনে যতো বাধাই সৃষ্টি করুক না কেন, সে-বাধা অলঙ্ঘনীয় নয়। অগ্রগতি অতীতের নিয়ম হয়েছে, অগ্রগতিই ভবিষ্যতের নিয়ম হবে। তাই মর্গান মানুষের সামনে যে-উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখতে পেলেন সেখানে ব্যক্তিগত-সম্পত্তির গ্লানি নেই-সবাই সমান, সবাই স্বাধীন, মানুষে-মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব। আর মর্গান চিনতেও পারলেন: এ-যেন সেই প্রাচীন সমাজেরই পুনরাবর্তন-কিন্তু ওই প্রাচীন পর্যায়ে নয়, উন্নত ও সমৃদ্ধ এক নতুন পর্যায়ে। ভবিষ্যতের ওই ছবিটি মর্গানের কাছে দিবাস্বপ্ন নয়, অতীত-অনুসন্ধানের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত।

কিন্তু আজকের যুগে দিনের চিন্তা আর রাত্রির স্বপ্ন সবকিছুর উপরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অমোঘ প্রভাব। এই আবহাওয়াতেই লালিত হয়েছে আধুনিক বিদ্বান-ব্যক্তির। অতি বড়ো বিদ্বানের দৃষ্টিও তাই ভবিষ্যতের ওই ছবিটির দিকে যেতে চায় না। ফলে, অতীত সম্বন্ধেও এক আশ্চর্য অন্ধভাব!

প্রাচীন রচনাবলীর তাৎপর্য-নির্ণয় করা নিয়েই আমাদের সমস্যা। কিন্তু আমরা যতোদিন পর্যন্ত ওই অন্ধভাবের বশবর্তী হয়ে থাকবো ততোদিন পর্যন্ত এ-তাৎপর্য উদ্ধার করবার সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা, অস্পষ্ট এক অতীতে রচিত বলেই এগুলির মধ্যে প্রাচীন-সমাজের বহু স্মৃতি থেকে গিয়েছে। সেগুলি

বুঝতে হলে প্রাচীন সমাজকেও স্পষ্টভাবে চিনতে হবে। প্রাচীন সমাজকে যদি চিনতে হয় তাহলে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সনাতন মনে করা চলবে না।

আমরা যে-অর্থে অন্ধভাবের কথা বলছি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে কার্ল মার্কস-এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করলে। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন মাউরের নামে জার্মান ঐতিহাসিক ও আইনবিদের গবেষণা-প্রসঙ্গে। এ-গবেষণার আলোয় দেখা গেলো জার্মান দেশে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিয়েছে অনেক পরের যুগে, এবং এমনকি আধুনিক যুগেও নানা জায়গায় প্রাচীন যৌথ-সম্পত্তির চিহ্ন টিকে থেকেছে। তাহলে, ব্যক্তিগত-সম্পত্তির বিরুদ্ধে অতি-আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিহ্নহীন অতি প্রাচীন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে; অতি প্রাচীনের মধ্যেই আবিষ্কার করা যাচ্ছে অতি-আধুনিককে এবং এই আবিষ্কারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টার যোগাযোগ রয়েছে। মার্কস(১৪৩) বলছেন:

Owing to a certain judicial blindness, even the best minds fail to see, on principle, what lies in front of their noses. Later, when the time has come, we are surprised that there are traces everywhere of what we failed to see. The first reaction to the French Revolution and the Enlightenment bound up with it was naturally to regard everything as mediaeval, romantic, and even people like Grimm are not free from this. The second reaction to it is to look beyond the Middle Ages into the primitive age of every people – and this corresponds to the socialist

tendency, though these learned men have no idea that they are connected with it. And they are then surprised to find what is newest in what is oldest, and even egalitarians to a degree which would have made Proudhon shudder.

অর্থাৎ, এক রকম আইনগত অন্ধতার দরুন এমনকি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানেরাও যা একেবারে নাকের গোড়ায় রয়েছে তা দেখতেই পান না। পরে, যখন সময় উপস্থিত হয়ে তখন, যে-সব চিহ্ন আমরা আগে দেখতে পাইনি সর্বত্র সেগুলিকে দেখে অবাক হয়ে যাই। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত নবজাগরণের যুগের সম্বন্ধে, প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো মধ্যযুগীয় সবকিছুকেই সুন্দর মনে করায়; এবং গ্রীম-এর মতো ব্যক্তিরও এর প্রভাবমুক্ত নন। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, মধ্যযুগ পেরিয়ে...প্রত্যেক জাতিরই আদিম যুগটির দিকে চেয়ে দেখা, এবং এ-চেষ্টা সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টারই অনুরূপ, যদিও এই দু' -এর মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক আছে সে-সম্বন্ধে ওই সব বিদ্বান-ব্যক্তিদের কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা তাই যা কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে যা হলো সবচেয়ে নতুন তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যান-এমনকি সাম্যবাদীদেরও এই দশা, ব্যাপারটা এতোই চরম যে প্রুধঁ-র মতো ব্যক্তিরও তা দেখে হৃৎকম্প হবে।

উদ্ধৃত অংশের বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম, মার্কস একরকম আইনগত অন্ধতার কথা বলছেন: শ্রেণীসমাজের আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই মানুষ পরমপুরুষার্থ মনে করতে শিখেছে,

তাই যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব তা একেবারে নাকের গোড়ায় থাকলেও সাধারণত আমাদের চোখে পড়তে চায় না।

দ্বিতীয়ত, মার্কস বলছেন, প্রত্যেক জাতির আদিম যুগটির দিকে চেয়ে দেখা সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টারই অনুরূপ। তার কারণ, সমাজতন্ত্র এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পথনির্দেশ দিচ্ছে এবং প্রত্যেক জাতিরই আদিম অবস্থার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় তখনো মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয়নি।

আর, ঠিক এই কারণেই মার্কস বলছেন, যা-কিনা সবচেয়ে পুরোনো তারই মধ্যে, যা-হলো সবচেয়ে নতুন তাকে আবিষ্কার করতে পারা। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে আধুনিক বলতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বা সাম্যবাদের আয়োজন। আদিম মানবসমাজও একরমের সাম্যসমাজ। এই প্রসঙ্গেই মনে রাখতে হবে, মর্গানের সামনেও অতীতের উপর থেকে পর্দা সরে যাবার দরুনই এক ভবিষ্যতের চিত্র উন্মোচিত হয়েছিলো এবং সে-ভবিষ্যতের বর্ণনায় মর্গান বলেছিলেন: ‘সেই প্রাচীন সমাজের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাই আবার ফিরে আসবে উন্নততর এক পর্যায়ে’ ।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক হলো আধুনিক যুগের ব্যক্তিগত-সম্পত্তির প্রভাব-লালিত অন্ধতা প্রাচীন রচনাবলীর তাৎপর্য নির্ণয়ে কী রকম বাধা সৃষ্টি করে সে-সম্বন্ধে সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা তারই উদাহরণ হিসেবে মার্কস(১৪৪) বলছেন:

To show how much we are all implicated in this judicial blindness:...philologists of the force of a Grimm mistranslated the simplest Latin sentences...

E.g., the well-known passage in Tacitus: “arva per annos mutant et superest ager,” which means, “they exchange the fields, arva (by lot, hence also sortes [lot] in all the later law codes of the barbarians) and the common land remains over” (ager as public land contrasted with arva)—is translated by Grimm, etc. “they cultivate fresh fields every year and still there is always (uncultivated) land over!”

আমরা সবাই কী ভাবে এই আইনগত অন্ধতার বশ তাই দেখা যাক।... গ্রীম্-এর মতো অতো বড়ো ভাষাতত্ত্ববিদও সবচেয়ে সরল লাতিন বাক্যের ভ্রান্ত তর্জমা করেছেন। উদাহরণ: “arva per annos mutant et superest ager”—ট্যাসিটাসের এই বিখ্যাত অংশটির মানে হলো, “তারা লটারি করে জমি বদল করে এবং সাধারণের জমি বাকি থাকে” ; গ্রীম্ প্রভৃতি এর তর্জমা করছেন, “তারা প্রতি বছর নতুন জমি চাষ করে এবং তবুও অনাবাদী জমি বাকি পড়ে থাকে” । (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্য না নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যের অর্থনির্ণয় করবার চেষ্টায় অতিবড়ো বিদ্বানেরাও কী রকম কাল্পনিক কথা বলতে পারেন তার একটি দৃষ্টান্ত ভারতীয় সাহিত্য থেকে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। মহাভারতে বাহীকদের বর্ণনায়(১৪৫) ঘৃণাভরে বলা হয়েছে:

তস্মান্বেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সুনবঃ

অর্থাৎ এই নিমিত্তই তাহাদের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্য অনুসারে এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মাতৃ-প্রধান সমাজের স্বাভাবিক স্মারক বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। মহাভারতে বাহীকদের বর্ণনায় এই মাতৃপ্রধানের ইঙ্গিতও অস্পষ্ট নয়(১৪৬) এবং আজো ভারতের স্থানবিশেষে(১৪৭),—যেখানে মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন আছে সেখানে,—এই জাতীয় উত্তরাধিকার ব্যবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়। অথচ, মহাভারতের এই সরল তথ্যটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীলকণ্ঠের মতো বিদ্বান-ব্যক্তিও কী রকম মনগড়া কথা বলছেন:

যদি অপি পুত্রী পুত্রঃ চ দ্বৌ অপি জারজৌ তথাপি পিতৃভ্বে ইব মাতৃভ্বে
বিসংবাদীভবাৎ দৌহিত্রঃ এব রিধ্ণ্ অহারী ভবতি ন পুত্রঃ ইতি ভাবঃ।
যতঃ তে ভগিনীষু এব অপত্যানি জনয়ন্তি স্বাদারেষু অতঃ তেষাং
ভাগিনেয়াঃ ভাগহরাঃ ইতি.....

অর্থাৎ, যদিও পুত্রী ও পুত্র দুজনেই জারজ তথাপি পিতৃভ্বে ন্যায় মাতৃভ্বে
বিসংবাদঅভাব হেতুম দৌহিত্রই ধনাধিকারী হয়, পুত্র নহে। যেহেতু
তাহারা ভগিনীতেই অপত্য উৎপাদন করে, নিজেদের পত্নীতে নহে—সেই
হেতু তাহাদিগের ভাগিনেয়গণই উত্তরাধিকারী হয়।

মার্কস যে-অন্ধতার কথা উল্লেখ করছেন এখানে তারই অনুরূপ অন্ধতার পরিচয়। এখানে এই অন্ধতা দূর করবার জন্যেই গ্রীকতত্ত্বের অতো বড় পণ্ডিত হয়েও অধ্যাপক জর্জ টমসন গ্রীক সাহিত্য বোঝবার তাগিদেই মার্কসবাদী হয়েছিলেন।

১২৮. F. Engels OFPPS ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১২৯. Ibid 7.

১৩০. F. Engels LF, AD ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৩১. G. Thomson AA 421; SAGS 43; FP 43-4, ইত্যাদি।

১৩২. বেদান্তসার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৩৩. H. L. Morgan AS 3.

১৩৪. Ibid 10-1, 56.

১৩৫. Ibid 17-8.

১৩৬. G. Thomson SAGS 34.

১৩৭. G. Childe MMH 51.

১৩৮. G. Thomson op. cit. 35.

১৩৯. Ibid 86.

১৪০. F. Engels OFFPPS 30.

১৪১. G. Thomson op. cit. 85-6.

১৪২. Ibid 57: “To tell the whole story from beginning to end would not only reveal the present as a continuation of the past—it would lift the veil on the future. There’s the rub.”

১৪৩. K. Marx & F. Engels C 209.

১৪৪. Ibid.

১৪৫. কর্ণপর্ব ৩৪:১১৯।

১৪৬. তৃতীয় পরিচ্ছেদের “রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব” অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪৭. G. Thomson SAGS 155: আমেরিকার ইরোকোয়া এবং ভারতের খাসিদের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। অন্যান্য ভারতীয় দৃষ্টান্তের জন্য O. R. Ehrenfels-এর MI দ্রষ্টব্য।

উপসংহার (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পদ্ধতি প্রসঙ্গে)

আধুনিক যুগের বিদ্বানেরা ভারতবর্ষের প্রাচীন রচনাবলী সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। সে-গবেষণাকে ছোটো করবার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না; কেননা, তার উপর নির্ভর করতে না পারলে আমাদের পক্ষে আজ হয়তো ওই পুঁথিপত্রগুলির দিকে অগ্রসর হওয়াই অনেকাংশে অসম্ভব হতো। কিন্তু তবুও শুধুমাত্র এই গবেষণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও সম্ভব নয়। কেননা, এই রচনাগুলিতে প্রাচীন-সমাজের সে-সব স্মারক পড়ে রয়েছে আধুনিক বিদ্বানেরা সেগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা খোঁজ করেন নি। তার কারণ কি এই যে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ওই সব বুলজমা ধুলোঢাকা গহ্বরগুলিতে এমন কঙ্কাল লুকানো রয়েছে যার কাহিনী শুনতে আধুনিক সমাজ সাহস পায় না? এই কঙ্কালগুলি রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল গল্পের অশরীরী নায়িকাটির মতো সত্যিই বড় অপরূপ কাহিনী আমাদের শোনাতে চায়। এরা বলতে চায়, উত্তরযুগের ভারতীয় সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষের তাণ্ডব যতো প্রচণ্ড হয়েই উঠুক না কেন এককালে এই সমাজেই সবাই স্বাধীন ছিলো, সবাই সমান ছিলো, মানুষে-মানুষে ছিলো ভাই-ভাই সম্পর্ক। তখনো মানুষ মানুষকে শোষণ করতে শেখেনি, তাই শেখেনি অধ্যাত্মবাদের প্রবঞ্চনা, শেখেনি ভাববাদের আলেয়া দেখিয়ে মানুষকে ভুল পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

এ-কাহিনী প্রকাশ করতে আধুনিক সমাজ এতো ভয় পায় কেন? কেননা, সে-কাহিনী শুনে আজকের মানুষ আবার সমানে-সমান সম্পর্ককে ফিরে পেতে চাইবে। তার মানে অবশ্যই সে-সমাজের দৈন্যকে ফিরে পাবার কথা নয়—ধনসম্পদের দৈন্যও নয়, চিন্তাচেতনার দৈন্যও নয়—তার বদলে, প্রাচুর্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন সাম্য-সমাজ, আর তারই অনুরূপ ধ্যানধারণা হিসেবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ লোকায়ত-দর্শনও। অতীতকে আবিষ্কার করবার সঙ্গে শুধুই

অতীতকে চেনবার সম্পর্ক নয়—সচেতনভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার
যোগাযোগও আছে।